নট-নাট্য-চলচ্চিত্রকথা

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৬০ ॥ মাঘ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । কলকাতা ৭৩

মুদ্রক : ধীরেন্দ্রনাথ বাগ । নিউ নিরালা প্রেস
৪ কৈলাশ মুখার্জী লেন । কলকাতা ৬

পরমাত্মা শ্রীচরণেষু মার

করকমলে

কৈফিয়ত

প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক। তুমি আবার কে বটে হে, তোমার আবার আত্ম-জীবনী ? না, আমি কেউ নই। অতি সাধারণ মানুষ, যারা জন্মায় প্রকৃতির নিয়মে, বয়েসে ক্রমে বড়ো হয় ঐ প্রকৃতিরই নিয়মে, বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মালেও সুকৃতির জোর থাকলে কিছুটা লেখাপড়া শেখে, চাকরি বাকরি, বা আলিপুর কোর্টে ওকালতি করে, দু'একজন ছাড়া বে'থা ক'রে সংসারী হয় এবং শেষ পর্যন্ত ঐ প্রকৃতিরই নিয়মে পরপারে প্রস্থান করে। কিন্তু আমি নিজে অতি সাধারণ মানুষ হ'লে কি হয়, আমার জীবনে আমার অত্যন্ত সৌভাগ্যবশত আমি বেশ কয়েকজন অসাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসেছি এবং বহু আশ্চর্য ঘটনা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। বয়েসটাও বেড়ে বেড়ে ছিয়াত্তরে এসে ঠেকেছে। বহুলোকই আমার মুখ থেকে নানা কথা শুনে এবং পত্রপত্রিকায় আমার রচনা প'ড়ে আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, আমার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করবার জন্যে। অনেকদিন ধরে এড়াবার পরে শেষ পর্যন্ত ঠেকানো গেল না ; অতএব এই জঞ্জালের জন্ম।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

প্রয়াত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক পুস্তকের ভূমিকা আমাকে লিখতে হবে একথা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। পশুপতিবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ১৯৪৫ সাল থেকে। তিনি বয়সে আমার থেকে ৪/৫ বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু চলচ্চিত্র জগতের কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী আমাকে দাদা বলতেন বলে তিনিও আমাকে দাদা সম্বোধন করতেন। আমি যখন বেঙ্গল আর্টিস্ট এসোসিয়েশনের সংগঠন সম্পাদক ছিলাম এবং সেই সংগঠনের মধ্যে চলচ্চিত্র শিল্পীদের সঙ্গে কিছু কিছু চলচ্চিত্র পরিচালকদেরও যুক্ত করার চেষ্টা করি, তাঁদের মধ্যে পশুপতিবাবু একজন ছিলেন। আমার কিছু কিছু প্রবন্ধে এবং একটি পুস্তকে পশুপতিবাবুর সঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের কাজে যুক্ত থাকার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি। চলচ্চিত্র শিল্পের কলাকুশলীদের সংগঠন 'সিনে টেকনিসিয়ানস এসোসিয়েশান অব বেঙ্গল'-এর যখন তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হন তখন নির্বাচনে তিনি যাতে নিশ্চিত জয়লাভ করতে পারেন তার জন্য আমি চেষ্টা করেছিলাম। একথা আর যে ব্যাক্তি জানতেন তিনি হলেন সদ্যপ্রয়াত সবিতাব্রত দত্ত। পশুপতি-বাবু জীবিত থাকতেই আমি একটি প্রবন্ধে সেই সব কথা প্রকাশ করেছি। আশ্চর্যের বিষয় তিনি তাঁর এই পুস্তকের কোন জায়গাতেই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু তাঁর কাছে আমার ঋণ স্বীকার করতেই হবে; কারণ ১৯৪৮—৫০ সালের মধ্যে যখন আমি গ্রেফ্তার এড়াবার জন্যে সেযুগের বিখ্যাত মহিলা শিল্পী সুমিত্রাদেবীর বাড়ীতে কিছুকাল আশ্রয় নিয়েছিলাম—পশুপতিবাবু তা জানতেন, এবং আমাকে দিয়ে তাঁর পরিচালিত 'স্বামী' ছবিতে নায়িকার সংলাপে হার্বার্ট স্পেনসারের দার্শনিক মতামত থেকে দুটি সংলাপ লিখিয়ে নিয়েছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর যখন আর্থিক ব্যাপারে অত্যন্ত বিপর্যস্ত তখন তাঁর পরিচালিত 'ষোড়শী' ছবিতে ছোট্ট একটি ভূমিকা দিয়ে পশুপতি-বাবু আমাকে এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন, এবং এম. পি. পিকচার্সের প্রয়াত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে যখন তিনি 'নীলদর্পণে'র চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করেন তখন তিনি আমাকে তাঁর উপদেষ্টা করেন। কারণ, আমি ইতি-মধ্যেই শিল্পীচক্র প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৯৫০ সালেই 'নীলদর্পণ' নাটক কয়েকরাত্রি অভিনয় করাতে সমর্থ হয়েছিলাম।

এই পুস্তকের বিশেষ গুণ হচ্ছে এই যে বাংলাদেশের নাটক ও চলচ্চিত্র-কলার ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা চলছে তার অনেক আভ্যন্তরীণ তথ্য পশুপতি-বাবু দিয়েছেন। অমৃতলাল বসু থেকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং প্রমথেশ বড়ুয়া থেকে সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য এই পুস্তকে আছে। তাছাড়া 'নাচঘর' থেকে 'অমৃত', 'নতুন খবর' প্রভৃতি পত্রিকায় যে

ধরণের সাংবাদিকতা তিনি করেছেন সেখানেও তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ নানা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে পুস্তকটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। তিনি কিছুদিন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেছেন। তবে তিনি কোনদিনই প্রত্যক্ষভাবে কোন দলীয় রাজনীতি করেননি। তাই রাজনীতি বা সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে মন্তব্য এই পুস্তকে আছে তার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। তবে নাটক ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে যে সকল তথ্য তিনি দিয়েছেন এবং যার কিছু অংশ ইতিমধ্যেই নাট্য ইতিহাসে স্বীকৃত তার জন্যই এই পুস্তকটি নাট্য ও চলচ্চিত্র বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের এবং সামাজিক ইতিহাসের গবেষকদের পক্ষে মূল্যবান হবে বলে আমার ধারণা।

মা জায়গাটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে বললেন, এই, এ-ই জায়গাটাতে তুই জন্মেছিলি। মার ঠিক পাশেই আমি দাঁড়িয়েছিলুম। আমি মায়ের মুখের পানে মুখে তুলে চেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম, এই জায়গাটাতে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলুম? মা বললেন, হ্যাঁ, ঠিক এই জায়গাটাতে।

মনের বিস্ময় আর কাটে না। ওটা একটা চলন-পথ। চন্দননগরের বুড়ো শিবতলায় আমাদের চাটুজ্জে বাড়ীটা খুব বিরাট কিছু না হলেও দোতলা এবং দোমহল। বাইরের মহল থেকে ভিতরের মহলে আসতে গেলে একটা ঢাকা গলিপথ দিয়ে ঢুকতে হয়। আমি জন্মেছি কিনা ঐ ঢাকা গলি-পথেরই ভিতর বাড়ী প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি! আমার জন্মের ফলে ঐ চলন-পথটা একুশটা দিনের জন্যে রূপান্তরিত হ'ল আঁতুড়ঘরে! তাহলে বারমহল এবং অন্দরমহলের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা? না, সেটা বজায় রইল, অবশ্য অন্য উপায়ে। আমাদের অন্দরমহলে ছিল একটি খিড়কী-দরজা। ঐ দরজা দিয়েই আমাদের বাড়ীর মেয়েরা ডান হাতে বেঁকে গঙ্গাস্নানে যেতেন। আমাদের বাড়ী থেকে গঙ্গা মিনিট দুই-তিনের পথ। যে ক'দিন ঢাকা গলিপথটি আমার জন্মগ্রহণের ফলে আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছিল, সেই ক'দিন বাহির-মহল এবং অন্দরমহলের মধ্যে যাতায়াত চলল ঐ খিড়কী দুয়ার ধরেই—খিড়কী-দরজার সামনের গলিপথটা বাঁ হাতে সদর দরজার সামনের বড়ো রাস্তার সঙ্গেও মিশেছিল কিনা, তার তো শুরুই ওখান থেকে, শেষ গঙ্গার ধারের চওড়া রাস্তায় মিশে।

এই যে মা আমাকে আমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থানটিকে নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে দিলেন, এ ঘটনাটা যখন ঘটেছিল, তখন আমার বয়েস আট কি নয় বছর। মা আর আমি আমাদের কলকাতার বাসস্থান থেকে চন্দননগরে গিয়েছিলুম একটি বিশেষ প্রয়োজনে। আমাদের ঐ বাড়ী তখন চাবিবন্ধ অবস্থায় খালিই পড়েছিল। আমরা চাবির গোছাটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু ঐ অত বড়ো বাড়ীতে একটি আট বছর বয়সের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে থাকতে মার সাহসে কুলোয়নি। তাই আমরা উঠেছিলুম, আমাদের বাড়ী ঢুকতে ঠিক ডান পাশেই অবস্থিত রায়সাহেব শরৎ বিশ্বাসের বাড়ীতে। মিঃ বিশ্বাস কেন্দ্রীয় সরকারের খুব বড়ো একজন চাকুরে ছিলেন। তাঁর আপিস প্রধানত ছিল দিল্লীতে; গ্রীষ্মকালে ওটা স্থানান্তরিত হ'ত সিমলায়। আমি অত্যন্ত বাল্যে তাঁকে দেখলেও তাঁর সুবৃহৎ মুখমণ্ডলবিশিষ্ট বিরাট বিপুল চেহারাটি আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। তাঁকে যখন দেখেছি, তখন তিনি নিশ্চয়ই কোনও অবকাশযাপন করবার জন্যই বুড়োশিবতলার বাড়ীতে ছিলেন। দিল্লীর পদস্থ রাজকর্মচারী হয়েও তিনি কিন্তু আলবোলায় তামাকু সেবন করতে ভালোবাসতেন। তাঁর স্ত্রীকে আমরা 'গ্যানা' পিসি বলতুম। ভালো নাম 'জ্ঞানদাসুন্দরী' থেকেই এই নামের উৎপত্তি। অবশ্য সম্বোধনের সময়ে,

বলাবাহুল্য, আমরা তাঁকে পিসিমা বলেই ডাকতুম। অত্যন্ত অমায়িক ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন গ্যানা পিসিমা। ও'র একমাত্র পুত্র সত্যদা কিন্তু মানুষ হ'তে পারেননি। বন্ধুবান্ধব নিয়ে তাস-দাবা খেলাতেই তিনি মত্ত থাকতেন। শুনেছি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রকার মাদকের প্রতিও তিনি আসক্ত হয়ে পড়েন। অথচ তাঁর স্ত্রী, যাঁকে বৌদি বলে ডেকে আমি ধন্য হতুম, তিনি কি আশ্চর্য মিষ্টি মানুষই না ছিলেন! তাঁর স্নেহের নির্ঝরিণী ধারা প্রতি মুহূর্তে দাবি করত তাঁকে বৌদি বলে না ডেকে যেন মাতৃ সম্বোধনে অভিষিক্ত করি। গ্যানা পিসি এবং এই বৌদি—দুজনেরই অপর্যাপ্ত স্নেহ আমি আমার জীবনে পেয়েছি।

দিন তিন চার খুব ক'ষে সজনে ডাঁটার ছেঁচকী দিয়ে ভাত খেয়ে আমি মায়ের সঙ্গে কলকাতা ফিরে আসি। কিন্তু এইটুকু বলেই আমার চন্দননগরের কাহিনী শেষ হবে না। আমাকে ১ ০৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগস্ট, মঙ্গলবার দিনটির কথা কইতেই হবে, যে দিন রাত্রি ১০টা ২১ মিনিটে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলুম। শুনেছি, আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমার মা এমন গুরুতর ভাবে পীড়িত হয়ে পড়েন যে, মা আমাকে কোলে পর্যন্ত নিতে পারেননি, বুকের দুধ খাওয়ানো তো দূরের কথা। ফলে বাল্যকালে আমি খুবই দুর্বল ছিলুম। আমার এক জ্যাঠতুতো দিদি—আমার বড় জেঠামশাইয়ের মেজ মেয়ে, নাম ভবানী,—আমার দু' আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত আমাকে কোলে পিঠে মানুষ করেছিলেন। রোগা হলে কি হয়? আমি সাংঘাতিক দুরন্ত ছিলুম। মনে আছে, আমার ঠাকুরমা আমাদের বুড়োশিবতলার বাড়ীর ভিতর মহলের দোতলার বারান্দায় সিঁড়ির খুব কাছেই একটি তক্তপোশের ওপর বেশীর ভাগ সময়েই দেয়ালের গায়ে লাগানো একটি বা দুটি বালিশে পিঠ ঠেকিয়ে আধশোয়া অবস্থায় থাকতেন। তাঁর ডান পাশে একটি টুলের ওপর রাখা থাকত কাঁচের শিশিতে পোরা মিশ্রীর দানা, কিশমিশ জাতীয় জিনিস। আমি প্রায়ই তাঁর তক্তপোশের কাছে ঘুরে বেড়াতুম ঐগুলি খাবার লোভে। ঠাকুরমা সময়ে সময়ে তাঁর শিশি থেকে কিছু কিছু আমাকে খেতে দিতেন। একদিন, ঠিক কি কারণে মনে নেই, আমি ঠাকুমাকে কিছু অ-কথা বলেছিলুম। তার জন্যে আমার কি শাস্তি! কান তো মুলতেই হ'ল, তার ওপর আমাকে বলা হ'ল—ঘাট মান্। ছোট ছেলে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তাই বার কয়েক ঐ-কথা শোনবার পরে বলে বসলুম, ঘাট তো গঙ্গার ধারে। শুনে সকলে হেসে ফেললেন, এমন কি, ঠাকুরমা সুদ্ধ।

আমার একটি গুণ ছিল। কানে যা শুনতুম, তা মুখস্থ হয়ে যেত। আমাদের এ বাড়ীর খিড়কি দরজার ঠিক বিপরীতেই একটি একতলা বাড়ীতে পাঠশালা বসত। পাঠশালার প্রচলিত নিয়মে সর্দার পড়ুয়া ধারাপাতের নামতা, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া প্রভৃতি এক-এক করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলত, আর অন্যান্য পড়ুয়ারা তার উক্তিটিকে আবার করে একসঙ্গে বলত। যেমন, 'দু একে দুই' বলল সর্দার পড়ুয়া; অমনই সকলে সমস্বরে বলল, দুই একে

দুই। এখন ঐ দু'বছর বয়সেও এ সর্দার পোড়োর ধারাপাত পড়ানো আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। একদিন হয়েছে কি, আমি আছি আমাদের বাড়ীর দোতলার বারান্দায়; ভবানী দিদি আমাকে তেল মাখাচ্ছেন। কানে এল সর্দার পোড়োর পড়ানো—দুই একে দুই। অমনই আমি রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে খুব চেঁচিয়ে বলে উঠলুম—দুই দুগুণে চার। সর্দার পড়ুয়া যখন বললে—দুই দুগুণে চার, আমি বললুম—তিন দুগুণে ছয়। পণ্ডিতমশাই বেত উঁচিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন—এ-ই, ক্যারে? ছেলেদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল। পণ্ডিতমশাই বুঝতে পারছেন না, ব্যাপারটা কি? তখন ছেলেরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, অপকর্মটি করছে কে। পণ্ডিত ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এসে তাদের নির্দেশমত তাকিয়ে দেখেন—চাটুজ্যে বাড়ীর এক দিগম্বর বাচ্চা ছেলে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে হেসে খুন হচ্ছে। পণ্ডিত অগ্নিশর্মা হয়ে আমাব দিকে বার কয়েক বেত্র আস্ফালন করে আবার ক্লাশের ভেতরে ঢুকে গেলেন।—দৃশ্যটি আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে।

এর পরেই আমার মনে পড়ছে আমরা কলকাতা শহরের শ্যামবাজার স্ট্রীটের ১৫২ নম্বর বাড়ীতে। ঠিক কোন্ দিন, কোন্ মাসে ও বছরে আমরা অর্থাৎ আমি আমার মা, বাবা ও দাদার সঙ্গে চন্দননগর বুড়োশিবতলার বাড়ী ছেড়ে কলকাতার এই বাড়ীটিতে এসে হাজির হয়েছিলুম সে তথ্য আমার জানা নেই। শুনেছি. ম্যালেরিয়ার জ্বালায় উত্যক্ত হয়েই আমাদের এই কাজ করতে হয়। শোভাবাজারের কাছাকাছি অবস্থিত এই দক্ষিণমুখো বাড়ীটি ঐ অঞ্চলে পরিচিত ছিল পাল্‌কি-আড়া বাড়ী নামে; কারণ, ঐ বাড়ীর সদর দরজার ঠিক বাঁ পাশে যে দালানবিশিষ্ট নীচু ঘরটি ছিল, তাতে বাস করত কয়েকজন উড়িষ্যাবাসী খান তিন চার পাল্‌কি নিয়ে। ঐ পাল্‌কিগুলিকে ভাড়া খাটিয়েই তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহিত হত। সালটা ছিল ১৯০৮; ঐ যুগে কলকাতা শহরের যানবাহনের মধ্যে ছিল ঘোড়া-গাড়ী ও পাল্‌কি। এই পাল্‌কিতে সাধারণত এক বা দুজন লোককে বয়ে নিয়ে যেত চারটি বেহারা; মুখে তারা ছড়া কাটত ঃ—ধাকুন, ধুকুন; সঁড়া বড় ভারী ইত্যাদি। কখনও কখনও সঙ্গে একটি বা দুটি বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে ফাউ হিসেবে চ'লে যেত। আমার বেশ মনে আছে, একদিন আমি আমার মায়ের সঙ্গে পাল্‌কি চেপে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলুম। বাগবাজার কাশী মিত্র ঘাটে এ পাল্‌কির মধ্যে বসেই মা এবং আমি স্নানপর্বটি সেরেছিলুম। বেহারারা গঙ্গাজলে আধ হাত পরিমাণ পাল্‌কিটিকে ডুবিয়ে ধরেছিল এবং মায়ের আদেশমত পাল্‌কিটিকে বার দু'তিন সম্পূর্ণ ডুবিয়ে আমাদের অবগাহন স্নান করিয়েছিল।

আমাদের ঐ ১৫২ নম্বর শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ীটি ছিল উত্তর দক্ষিণে বেশ লম্বা এবং দ্বিতল। যতোটা লম্বা, ঠিক সেই অনুযায়ী চওড়া নয়। আমরা থাকতুম ভিতরের অংশটায়। আমাদের অংশে দ্বিতলে ছিল তিন খানি ঘর এবং একতলাতেও ছিল অনুরূপভাবেই তিনখানি ঘর। বাড়ীটির

আর একটি বিশেষত্ব ছিল; এর পূর্বদিকের টানা অংশটি ছিল বাকী অংশ থেকে অন্তত ফুট তিনেক উঁচু। আমরা থাকতুম, ঐ পূব অংশেরই একেবারে শেষের ঘরখানিতে। তাই দালান থেকে কাঠের একটি তিন-চার ধাপওলা সিঁড়ি বেয়ে ঐ ঘরে যেতে হত। আমাদের ঠিক বিপরীতের ঘরখানিতে—যা নীচু অংশে অবস্থিত ছিল—থাকতেন আমার ছোটকাকা ও কাকীমা তাঁদের একমাত্র পুত্রসন্তানটিকে নিয়ে। আর মাঝের ঘরখানিতে থাকতেন আমার বৃদ্ধা ঠাকুরমা। এখানে আর উনি তক্তপোশের উপর শুতেন না। ওঁর বিছানা ছিল মেঝের ওপরেই পাতা। নীচে একতলায় ছিল রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর প্রভৃতি। বাড়ীর সামনের অংশে থাকতেন সপরিবারে ডাক্তার রসময় বসু। তাঁর বৃদ্ধ পিতা বিহারীলাল বসুও তাঁরই কাছে থাকতেন। তাঁর তিন ছেলে চন্দ্রমোহন, সূর্যমোহন ও তারামোহন এবং দুই যমজ কন্যা—কমলা ও বিমলা। এই কমলা-বিমলা ছিল আমার সমবয়সী এবং খেলার সাথী। একটা খেলার কথা বেশ মনে আছে। কমলা হ'ত রোগিণী, বিমলা রোগিণীর মা এবং আমি ডাক্তার। আমি রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করতুম, জিভ দেখতুম, বগলে একটা ভাঙা হিক্স্-এর থার্মোমিটার গুঁজে দিয়ে দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করে বলতুম—১০৪০। তারপর একখানা কাগজে খচ্‌খচ্ করে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখতুম। রোগিণীর মা তখন মাথায় তোলা ঘোমটার আড়াল থেকে খুব নিম্ন স্বরে প্রশ্ন করত—ডাক্তারবাবু, ও কি খাবে? অমনই খ্যাঁক খ্যাঁক করে জবাব দিতুম—খাবে আবার কি? দুধসাবু। একটু মিছ্‌রি খেতে পারে। এ-ব্যাপারটা হত আমাদের গৃহ-চিকিৎসক মণীন্দ্রলাল মিত্রের হুবহু অনুকরণে।

১৫২ নম্বর বাড়ীতে আমার জীবনের দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমটি হচ্ছে, আমার স্কুলে ভর্তি হওয়া। ১৯১১ সালের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় অর্ধের কোনও একদিন সরস্বতী পুজো হয়েছিল। ঐ দিনই আমার হাতেখড়ি হয়। হাতেখড়ি দেওয়ান বিমলা জেঠামশাই—বিমলা চক্রবর্তী। তিনি নগেন্দ্রনাথ সেনের 'কেশরঞ্জন তৈল' অফিসে কাজ করতেন। আমাদের নীচের ভাঁড়ার ঘরের প্রশস্ত মেঝেতে আমার হাতেখড়ি দেবার জন্যে জেঠামশাই আমার হাতে রামখড়ি সোজা করে ধরিয়ে দিয়ে, নিজের ডান হাতের মুঠি দিয়ে আমার ডান হাতের মুঠি চেপে ধরে লেখাতে লাগলেন। প্রথমেই ক। মাত্রাটি গোড়ায় লিখিয়ে জেঠামশাই যেই 'ক' অক্ষরের প্রথম বেঁকা টানটি দেওয়াতে যাবেন, অমনই আমি লেখা থামিয়ে প্রশ্ন করলুম—প্রথমে তো অ-আ, তারপরে তো ক-খ? জেঠামশাই কণ্ঠস্বরে একটু জোর দিয়েই, প্রায় ধমকের সুরে বললেন, 'যা লেখাচ্ছি, লেখো; লেখো—ক, ক-এ কৃষ্ণ। বুঝলুম প্রথমেই 'ক' লেখা কেন। কিন্তু 'খ' লিখতে গিয়ে বাধল বিপত্তি। 'খ'-এর আঁকাড়িটি কাটবার পরেই আমি ব'লে বসলুম, জেঠামশাই, আমার হাতটা ছেড়ে দিন, আমার লেখা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এইখানে একটি প্রায় অবিশ্বাস্য কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে। আমি অপরের দেখে দেখেই অত্যন্ত ছোট বয়সেই লিখতে শিখে গিয়েছিলুম। লেখাটা আমার কাছে একটা খেলা ছিল। হাতের

কাছে চক্-খড়ি বা মাটির ঢেলা কিংবা ভাঁড়-খুরিভাঙা পেলেই আমি হয় মেঝেতে, নয় কাঠের দরজায় আমার শ্রীহস্ত দিয়ে লিখে ফেলতুম—অ-আ-ই-ঈ বা ক থেকে শুরু ক'রে একেবারে ং ঃ ঁ পর্যন্ত এবং অপর দিকে ১, ২, ৩ থেকে ১০০ পর্যন্ত। কেউ যে আমাকে এই লেখা শিখিয়েছেন কোন দিন, এ-কথা আমার মনে পড়ে না এবং সাক্ষ্য হিসেবে আমার মা-বাবাও বলতেন, এ-সব পড়া বা লেখা কেউ কোনওদিন আমাকে শেখাননি। কিছুদিন কলকাতায় থাকবার পরেই আমার ছোটকাকারা যখন এই বাড়ী ছেড়ে বর্ধমান চলে যান (ব'লে রাখা ভালো, কলকাতায় গ্রে স্ট্রীট ও চিৎপুর রোডের মোড় বরাবর ছোটকাকার একখানি পোশাকের—জামা, পাঞ্জাবি, বডি, সেমিজ, হাফপ্যান্ট ইত্যাদির দোকান ছিল। মনে হয়, ঐ দোকান ঠিকমত চালাতে না পারায় উনি কলকাতা ত্যাগ করেন), তখন ওঁদের ব্যবহৃত ঘরখানি এসে দখল করেন আমারই দাদামশাই ও দিদিমা—মাতামহ এবং মাতামহী। ওঁরা এর আগে কোথায় ছিলেন, তা আমার জানা নেই। কিন্তু এরই আগে আর একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, যা না বললেই নয়।

আমরা যে ঘরখানিতে থাকতুম, সেটি বেশ বড় সাইজের ঘর। তার একেবারে উত্তর প্রান্তে দুটি বড়ো বড়ো তক্তপোশ জুড়ে আমাদের ঢালা বিছানা। একই বিছানায় শুতাম বাবা, মা, দাদা এবং আমি। দাদা আমার থেকে বছর আড়াইয়ের বড়ো। একদিন ভোরবেলা হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখি, ঘরে কেউ নেই একমাত্র আমি ছাড়া। আমি তো রীতিমত হতভম্ব। বিস্ময় কাটতে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দরজার কাছে দৌড়ে গিয়ে দেখি, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ—তালা দেওয়া ছিল না, শুধু বাইরের শিকলটা তোলা ছিল। ঘরের ভিতর থেকে তো খোলবার কোনও উপায় নেই, কাজেই দুমদাম করে চাপড় বসাতে লাগলুম এবং তার সঙ্গে চীৎকার। শিগ্‌গিরিই ডাক্তারবাবুদের বাড়ীর কেউ এসে শিকল খুলতেই প্রায় ছিটকে বাইরের বারান্দায় নেমে দাঁড়ালুম—নাঃ, আমাদের বাড়ীর কাউকে দেখতে পেলুম না এবং আচমকা নজর পড়ল—ঠাকুমার ঘরটি একেবারে খালি। পাঁচ, সাড়ে পাঁচ বছর বয়েস; কিন্তু তখনই বুঝতে পেরেছিলুম, আমার ঠাকুমা মারা গিয়েছেন এবং সবাই মিলে তাঁর দেহটিকে নিয়ে গিয়েছেন—কোথায়, কে জানে।

আজ আর মনে নেই, রসময় বসু ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে আমি কী ব'লে ডাকতুম; মনে হয়, মাসীমাই বলতুম। যাই হোক, তিনি নিজে এসে আমাকে মুখহাত ধুইয়ে বাসি নিকার পোকার (একই সঙ্গে হাতকাটা জামা ও পাতলা হাফ-প্যান্টের কাজ করত, এমন পোশাক) ছাড়িয়ে কাচা টাট্‌কা পোশাক পরিয়ে দিলেন। ঐ সঙ্গে মুড়ি-মুড়কী গোছের জলখাবারও খেতে দিলেন। এর পরে সারাদিন কি করেছিলুম, কখনই বা আমার বাবা, কাকা প্রভৃতি দাহকার্য শেষ করে ফিরেছিলেন, সে কথা আজ আর আমার মনে নেই।

কিন্তু আজও বেশ মনে আছে, চন্দননগরের বুড়োশিবতলার দোমহলা বাড়ীতে ঠাকুরমায়ের শ্রাদ্ধের দিনের কথাটি। আমার বাবারা ছিলেন চার ভাই।

তাই চার ভাইয়ের তরফে চারখানি সম্পূর্ণ শয্যাসমেত—এমনকি মশারি পর্যন্ত—খাট, তৈজসপত্রাদি বাইরের মহলের শ্রাদ্ধবাসরে সুসজ্জিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণবিদায় যথারীতি সুসম্পন্ন হয়েছিল। লোকজনও প্রচুর খেয়েছিলেন। কলকাতা থেকে রসময় ডাক্তারের পরিবারের অনেকে গিয়েছিলেন, এমন কি, ডাক্তারবাবুর বৃদ্ধ পিতা বিহারীবাবু পর্যন্ত। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে একটি বিশেষ পদ ছিল—রসমুণ্ডির চাটনী। সে যুগে রসগোল্লার ক্ষুদে সংস্করণ রসমুণ্ডি পাওয়া যেত এক পয়সায় চারটে ক'রে। এখনকার সাধারণ লোকের কথা ছেড়েই দিন, মিষ্টির দোকানী বা ময়রারাই হয়তে বলতে পারবেন না—রসমুণ্ডি কাকে বলে।

আগেই বলেছি, আমার ছোট কাকারা কলকাতা ছেড়ে বর্ধমানে চলে গেলে তাঁদের ফেলে যাওয়া ঘরখানিতে এসে উঠেছিলেন আমার মাতামহ ও মাতামহী। কলকাতায় এসে কয়েক দিনের মধ্যেই আমার দিদিমা ডাক্তার-গিন্নীর সঙ্গে শুরু করেছিলেন প্রতিদিন সকালে গঙ্গাস্নানে যাওয়া। বেশ মনে পড়ে, প্রায়ই তিনি গঙ্গাস্নান থেকে ফিরে আমাদের বারান্দাটিতে পা দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেন—তাঁর গুণধর নাতি সারা বারান্দা জুড়ে অ-আ, ক-খ লিখে রেখেছে, পা ফেলবার জায়গা রাখেনি। বিদ্যের ওপর পা দেবেন কি করে! ডাক পড়ত আমার মায়ের: "নলু, (আমার মায়ের নাম ছিল নলিনী) বারান্দাটা একটু মুছে দিয়ে যা মা; তোমার ছেলে সারা বারান্দায় বিদ্যে ফলিয়ে রেখেছে।"

হাতেখড়ি হয়েছিল সরস্বতী পুজোর দিন। তার পরদিনটা সব স্কুল-কলেজেই ছুটি থাকে। কাজেই তারও পরদিন আমার বাবা আমাকে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ীর সবচেয়ে নিকটতম স্কুল—শ্যামবাজার মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ে। পাড়ার লোকে বলত বাঙলা স্কুল; কেউ কেউ বলত, জগবন্ধু ময়রার পাঠশালা। জগদ্বন্ধু মোদক ছিলেন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত, হেড পণ্ডিত। পরে জেনেছিলুম, ওঁর উপাধি মোদক হ'লেও উনি আসলে ময়রা ছিলেন না, উনি ছিলেন মধু-মোদক সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে যিনি ওঁর ক্ষৌরি করেছিলেন, সেই বংশজাত। কণ্ঠীধারী সেই অমায়িক, ধর্মনিষ্ঠ, পণ্ডিতমশাইকে আমি কোনও দিনই ভুলতে পারব না। যেমন পারব না ভুলতে ঐ মাইনর স্কুলের আরও কয়েকজন শিক্ষককে। হেড মাস্টার পুলিনবিহারী রায়চৌধুরী ছিলেন ঐ বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষার প্রধান শিক্ষক। ইংরাজী ব্যাকরণ তিনি আমাদের, যাকে বলে, গুলে খাওয়াবার চেষ্টা করতেন। মাইনর স্কুলটিতে ছিল সব সমেত আটটি ক্লাশ। শিশুশ্রেণী প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ; তারপরেই ১ম থেকে ৬ষ্ঠ মান। শিশুশ্রেণী দু'টি ক্লাশে শিক্ষক হিসেবে ছিলেন রামসোনা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য এবং বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষোক্ত জন ছিলেন একেবারে বৃদ্ধ; পড়াতেন ধারাপাত। খুব শিগ্‌গিরই তিনি মারাও গিয়েছিলেন। আমাদের শ্যামবাজার স্ট্রীটস্থ বাড়ী, আর ধরুন পাঁচ-সাত মিনিটের পথ দূরের স্কুলের মাঝামাঝি ডানহাতি রাজনারায়ণ

বিশ্বাস লেনের ভিতর দিকে ছিল একটি বড়ো খোলার বাড়ীর বস্তি ; তার নাম ছিল উড়ে পাড়া। এই উড়ে পাড়ারই দুটি বাড়ীতে থাকতেন রামসোনা ও কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য। দু'জনেই ছিলেন যেমন স্বাস্থ্যবান, তেমনই হৃদয়বান। ছেলেপুলেদের বকুনি-ঝকুনি করা তাঁদের কুষ্ঠিতে ছিল না। ও প্রকৃতির মানুষ আজকের পৃথিবীতে নেই। ওঁরাই আমাদের দুই শিশুশ্রেণীতে বাঙলা পড়াতেন—আমাদেরই প্রধান পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক রচিত "সরল পাঠ"—১ম ও ২য় ভাগ। এই বয়সে পিছন দিকে তাকিয়ে বলতে পারি বই দু'খানি অত্যন্ত সুরচিত।

১ম মান থেকে ইংরেজী পড়া শুরু। পড়াতেন পূর্ণচন্দ্র দত্ত। ভদ্রলোকের বাঁ হাতের দুটি আঙুল কাটা ছিল। উনি ক্লাশে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের হিসাব-রক্ষকও ছিলেন ; মাস-মাহিনার টাকা ওঁরই কাছে জমা দিয়ে বিল নিতে হ'ত। এই প্রথম মানে পড়ার সময়ে বছরের দ্বিতীয়ার্ধে আমি এমন গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম যে, বার্ষিক পরীক্ষা দিতে পারিনি। কিন্তু তাই বলে আমার ক্লাশে ওঠা বন্ধ হয়নি। কারণ, সেই শিশুশ্রেণী ১ম বর্ষ থেকেই আমার সম্বন্ধে শিক্ষকদের ধারণা ছিল ভালো। আজ আর মনে নেই ১ম বর্ষের বাৎসরিক পরীক্ষায় আমি ১ম না ২য় স্থান অধিকার করে-ছিলুম, তবে এ-কথা আজও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে, ২য় বর্ষে ওঠবার প্রায় মাসতিনেক বাদে যখন স্কুলের পারিতোষিক বিতরণোৎসব হয়, তখন আমিও প্রাইজ পেয়েছিলুম। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে আছে, সেই উৎসবের সভাপতির কণ্ঠে—বোধ করি, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঐ আসন অলঙ্কৃত করেন—মাল্যদান করবার জন্যে আমাকেই নির্বাচিত করা হয়। প্রায় প্রতিটি পারিতোষিক সভায় এই মাল্যদান পর্বটি আমাকেই সমাধা করতে হত পরপর অন্ততঃ বছর চার-পাঁচ ধ'রে। প্রথম মানে বার্ষিক পরীক্ষাই দিইনি, কাজেই পারিতোষিক পাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তবে ঐ বছরটি ছাড়া ঐ স্কুলের বাকী সাত বছরই হয় ১ম, নয় ২য় বা ৩য় হয়ে প্রাইজ আমি নিয়েছি, যার মধ্যে শেষের কয়েক বছর পেয়েছিলুম রৌপ্য-পদক।

যে ১৯১১ সালে আমি স্কুলে ভর্তি হই, সেই বছরে একবার ফিরে যেতে হচ্ছে দু'টি বিশেষ কারণে। এক, ঐ বছরের শীতকালেই, বড়দিনের সময়ে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও মহারানী মেরী এসেছিলেন কলকাতায়। আমি আমার বাবার আপিসের দারওয়ান মটুক সিংয়ের কাঁধে চেপে ১৬ কি ৩২ ঘোড়ার গাড়ীতে তাঁদের দেখেছিলুম রেড রোডের পূর্ব দিকের বাঁধানো নীচু প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে। উঃ, কি ভীড়, কি ভীড়! রাজারানীর গাড়ী লাটপ্রাসাদের দক্ষিণ দরজা থেকে বেরিয়ে ঐ রেড রোড ধরে দক্ষিণ মুখে,—আজ মনে হয়, সম্ভবত আলিপুরের বেলভেডিয়ার অভিমুখে এগিয়ে গিয়েছিল।

১৯১১ সালে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। ঐ সময়ে ইংরাজদের খ্রীস্টমাসের সময়ে—যাকে আমরা বলি বড়দিন, সেই সময়ে কলকাতার

ময়দানে—তখন বলা হ'ত গড়ের মাঠ—বহু তাঁবু পড়ত। তার কোনওটিতে দেখানো হ'ত সার্কাস, কোনওটিতে ম্যাজিক, কোনওটিতে হাস্যকৌতুক এবং কোনওটিতে বায়োস্কোপ। হ্যাঁ, বায়োস্কোপ, যাকে আজকের ভাষায় বলা হয় সিনেমা। ১৯১১ সালেই আমি প্রথম দেখি 'বোসের সার্কাস' ও 'হিপোড্রোম সার্কাস' এবং এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ—সবই বাবার সঙ্গে। এলফিনস্টোন বায়োস্কোপে যে ছবিখানি দেখানো হয়েছিল, তার নাম আজও আমার মনে আছে; ছবিটির নাম হচ্ছে 'ক্যাবিরিয়া'। ছবিটির একটি দৃশ্যে ছিল—একটি নগরীর বেষ্টনকারী প্রাচীরের ওপর থেকে নগর আক্রমণকারীদের ওপর গরম ফুটন্ত জল পিচকারির সাহায্যে বর্ষণ করা হচ্ছে।

শ্যামবাজার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ৫ম মানে পড়বার সময়ে একটি গুরুতর পরিবর্তন হয়েছিল। ঐ বছর গ্রীষ্মাবকাশের পরে আমরা গিয়ে বসেছিলুম পুরানো স্কুলবাড়ীর—যার বয়েস অন্তত পক্ষে ৬০/৭০ বছর হবে তার পরিবর্তে ঐ বাড়ীর পিছন দিককার বেশ অনেকখানি অংশ ভেঙে নতুন নির্মিত ত্রিতল বাড়ীর ত্রিতলের পশ্চিম দিককার ঘরে। শুধু এই নয়, বিস্ময়-ভরা চোখে দেখলুম, ঐ স্কুল বাড়ীর সিঁড়িঘরের বাইরের দক্ষিণ দেওয়ালে অর্ধচন্দ্রাকারে চুন-বালি-সিমেণ্ট দিয়ে বড়ো বড়ো হরফে এবং ইংরাজী অক্ষরে লেখা রয়েছে—SHYAMBAZAR A. V. SCHOOL (অর্থাৎ শ্যামবাজার অ্যাঙ্গলো ভার্নাকিউলার স্কুল)।

এই ১৯১১ সালেই আমি আমার জীবনে প্রথম বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখি। অকুস্থান হচ্ছে স্টার থিয়েটার। মূল পালাটি ছিল খুব সম্ভবত 'মডেল ভগিনী'—প্রণেতা যোগেন বসু লিখিত সুবৃহৎ উপন্যাস 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র নাট্যরূপ। এবং ওর পরে অভিনীত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সংক্রান্ত একটি নাটিকা। মূল পালাটির একটি দৃশ্যে ছিল—একটি পুকুরে হঠাৎ-ডুবে-যাওয়া একটি বালককে এক সুগঠিত দেহবিশিষ্ট ভৃত্য উদ্ধার করবে। মনে হয়, ঐ ভৃত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সে-যুগের জনপ্রিয় নট-নাট্যকার-মঞ্চমালিক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। আর মনে আছে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক নাটিকার একটি দৃশ্য; বালক শ্রীকৃষ্ণের দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে মা-যশোদা একটি প্রকাণ্ড ফটকে আটকানো দুই লোহার কড়ার (শ্রীকৃষ্ণের যুগে লোহার কড়ার প্রচলন ছিল কি? এ-প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে) সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের হাত দু'খানিকে নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে দিচ্ছেন, আর শ্রীকৃষ্ণ গাইছেন:

"বাঁধো মা, বাঁধো মা, বাঁধো মা,
আর আমি পালাব না।"

পরে জেনেছি; বোধ করি, ৭০ বছর বয়েসে জেনেছি, নাটিকাখানি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত "শ্রীকৃষ্ণ"। তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র, হরীন্দ্রনাথ দত্ত মশাই 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে আমাকে ঐ নাটিকাটি খুলে দেখিয়ে দেন আমার মনে-রাখা গানখানিকে—"বাঁধো মা, বাঁধো মা।"

গ্রীষ্মাবকাশের পর থেকে বর্ষশেষ এবং পরের ৬ষ্ঠ মানটুকু পড়া হলেই

এই স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হবে, কারণ আগেই জানিয়েছি, ওটি মাইনর স্কুল। সারা বাঙলাদেশে (অবিভক্ত ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ) কতগুলি মাইনর স্কুল ছিল, সে-তথ্য আমার জানা নেই। তবে প্রতি বছর প্রতিটি স্কুল থেকে দু'জন ক'রে ছাত্র একত্রভাবে মাইনর পরীক্ষা দিত। সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ মাত্র প্রথম তিনজন ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হ'ত। এখন যাকে ক্লাশ সিক্স বলা হয়, ঐ ক্লাশ পর্যন্ত পড়া হ'ত মাইনর স্কুলে। মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা এবং প্রতিটি মাইনর স্কুলের ৬ষ্ঠ মানের বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা হাইস্কুলের ফোর্থ ক্লাশে অর্থাৎ এখনকার ক্লাশ সেভেন-এ গিয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পেত। ঐ যে তিনজন ছাত্রকে বাঙলা সরকার বৃত্তি দিতেন, সেটি চলত চার বছর ধ'রে। এর ফলে ঐ তিনটি বৃত্তিধারী ছেলেকে স্কুলে মাইনে তো দিতেই হ'ত না, উল্টে নগদ ৫ টাকা বৃত্তি সে পেত প্রতি মাসে।

আমাদের ক্লাশে ছিল গুটি চোদ্দ ছাত্র; এর মধ্যে ভালো ছেলে বলতে আমরা ছিলুম পাঁচ ছয়জন—সকলেই প্রায় তুল্যমূল্য। কাজেই ঐ মাইনর পরীক্ষা দিতে যাবার জন্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ দ্বারা কোন্ দু'জন যে নির্বাচিত হবে, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ উৎকণ্ঠা ছিল। শেষ পর্যন্ত যে-দু'জন নির্বাচিত হয়েছে ব'লে ঘোষিত হ'ল (সম্ভবত তাদের নাম ছিল ফণীন্দ্রনাথ বসু এবং অমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায়), তার মধ্যে আমি না থাকায় মনে মনে খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলুম, যা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন, যাঁর নাম ভুবনমোহন দণ্ডী। তিনি হঠাৎ একদিন আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, জোড়াসাঁকোর রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটে যে মাইনর স্কুল আছে, তুমি সেখানে যাও; ওদের কোনও বিশেষ ভালো ছেলে নেই। ওরা পরীক্ষা করা মাত্র তোমাকে পাঠিয়ে দেবে মাইনর পরীক্ষা দিতে। আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তৎক্ষণাৎ বাড়ী চলে এলুম এবং অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম আপিস থেকে বাবা কখন বাড়ী ফিরবেন, তারই জন্যে। যথাসময়ে তাঁকে সব কথা বলতে তিনি আনন্দিতই হলেন এবং পরদিনই আমরা সেই স্কুলে গিয়ে হাজির হলুম। যথারীতি পরীক্ষা করবার পরে তাঁরা সানন্দে আমাকে পাঠাতে রাজী হলেন। কিন্তু এই সময়ে বিদ্যালয় পরিবর্তনের জন্যে নাকি ইন্‌স্‌পেক্টার অব স্কুলস্ আপিস থেকে সম্মতির প্রয়োজন হয়। এ ব্যাপারে আমাদের একটা সুবিধা ছিল। আমাদের ঠিক সামনের বাড়ীতে থাকতেন রাখালদাস মল্লিক নামে এক ভদ্রলোক। তিনি ইন্‌স্‌পেক্টার অব স্কুলস্ আপিসের হেড ক্লার্ক ছিলেন। তাঁকে এই সম্মতি আদায় সম্বন্ধে অনুরোধ করা মাত্র তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, বাঙলা স্কুল পশুপতিকে পাঠাচ্ছে না?" বাবার মুখ থেকে সমস্ত কথা শোনবার পরে তিনি বললেন "আচ্ছা, ব্যবস্থা করছি।" এই কথার দিন দুয়েকের মধ্যে নগেন গাঙ্গুলী নামে সহকারী ইন্‌স্‌পেক্টার অব স্কুলস্ এলেন আমাদের স্কুল পরিদর্শন করতে। তিনি আমাদের ৬ষ্ঠ মানের

ছেলেদের মুখে মুখে কিছু প্রশ্ন করলেন। পরে শুনতে পাওয়া গেল, স্কুল-বোর্ড আমাদের লিখিত পরীক্ষা নেবেন এবং সেই অনুসারে তিন দিন ধরে আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষায় বসতে হ'ল। কয়েকদিন বাদে শোনা গেল, পরীক্ষার ফল থেকে মাইনর পরীক্ষায় বসবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছি আমি এবং ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একটি ছেলে। আমার সে-সময়ের মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। একদিকে নিজে যেতে পাওয়ার জন্যে আনন্দ, অন্যদিকে তেমনই আমাদের বন্ধু দু'টি—ফণীন্দ্রনাথ বসু এবং অমূল্য কুমার মুখোপাধ্যায় না যেতে পাওয়ায় নিরানন্দ। সত্যিই আমরা পাঁচ ছ'জন সম-পর্যায়ের ছেলে পরস্পরের খুবই বন্ধু ছিলুম। আমার তাই মনে হ'তে লাগল, কেন এমন ব্যবস্থা করা গেল না যে, আমাদের স্কুল থেকে এবারে দু'জনের বদলে চারজন ঐ মাইনর পরীক্ষায় বসতে পারবে। যাই হোক, এণ্টালী অঞ্চলে অবস্থিত মডেল স্কুলে ঐ পরীক্ষা দিতে যেতে হয় সম্ভবতঃ ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করছিলুম পরীক্ষার ফলের জন্যে। হঠাৎ একদিন সকালে অবাক হয়ে দেখি, আমাদের বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পূজার আয়োজন হচ্ছে এবং তা সকালেই হবে। পূজা করবেন বাবা নিজে। এখানে ব'লে রাখা ভালো, আমার বাবা একজন প্রচণ্ড সাত্ত্বিক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন; কখনও নিমন্ত্রণ খাননি, দোকানের সন্দেশ, রসগোল্লা ও দই ছাড়া দোকানে তৈরি অন্য কোনও জিনিস স্পর্শ করেননি। দু'বেলা আহারের সময়ে সমস্ত ভোজ্য একসঙ্গে সাজিয়ে দিতে হ'ত; তিনি দেবতাদের উৎসর্গ ক'রে তা·ভোজন করতেন এবং খেতে ব'সে কথা কইতেন না। বাইরে কোথাও জলগ্রহণ পর্যন্ত করতেন না। বাইরে থেকে এসেই কাপড় ছেড়ে ফেলতেন। জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি। সেই বাবা সত্যনারায়ণ পূজা করলেন নিজে। কারণ হিসেবে শুনলুম, বাবা ভোর রাত্রে স্বপ্নে দেখেছেন, ঠাকুর সত্যনারায়ণ ওঁর সামনে এসে বলছেন,' তুই সকালে উঠেই আমার পুজো করবি; তোর ছেলে মাইনর পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। আশ্চর্য! মাইনর পরীক্ষার ফল বেরুতে দেখা গেল, আমি—পশুপতি চট্টোপাধ্যায় সত্যিই পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি। জানুয়ারী মাসে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন কলেজ স্ট্রীটস্থ হিন্দু স্কুলে ভর্তি করতে। ফোর্থ ক্লাসে (আজকের ক্লাস সেভেন) ভর্তি হলুম।

কিন্তু আমার আগেকার শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল সম্পর্কে একজন শিক্ষকের কথা না বললে আমাকে প্রত্যবায়ভাগী হ'তে হবে। তাঁর নাম হচ্ছে নুটবিহারী রায়। বর্ধমান জেলার উগ্রক্ষত্রিয় বংশের সন্তান তিনি। বাঙলা স্কুলে মাস্টারী করেই তাঁর জীবন কেটেছে। তৃতীয় মান থেকে ষষ্ঠ মান পর্যন্ত তিনি পড়াতেন বিভিন্ন বিষয়—বাঙলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ থেকে শুরু করে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল পর্যন্ত। আশ্চর্য তাঁর পড়াবার পদ্ধতি এবং প্রতিটি বিষয়ে আশ্চর্য তাঁর দখল। ছেলেরা তাঁকে যমের মতো ভয় করত, অথচ হৃদয়ের মধ্যে তাঁর ছিল ছেলেদের জন্য স্নেহের নির্ঝর। তিনি একটি

কোচিং ক্লাশ চালাতেন স্কুলেই ছুটির পরে। আমি তৃতীয় ও চতুর্থ মানে পড়বার সময়ে ঐ কোচিং ক্লাশে ভর্তি হয়েছিলুম ; কারণ ঐ দু'টি বছর আমার বাবা কর্মোপলক্ষে পাকুড়ে ছিলেন এবং আমার পড়ায় সাহায্য করবার মতো কেউই আমাদের বাড়ীতে ছিল না। আমার থেকে আড়াই বছরের বড়ো দাদা কৃষ্ণকালী পর্যন্ত বাবার সঙ্গে পাকুড়ে গিয়েছিলেন। বাবা প্রতিমাসে মণি অর্ডার পাঠাতেন আমার নামে। নিত্যকারের বাজার হাট থেকে শুরু করে গয়লা ও ধোবার হিসাব, লক্ষ্মী-সরস্বতী-সত্যনারায়ণ পূজা, সবই আমার ওপর ভার। এই দু'বছর নুটবিহারীবাবুর কোচিনে পড়ায় আমার অংকতে ব্যুৎপত্তিলাভে যে কত সাহায্য করেছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার জীবনে চলবার পথকে প্রশস্ত করতে আমার শিক্ষাগুরু নুটবিহারী রায়ের দান আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের দ্বিতীয় মানে পড়বার সময়ে, যখন আমি মাত্র আট বছর বয়সের বালক, তখনকার একটি বিশেষ ঘটনার কথাও এখানেই উল্লেখ করতে হয় : কারণ সেই ঘটনা আমার জীবনপথের একটি বিশেষ মোড়—যা আমার প্রায় সমস্ত জীবনটাকেই একটি বিশেষ পথে চালিত করেছে।

১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে রসময় ডাক্তাররা মদনমোহনতলার নিকটবর্তী লালবাগানে নতুন বাড়ী করে চ'লে যান। সেই কারণেই বোধহয় ১৫২ শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়ী ছেড়ে আমরাও ৮ শ্যামবাজার স্টীটে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দুর্গাদাস হাজরার বাড়ীর দোতলায় খান দুয়েক ঘর ভাড়া নিয়ে চলে আসি। কিন্তু ওখানে আমাদের বেশী দিন থাকতে হয়নি। ঐ বছরেরই আগস্ট মাসের পয়লা তারিখে আমরা নিকটবর্তী রামচন্দ্র মৈত্র লেনের ১১ নম্বর বাড়ীখানি খরিদ ক'রে—যতদূর জানা আছে, মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার টাকায় খরিদ ক'রে—ঐ বাড়ীতে চ'লে আসি। ভীষণ পুরোনো দোতলা বাড়ী, ওরই মধ্যে আবার দু'টি অংশে ভাগ করা। দোতলায় একখানি বড়ো ঘরকে সম্পূর্ণ কাঠের পার্টিশন দিয়ে দু'খানি ঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। বাড়ীর উত্তর ও দক্ষিণ অংশে দু'টি খাটা পায়খানা।

আমরা বাস করতে এলুম বাড়ীটির উত্তর অংশে। উত্তর অংশের ঠিক উত্তরে, আমাদের বাড়ীর লাগোয়া ১০ নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন ছিল একটি গাড়ীর আস্তাবল ; ফলে উত্তর অংশটিতে একটু বাড়তি আলো হাওয়া ছিল। দক্ষিণ অংশটি স্বাভাবিক ভাবেই কিছু চাপা ; কেননা তার ঠিক দক্ষিণেই ১১/১ নং বাড়ীটি এবং দুই বাড়ীর মাঝে আজকালকার নীতি অনুযায়ী অন্তত চার ফুট কেন, এক ইঞ্চিও ফাঁক ছিল না।

শ্যামবাজার স্ট্রীট থেকে রামচন্দ্র মৈত্র লেন উত্তরমুখো ঢুকে একটু অগ্রসর হ'তে না হ'তেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটি অপেক্ষাকৃত চওড়া অংশ পশ্চিমমুখো কিছুদূর অগ্রসর হয়েই ১৪ নম্বর বাড়ীর গেটের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছে ;

ঐ অংশে আছে (অন্ততঃ তখন ছিল) ১২ থেকে ১৭ নম্বর বাড়ী। আর লেনের প্রধান অংশটি যেটি অপেক্ষাকৃত সরু, সেটি উত্তরমুখো বেশ খানিকটা গিয়ে ডাইনে পূবমুখো মোড় নিয়ে আর খানিকটা গিয়ে আবার বাঁয়ে মোড় নিয়ে উত্তরমুখো কয়েক হাত গিয়েই ফের ডাইনে ঘুরে মাত্র ফুট দশেক এগিয়েই ৭ নম্বর বাড়ীর সরু গেটের সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। অথচ এই সরু অংশটিই লেনের প্রধান অংশ এবং এতে ১ নম্বর থেকে শুরু করে ২, ২/১, ৩ ক'রে ১১/১ নম্বর পর্যন্ত অনেকগুলো বাড়ী। আমাদের বাড়ীটি এই প্রধান অংশটির বাঁ হাতি অর্থাৎ পশ্চিমে দ্বিতীয় বাড়ী। আমাদের বাড়ীর পূর্ব দিয়ে রামচন্দ্র মৈত্র লেন উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এবং ঠিক বিপরীতের বাড়ীটির ছিল ২/১ নম্বর। এই ২/১ নম্বর বাড়ীতেই থাকতেন পূর্বকথিত রাখালদাস।

আমরা গিয়েই বাড়ীটির যথাসম্ভব সংস্কার করি; তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে দোতলায় ওঠবার পুরোনো সিঁড়িটাকে ভেঙে নতুন করা এবং খাটা পায়খানার পরিবর্তে ড্রেন পায়খানা তৈরী করা। তা ছাড়া আমাদের উত্তর-পশ্চিম কোণের খালি জায়গাটিতে একটি ঠাকুরঘর তৈরী করা। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পরিবারের একটি ঠাকুরঘরের প্রয়োজন আছেই; প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ, ভাদ্র-পৌষ-চৈত্রে লক্ষ্মীপূজো, সরস্বতী পূজো প্রভৃতি লেগেই আছে। তা ছাড়া বাড়ীতে আছেন বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ। একটা কথা এখানে বলা হয়নি। বাড়ীটি কিনেছিলেন আমার মাতামহ রামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় আমার দিদিমা হেমাঙ্গিনী দেবীর নামে। আমার মা, নলিনী দেবী ছিলেন ওঁদের প্রথম সন্তান। শুধু তাই নয়; ওঁদের প্রায় আট-দশটি সন্তানের মধ্যে একমাত্র জীবিত সন্তান। কাজেই ওঁরা মেয়েজামাইকে শেষ বয়সে নিজেদের কাছেই রেখেছিলেন।

আমার মতো একটি আট বছর বয়সের ছেলে একটি নতুন পল্লীতে গিয়ে, স্কুলের ছুটির পরে বাড়ীতে এসে জামাকাপড় ছেড়ে, মুখহাত ধুয়ে কিছু জলখাবার খাবার পরে কি করতে পারে? আমি আমাদের বাড়ীর সদর দরজায় চুপটি করে ব'সে থাকতুম, আর দূরে, যেখানে রাস্তাটি ডাইনে পূব দিকে মোড় নিয়েছে, সেইখানে উত্তর দিককার খোলা জায়গাটিতে পল্লীর কিছু ছেলে জড়ো হয়ে হুটোপাটি করত, তাই দূর থেকে দেখতুম।

এই ভাবেই দু'তিন দিন কাটবার পরে হঠাৎ একদিন অবাক বিস্ময়ে নজরে পড়ল, আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী-মশাই ঐ উত্তর দিক থেকেই কালো ছড়ি হাতে দক্ষিণ মুখো এগিয়ে আসছেন; আমি তাড়াতাড়ি উঠে আমাদের সদর দরজাটিকে বন্ধ ক'রে দিলুম কিছুটা ফাঁক রেখে; উদ্দেশ্য, ফাঁক দিয়ে যখন দেখব, তিনি আমাদের বাড়ীটা ছাড়িয়ে চলে গেছেন, তখন আবার দরজা খুলে বসব। তাই করলুম এবং পরে যখন প্রায় সন্ধ্যে হব হব, তখন ঐ বাইরের ঘরের সদর দরজাটি বন্ধ করে ভিতরের ছোট্ট উঠানটিতে গিয়েই মাকে সামনে পেলুম। তাঁকে সোৎসাহে বললুম, "জানো, মা, আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী মশাই আমাদের এই পাড়াতেই থাকেন।" বলে যা দেখেছি ও যা

করেছি, তা তাঁকে বলতে তিনি বললেন, "বোকা ছেলে কোথাকার! তাঁকে দেখে লুকিয়ে পড়বার কি আছে? তিনি না হয় তোমায় দেখতেন, তাতে ক্ষতি কি ছিল? হয়, তাঁর স্কুলের ছেলে ব'লে চিনতে পারতেন, না হয় পারতেন না; তাঁর ইস্কুলে তোর মতো তো কতো ছেলেই পড়ে।"

ঠিক পরের দিনই আবার। আবার দেখলুম, আমাদের সেক্রেটারীমশাই ঠিক সেই ভাবেই কালো ছড়ি হাতে এগিয়ে আসছেন। আজ কিন্তু আমি আর লুকিয়ে পড়বার কোনও চেষ্টা করলুম না, গ্যাঁট হয়ে ব'সে রইলুম। বুকটা অবশ্য একটু কেমন যেন দুড়-দুড় করছিল। দেখলুম, তিনি চলতে চলতে আমাদের বাড়ীটা যেন পেরিয়েই চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ চোখ ফেরালেন আমার দিকে এবং প্রায় নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে দেখতে এক পা এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস ক'রে বসলেন, "তুমি আমাদের স্কুলে পড় না?" মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলতেই জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখানে বসে কী করছ?" জবাবে বলতেই হ'ল, "আমরা এই বাড়ীতে নতুন এসেছি কিনা; কাউকে চিনি না তাই এইখানে ব'সে আছি।" "বাড়ীতে এখন তোমার কে আছেন?" "মা"। "তুমি তাঁকে ডাক তো, আমি তাঁর সঙ্গে কথা কইব; তোমার নাম পশুপতি, না?" "আজ্ঞে হ্যাঁ", বলেই ভিতরে মার কাছে গিয়েই তাঁকে বললুম, "আমাদের সেক্রেটারী-মশাই তোমার সঙ্গে কি কথা কইবেন, তোমাকে ডাকছেন।" "দূর! আমি কি যাব তাঁর সামনে?"

মায়ের কথাটি বাইরে থেকে সম্ভবত শুনতে পেয়ে তাঁর কাছে আমি পৌঁছোবার আগেই সেক্রেটারীমশাই ব'লে উঠলেন একটু গলা উঁচু ক'রে, "না, বৌমা, আমার সামনে আসতে হবে না, দরজার আড়াল থেকে শুনলেই হবে। আমাদের স্কুলের বহু ছেলে ছুটির পরে বাড়ী গিয়ে জামাকাপড় বদলে জলখাবার খেয়ে আবার স্কুলে এসে হাজির হয় খেলাধুলো করবার জন্যে। ওখানে গেলে পশুপতির ভালোই লাগবে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তুমি ওকে বেরোবার জন্যে তৈরী ক'রে দাও; ও আমার সঙ্গে যাবে, আবার ফেরার সময়ে ও আমারই সঙ্গে বাড়ী ফিরে আসবে।"

এ স্থলে মার আর গত্যন্তর রইল না। আমি সেক্রেটারীমশাইয়ের সঙ্গে স্কুলে গেলুম। গিয়ে দেখি, বহু ছেলে খেলায় মেতে রয়েছে। আমিও আমার সমবয়সীদের সঙ্গে ভিড়ে পড়লুম। ঠিক সময়ে সেক্রেটারীমশাই আমাকে ডেকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন এবং আমার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সদর দরজা খুলিয়ে আমাকে বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে দেখবার পরে নিজের বাড়ীর দিকে এগোলেন। এইভাবে দিন তিন চার চলবার পরে আমি নিজে থেকেই সেক্রেটারীমশাইকে বললুম, "এবার থেকে আমি নিজেই যেতে পারব। আমি তো একা একাই স্কুলে যাতায়াত করি। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।" "না না, আমার আর কষ্ট কি? তবে তুমি যদি বল, আর তোমার মায়ের যদি অসম্মতি না থাকে—" আমি এক রকম তাঁকে থামিয়েই বললুম, "মাকে আমি এ কথা বলেছি; তাঁর কোনও আপত্তি নেই।" 'তাহ'লে আর

কথা কি ?' বলে তিনি নিজের বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন।

এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত যাঁকে সেক্রেটারীমশাই সেক্রেটারীমশাই বলছি, তাঁর নাম হচ্ছে নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। অবশ্য তখন জানতুম মাত্র অমৃতলাল বসু ব'লেই; কারণ পারিতোষিক বিতরণী সভায় যে বিবরণী-পুস্তিকা প্রচারিত হ'ত, তাতে সম্পাদক রূপে নাম ছিল অমৃতলাল বসু। তিনি যে নাট্যাচার্য, এ কথা পরে জেনেছিলুম। এই নাট্যাচার্যের সংস্পর্শে আসার ফলে আমার জীবন প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছে। কেমন করে সে-কথা পরে যথা সময়ে প্রকাশ পাবে।

এইখানে স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম ইওরোপীয় মহাসমরের কথা এসে পড়ে। আমরা ১১ রামচন্দ্র মৈত্র লেনের বাড়ী কিনি ১৯১৪ সালের ১ আগস্ট তারিখে। আর যুদ্ধ শুরু হয় ৪ আগস্ট। একদিকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, অন্যদিকে জার্মানী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি রাজ্য। তখনকার ভারত ব্রিটিশ-শাসিত দেশ। কাজেই ইংরেজের তরফে যুদ্ধ করবার জন্যে ভারত থেকে সৈন্য সংগ্রহ হ'তে থাকল। আমাদের পল্লীর খুব কাছেই বলরাম ঘোষ স্ট্রীটে ছিল সার ভূপেন বসুর বাড়ী। সেটি উত্তর-কলকাতার বাঙালী সৈন্য এবং যুদ্ধের অপরাপর কর্মীদের সংগ্রহকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল, যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ১৪ নম্বর বাঙালী রেজিমেন্ট এইখানেই তৈরী হয়েছিল। কাজী নজরুল ইসলাম এই যুদ্ধেই পদাতিক সৈন্য রূপে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। যুদ্ধটি ইয়োরোপের মধ্যেই যদিও সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তার ফলে ভারতে প্রধানত ঘটেছিল দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি। মনে আছে, যে কাটারিভোগ চাউলের দাম ছিল মাত্র ৩ টাকা মণ, যুদ্ধকালে তার দাম হয়েছিল ১৪/১৫ টাকা মণ। যে রেলি ব্রাদার্সের লাট্টু মার্কা ধুতির জোড়া ছিল ১ টাকা ২ আনা মাত্র, তার মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ১০/১১ টাকা। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে সৈন্যবেশী ভারতীয়দের মার্চ ক'রে যেতে দেখতুম। যুদ্ধ বছর পাঁচেকেরও ওপর চলার পরে ১৯১৯ সালের ১১ নভেম্বর বেলা ১১টার সময়ে উভয় পক্ষে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়ে যুদ্ধবিরতি ঘটে।

এই ১৯১৯ সালেই ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এমন একজন মানুষের আবির্ভাব হয়, যিনি সমগ্র ভারতবাসীর চিন্তাভাবনাকে একটি নতুন পথে আবর্তিত করলেন। এই ব্যক্তিটির নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ছেলেমানুষ আমি, মাত্র বছর ১৩ বয়েস। কিন্তু এই গান্ধী আমারও মাথার টনক নাড়িয়ে দিল। তখন আমাদের বাড়ীতে আমার মাতামহ রোজ ইংরাজী 'ডেলী নিউজ' (Daily News) পত্রিকা নিতেন। সেই পত্রিকা উল্টে পাল্টে পড়তে শুরু করলুম গান্ধী সংক্রান্ত খবরাখবর। জানলুম, লোকটি গুজরাটী; গুজরাটের কাথিওয়াবাড় অঞ্চলের পোরবন্দরে বাড়ী। বিলতে থেকে ব্যারিস্টারি পাশ ক'রে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ কর্তৃক ভারতীয় নিপীড়নের প্রতিবাদে জেহাদ চালিয়ে কারাবরণ করেন। সম্প্রতি ভারতে এসে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবার কাজে ব্রতী হয়েছেন এবং এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গ-

সাহায্যকারী হিসেবে পেয়েছেন বালগঙ্গাধর তিলক, ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু ও তাঁর পুত্র জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি ব্যক্তিকে। নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগকে কবরস্থ ক'রে গরমপন্থী অহিংস অসহযোগ আন্দালোন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধিজির 'অসহযোগ আন্দোলন' প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। এর একটি অঙ্গ হচ্ছে বিদেশী বর্জন। বিলাতী কাপড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে পোড়ালেন চিত্তরঞ্জন দাশের সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী এবং তাঁর পরিবারের অপরাপর মহিলারা। প্রবর্তিত হ'ল চরকায় সুতাকাটা এবং খাদি বস্ত্র। সারা ভারত যেন এতদিন ঘুমিয়েছিল। হঠাৎ কোন্ এক সোনার কাঠির স্পর্শে জাগ্রত হয়ে দেখল ব্রিটিশের পরাধীনতা শৃংখল থেকে ভারতকে মুক্ত করবার জন্যে সকলেরই মধ্যে এক অস্থিরতা।

১৯১৯ সাল থেকে আমার হিন্দু স্কুলে পড়া শুরু হ'ল। মাস খানেক যেতে না যেতেই বুঝলুম, ওখানকার সহকারী প্রধান শিক্ষক ব্রহ্মকিশোর মুখোপাধ্যায় হচ্ছেন একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি; তাঁর দাপটে সারা স্কুল থরহরিকম্প। সে যুগের হিন্দু স্কুল ছিল সংস্কৃত কলেজের দুই পার্শ্বে অবস্থিত—যেটি কলেজ স্ট্রীটের ধার ঘেঁষে, তাকে বলা হত ওয়েস্টার্ন উইং এবং যেটি অপর দিকে অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের দিকে, তার নাম ছিল ইস্টার্ন উইং। ব্রহ্মকিশোরবাবু প্রত্যহই সাদা ক্যাম্বিসের জুতো প'রে স্কুলে আসতেন। প্রত্যহের মোট ছ'টি ক্লাশের মধ্যে দুটি কি বড় জোর তিনটি পড়াতেন। আর বাকী সময় সারা স্কুলটা ঘুরে বেড়াতেন অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে। যদি কোনও ক্লাশের সামনে দিয়ে যেতে যেতে তাঁর নজর পড়ত কোনও ছেলে তার পাশের ছেলের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা কইছে কিংবা ক্লাশের পড়ার দিকে মন না দিয়ে অন্য কিছু করছে—যেমন লুকিয়ে কোনও উপন্যাস পড়া—,অমনই তিনি সেই ক্লাশের সামনে গিয়ে ছেলেটিকে ডাকতেন এবং কোনও না কোনও রকম শাস্তি দিতেন।

এ-ব্যাপারে ঐ ক্লাশে যে শিক্ষক পড়াচ্ছেন, তাঁর কিছু বলবার জো ছিল না। মাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন অঙ্কের প্রধান শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বক্সী। তিনি যে ক্লাশে থাকতেন, সে ক্লাশের কাছ দিয়েও ব্রহ্মকিশোরবাবু যেতেন না। এ ছাড়া আরও একটি ব্যাপার লক্ষণীয় ছিল। ব্রহ্মকিশোরবাবুর অভ্যাস ছিল, পড়াতে পড়াতে ঘণ্টা বেজে গেলেও পড়ানো বন্ধ করতেন না; এরই জন্য তিনি টিফিনের আগের পিরিয়ডে নিতেন সেকেণ্ড ক্লাশ এবং শেষ পিরিয়ডে নিতেন ফার্স্ট ক্লাশ। সেকেণ্ড ক্লাশে যেমন বহু দিনই আমরা টিফিন করতে পেতুম না, ফার্স্ট ক্লাশে তেমনই এমন একটি দিনও যেত না, যেদিন আমরা যথাসময়ে ছুটি পেতুম। প্রতিদিনই ৩-৪৫ এর পরিবর্তে আমরা ছাড়া পেতুম ৪-৩০ কি ৫টার সময়ে।

এ-বিষয়ে ছেলেদের কিন্তু কোনওদিনও কোনওরকম উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায়নি ; কারণ তাঁর ইংরাজী পড়ানো ছিল আশ্চর্য রকমের মনোগ্রাহী। কিন্তু তাঁর এক-আধটা ক্লাশ ছিল টিফিনের পরে—বিশেষ ক'রে সেকেণ্ড ক্লাশে। এই ক্লাশে ঢুকে তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা ক'রে নিতেন—পরের ঘণ্টায় কার ক্লাশ। যদি শুনতেন, অঙ্কের শিক্ষক উপেন বক্সীর, অমনই তিনি তাঁর নিজের মনকে বোধ করি গুছিয়ে নিতেন এবং পরের ঘণ্টা বাজবা মাত্রই ক্লাশ পরিত্যাগ করে যেতেন অতি ক্ষিপ্রগতিতে।

শুনেছি, আগে নাকি এমন একদিন হয়েছিল, যেদিন ক্লাসের ভিতরে ব্রহ্মকিশোরবাবু তন্ময় হয়ে পড়াচ্ছিলেন, ঘণ্টা বেজে গেছে সে খেয়াল ছিল না, আর ক্লাশেব বন্ধ দরজার সামনে প্রায় মিনিট দশ ধ'রে অধীর ভাবে অপেক্ষা করবার পরে উপেন্দ্র বক্সীমশাই টিচার্স রুমে ফিরে গিয়েছেন এবং তাঁর প্রিয় সিগার ধরিয়ে ধূমপান করছেন। ব্রহ্মকিশোরবাবু তার মিনিট পাঁচেক পরে ঘণ্টা বেজে গেছে শুনে উঠে পড়েছিলেন এবং বক্সীমশাইয়ের কাছে এসে তাঁর ক্লাশে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বক্সীমশাই অচল, অনড় ; তাঁর সাফ কথা 'সিগার ধরিয়ে ফেলেছি, এখন আর সিগার ছেড়ে ক্লাশ নিতে যাব না।'

হিন্দু স্কুলে ব্রহ্মকিশোরবাবু ছিলেন একটি ইনস্টিটিউশান। বলতে পারা যায়, স্কুলের ৮০০ ছেলের প্রায় প্রত্যেকের নাম তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কোন্ কোন্ ছেলের দাদা, কাকা প্রভৃতি ঐ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, তাও তাঁর অবিদিত ছিল না। অমন কোমলে-কঠোরে মানুষ আজকের দিনে বিরল। ছাত্রকে ধমকেছেন, মেরেছেন এবং তার জন্যে অশ্রুপাতও করেছেন। কোনও অন্যায়-কারী ছাত্রকে স্কুলের ছুটির পরে আটকে রেখেছেন, আবার তার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে খাবার আনিয়ে খাইয়েওছেন। হিন্দু স্কুল ছিল তাঁর প্রাণ ; স্কুলের ছেলেরা ছিল তাঁর আত্মজ সন্তান। বাঙলা সরকার বহুবার তাঁকে বদলি করতে চেয়েছে ; কিন্তু তিনি নানা অজুহাতে বদলি রদ করেছেন। শেষ পর্যন্ত এক অদ্ভুত ঘটনার জন্যে তিনি কিছুদিনের জন্যে হাওড়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু সে মাত্র কিছুদিনের জন্যে। আবার তিনি হিন্দু স্কুলে ফিরে আসেন প্রধান শিক্ষক রূপে এবং এই হিন্দু স্কুল থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

যে অদ্ভুত ঘটনার জন্যে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে হিন্দু স্কুল ত্যাগ করে হাওড়া জিলা স্কুলে যান, তা প্রকাশ ক'রে বলা দরকার। আমাদের ঠিক আগের ক্লাশে পড়তেন প্রমোদকুমার ঘোষাল, প্রেসিডেন্সী কলেজে সরস্বতী পূজো করা নিয়ে কোনও শিক্ষকের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় যাঁর নাম আজও কিছু লোকের স্মরণে আছে। ভালো ছাত্র হিসেবে তিনি প্রতিটি শিক্ষককে এতদূর তুষ্ট করতে পেরেছিলেন যে, ব্রহ্মকিশোরবাবু থেকে শুরু ক'রে প্রতিটি শিক্ষকেরই ধারণা হয়েছিল যে, তিনি প্রবেশিকা (ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষায় প্রথম হবেনই হবেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল বেরোতে দেখা গেল, তিনি প্রথম

দশ জনের মধ্যেও স্থান পাননি, হয়েছেন একাদশ।

ব্রহ্মকিশোরবাবু হলেন ভীষণ উত্তেজিত। তিনি টাকা জমা দিয়ে (সে যুগে প্রতি উত্তরপত্র পিছু দশ টাকা জমা দিলে উত্তরপত্র আনিয়ে দেখা যেত, কি রকম উত্তরে কি রকম নম্বর দেওয়া হয়েছে) প্রমোদের ইংরাজী উত্তরপত্র দু'খানি আনিয়ে নিলেন এবং গোপনে এ-তথ্যও সংগ্রহ করলেন যে, একখানি ইংরাজী উত্তরপত্রের পরীক্ষক হচ্ছেন কোনও মাদ্রাসার মৌলভী। তিনি আমাদের ক্লাশে সেই খাতা এনে কোন্ প্রশ্নের কি উত্তর লিখে কিরকম অন্যায়-ভাবে কম নম্বর পেয়েছে সে, তা প'ড়ে প'ড়ে শোনালেন। শুনেছি, এর পরে হিন্দু স্কুল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একখানি চিঠি পাঠানো হয়, যাতে লেখা ছিল, আপনারা এই বিশেষ ছাত্রটির উত্তরপত্র পরীক্ষার জন্যে এমন একজন পরীক্ষক নিয়োগ করেছেন, যিনি ঐ ছাত্রের পায়ের কাছে ব'সে কম-সে-কম দশ বছর ধরে ইংরাজী শিক্ষা করতে পারেন।

কিন্তু তাতে ফল হ'ল উল্টো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'য়ে উঠল হিন্দু স্কুলের প্রতি খড়্গহস্ত। পরের বছর আমরা দিলুম পরীক্ষা। বলতে পারি, আমাদের বছরে বেশ ভালো ছেলের সংখ্যা ছিল অন্তত ৬।৭ জন। পরীক্ষা হয়ে যাবার পরে তো আর কিছু করবার থাকে না; হয় কলকাতার বাইরে বেড়াতে যাওয়া, নয় কলকাতায় থেকেই খেলাধুলো করা বা বই পড়া। মার্চের প্রথমেই পরীক্ষা হয়ে যায়, আর ফল বেরোয় জুনের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে। মে মাসের শেষাশেষি, বোধ করি, এক রবিবারে বেলা ৩টা নাগাদ শুনতে পেলুম, বাবা নীচে থেকে আমাকে ডাকছেন। নেমে গিয়ে দেখি, আমাদের সদর দরজার সামনে রাস্তার ওপরে বাবা এবং ব্রহ্মকিশোরবাবু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমি তৎক্ষণাৎ দু'জনকেই প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতে ব্রহ্মকিশোরবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সংস্কৃততে তুমি কত পেয়েছ বলে মনে কর?"

সংস্কৃত বিষয়টা কোনও দিনই ঐ ব্যাকরণ-কৌমুদীর জন্যে আমার প্রিয় নয়, কেমন যেন খটোমটো লাগত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমি ঐ একটি বিষয়ে ভালো উত্তর দিতে পারিনি। একটু অপেক্ষা ক'রে তিনি বললেন—"মাত্র ৬৭ পেয়েছ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, লজ্জা করে না? ঐটেতে ঠিক মত পেলে আরও কত বেশী নম্বর উঠত।" তুমি পেয়েছ ৫৮৩ নম্বর মোট ৭০০-র মধ্যে। মনে হচ্ছে প্রথম দশ জনের মধ্যে তোমার স্থান থাকবে।"

আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি আবার ওঁদের পায়ের ধুলো নিলুম। কিন্তু এর দিন পনেরো বাদেই আবার ব্রহ্মকিশোরবাবুর আবির্ভাব ঘটল এবং এবারে তাঁর মুখ শুষ্ক। তিনি অত্যন্ত করুণ সুরে জানালেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে, হিন্দু স্কুলের ছেলের খাতা পুনরায় পরীক্ষিত হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এবং ফলে প্রত্যেকের নম্বর অসম্ভব কমে গেছে। এমন কি তুমি ৭৫% অর্থাৎ তারকা (অ্যাস্টারিস্ক) পর্যন্ত পাওনি; তোমার নম্বর নেমে দাঁড়িয়েছে ৫২৩। এ সমস্তই ওই প্রমোদ ঘোষাল সংক্রান্ত চিঠি লেখার ফল। হরিষে বিষাদ নেমে এল।

পরীক্ষার ফল বেরোবার পরে 'মার্ক সীট' আনিয়ে দেখলুম, হ্যাঁ, মোট নম্বর হয়েছে ৫২৩। কি আর করার আছে! সে সময়ে আই এস্-সিতে বঙ্গবাসী কলেজের জোর নাম-ডাক। আমাদের আগের বছর প্রথম দশ জনের মধ্যে সাত জন বঙ্গবাসীর ছাত্র এবং তার মধ্যে প্রথম প্রমোদ ঘোষাল। কাজেই গিয়ে ভর্তি হলুম বঙ্গবাসী কলেজে। সত্যিই ভালো ভালো অধ্যাপকে ভরা কলেজ; তবে প্র্যাক্‌টিক্যালের তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। নামকরা অধ্যাপকের মধ্যে রসায়নে ছিলেন কে. ডি. মল্লিক ও লাডলি-মোহন মিত্র, পদার্থবিদ্যায় প্রমোদ সেন, সুখেন রায় প্রভৃতি, উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞানে স্বয়ং আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু, ইংরাজীতে নীরেন রায়, পুলিনবিহারী কর, জিতেন্দ্র চক্রবর্তী ইত্যাদি। সেকেণ্ড ইয়ারের শেষাশেষি একদিন খবর পেলুম, হিন্দ স্কুলের ব্রহ্মকিশোর মুখোপাধ্যায় শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করছেন। সভাস্থান স্থির হয়েছে ইস্টার্ন হল। এবং সভাপতিত্ব করবেন হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রায় রসময় মিত্র বাহাদুর।

নির্দিষ্ট দিনে, যথা সময়ের কিছু আগেই পেঁছে সভাপতির আসনের যতটা কাছাকাছি সম্ভব নিজের স্থান ক'রে নিলুম। দেখতে দেখতে সভাগৃহ পূর্ণ হয়ে গেল—একেবারে ঠাসাঠাসি ভীড়। সভাপতি বরণ হ'ল। এই প্রথম সুনামধন্য রসময় মিত্রকে চাক্ষুষ দেখলুম। অনেকেই প'ড়ে আশ্চর্য হবেন যে ইনি বেঁচে থাকাকালেই এঁর একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি হিন্দু স্কুলে স্থাপিত হয়েছিল। ব্রহ্মকিশোরবাবু নত মুখে নিজ আসনে উপবিষ্ট। প্রায় ২।৩ হাজার লোকের সভা প্রায় নিস্তব্ধ। হঠাৎ একটি কান্না শোনা গেল। কান্নাটি কিছুতেই থামছে না, বরং উত্তরোত্তর বর্ধিত হচ্ছে। কে কাঁদে? কেন কাঁদে? কে একজন ব্রহ্মকিশোরবাবুর কানে কানে কিছু বলতেই তিনি ব্যস্তভাবে উঠে গেলেন। সভার কার্য আপাততঃ স্থগিত। একটু বাদে দেখা গেল, সেই ক্রন্দনরত ছাত্রটিকে সান্ত্বনা দিতে দিতে ব্রহ্মকিশোরবাবু সভাস্থলের দিকে এগিয়ে আসছেন। শোনা যাচ্ছে তিনি বলছেন—"কি পাগল, ওরে আর কাঁদিস্‌নি, চুপ কর।" কে কার কথা শোনে। ছেলেটি রীতিমত ডুকরে কাঁদছে; তার ভাঙা ভাঙা কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সে বলছে—"আপনি চলে গেলে আমাকে আর কে বকবে, স্যার?" যারা শুনল, তাদের মধ্যে বহুজনেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হ'ল। ব্রহ্মকিশোরবাবুকে বক্তৃতা স্বরূপ কিছু বলতে অনুরোধ করলেন সভাপতি রসময়বাবু। ব্রহ্মকিশোরবাবু উঠে দাঁড়ালেন; বলতে শুরু করলেন—'আমি'—ব্যস, ঐ পর্যন্ত; তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লেন; বক্তৃতা দেওয়া আর হ'ল না। দু' পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সভার সমাপ্তি ঘটল।

ব্রহ্মকিশোরবাবুর বাড়ী ভবানীপুরের গোয়ালটুলিতে; বর্তমানে যাকে টার্ফ রোড বলে। ছেলেরা স্থির করল, ওঁকে ওরা কাঁধে করে ওঁর বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে যাবে। ব্রহ্মকিশোরবাবু বললেন, তোরা পাগল হ'তে পারিস, কিন্তু আমি তো পাগল হইনি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রকাণ্ড ল্যাণ্ডো গাড়ীতে চাপিয়ে

তাতে লম্বা লম্বা দড়ি বেঁধে সেই ল্যাণ্ডো গাড়ী টেনে তাঁকে বাড়ী পেঁাছে দিয়েছিল কম ক'রে শ'পাঁচেক ছাত্র, যাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলুম। এবং শুনলে অবাক হবেন, এই পাঁচশো ছাত্র ব্রহ্মকিশোরবাবুর বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজের হাত থেকে ফলপাকড়ের টুক্‌রা খেয়ে ধন্য হয়েছিল।

ব্রহ্মকিশোরবাবু সম্পর্কে এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। ব্যায়ামবীর বিষ্টু ঘোষের কথা বহু লোকেই জানেন। গড়পার অঞ্চলে তাঁর ব্যায়ামাগার থেকে তাঁর জামাতা বুড্ডা বসু, মণি রায় প্রভৃতি বহু ব্যায়ামবীরের জন্ম হয়েছে। ঊনিশ শো তিরিশ-চল্লিশ দশকে "ঘোষেস্ জিমন্যাসিয়াম" ছিল একটি নামকরা প্রতিষ্ঠান। এই বিষ্টু ঘোষ ছিলেন হিন্দু স্কুলেরই একজন ছাত্র; আমাদের থেকে এক ক্লাশ উপরে পড়তেন। বিষ্টু ঘোষ ছিলেন কিছুটা খর্বাকৃত; আর যখন থার্ড ক্লাশে (বর্তমানের ক্লাশ এইট) পড়তেন, তখন ছিলেন একেবারে তালপাতার সেপাই। একদিন টিফিনের সময়ে ঠিক আমাদের ফোর্থ ক্লাশের সামনেটায় হঠাৎ একটি চড়ের আওয়াজ শুনে চমকে পিছন ফিরতেই দেখি, বিষ্টু ঘোষ মেঝেতে কাৎ হয়ে প'ড়ে রয়েছে; আর ব্রহ্মকিশোরবাবু হেঁট হয়ে তাকে হাত ধ'রে তুলতে তুলতে বলছেন, "এ কিরে! এই সামান্য একটা চড় খেয়ে উল্টে প'ড়ে গেলি? শরীরে কোনো পদার্থ নেই? এই শরীর নিয়ে বাঁচবি কি ক'রে?" ইত্যাদি। বিষ্টু কাঁদবে কি, যাকে বলে, একেবারে অপ্রস্তুত।

এরই কিছুদিন পরে হিন্দু স্কুলে এলেন একজন মাদ্রাজী ব্যায়ামবিদ্; তাঁর পুরো নামটা আজ আর কিছুতেই মনে পড়ছে না; খালি মনে আছে, তাঁর উপাধি ছিল নাইডু। মিঃ নাইডু স্কুলের ছুটির মিনিট পনেরো বাদে (হিন্দু স্কুলে তখন ছুটি হ'ত ৩-৪৫ মিনিটি) এক ঘণ্টার জন্যে একটি ব্যায়াম শিক্ষার ক্লাশ নিতেন। শিক্ষার্থীদের দিতে হ'ত মাসে ৫ টাকা করে। সেই ক্লাশে যেমন আমি ভর্তি হয়েছিলুম, তেমনই বিষ্টুও ভর্তি হয়েছিল। অবশ্য আমি মাস দুই বাদে ছেড়ে দিই; কারণ ৫টার পর স্কুল থেকে বেরিয়ে শ্যামবাজারে বাড়ী ফিরতে ছটা বেজে যেত। ক্লাশটি চলেছিল পুরো একটি বছর ধ'রে এবং বিষ্টু শেষ পর্যন্ত এই ব্যায়াম-ক্লাশে মিঃ নাইডুর প্রিয় ছাত্রতে পরিণত হয়েছিল। মিঃ নাইডুর একটি ছাপানো ছবিওয়ালা ব্যায়ামের চার্ট ছিল এবং সেই প্রথম ঐ মিঃ নাইডুর মুখেই আমরা যোগব্যায়ামের নাম শুনি। ভাবি, ভাগ্যে বিষ্টু ব্রহ্মকিশোরবাবুর হাতের চড় খেয়েছিল, তাই সে পরে ব্যায়ামবীর বিষ্টু ঘোষ হবার প্রেরণা পেয়েছে।

খেলাধুলোয় কোনও দিনই আমি পোক্ত ছিলুম না। ঐ যে ছুটির পরে শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের বিস্তৃত উঠানে ছেলেরা খেলাধুলায় মেতে উঠত তাতে কিছু দিন যোগ দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু বোধ করি, আমার শারীরিক দুর্বলতার জন্যেই সেই খেলায় তেমন উৎসাহ পেতুম না। তাই বেশীর ভাগ

দিনই চুপ করে বসে খেলা দেখতুম। অমৃতলালবাবু উঠানের এক প্রান্তে একটু তফাতে একখানি চেয়ারে ব'সে গড়গড়ায় ক'রে ধূমপান করতেন। তাঁর কল্‌কে দু'রকম হ'ত ; এক, সুল্ফা এবং দুই, তাওয়া। তাওয়া বেশ ফাঁদালো, বড়ো সাইজের কল্কে। তাঁর কাছাকাছি আরও খান দুই চেয়ার এবং গুটি দুই বেঞ্চি রাখা থাকত। বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি এলে চেয়ারে বসতেন, নইলে বেঞ্চে। যখন পুরোনো বাড়ীর অনেকখানি ভেঙে ফেলে প্রকাণ্ড উঠোনের শেষ প্রান্তে নতুন তেতলা বাড়ী উঠল, সেই বাড়ীর নীচের তলার কিছু চওড়া বারান্দায় অমৃতবাবুর বৈকালিক আসর বসত। ওদিকে পল্লীর বিখ্যাত ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষের ছোট ছেলে (তিনিও মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়তেন) কালদা' ছেলেদের নিয়ে যখন নানা রকম খেলাধূলায় মত্ত, এদিকে তখন অমৃতলাল বসুর আসরে পল্লীর কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন এবং প্রথম ইয়োরোপীয় যুদ্ধ থেকে শুরু ক'রে বঙ্গোপসাগরে এম্‌ডেন্ জাহাজ ডোবানো, বাঙালী ৪৯তম রেজিমেন্টের শৌর্যবীর্য ইত্যাদির সঙ্গে গোষ্ঠ পালের অপূর্ব ফুটবল খেলা, প্রফুল্ল ঘোষের সন্তরণ প্রভৃতি কিছুই বাদ যেত না তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে। এই আসরে প্রায় প্রত্যহই উপস্থিত থাকতেন শোভাবাজার রাজবাড়ীর অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। হারিতকৃষ্ণ দেব এঁরই কৃতবিদ্য সন্তান। অমৃতলাল অসীমকৃষ্ণকে ডাকতেন 'বাহাদুর' বলে।

কোন্ সময়ে জানি না, অমৃতলাল দেখে ফেলেছিলেন, আমার হাতের লেখা গোটা গোটা ও পরিষ্কার। তার ওপর আমি ও'র প্রতিবেশী। আমাদের বাড়ীর ঠিক উত্তরেই যে ঘোড়া-গাড়ীর আস্তাবল ছিল, তারই ও পাশে ৯/২ রামচন্দ্র মৈত্র লেনে থাকতেন নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। আমি, বোধ করি, সবে মাইনর পাশ দিয়ে হিন্দু স্কুলে পড়তে শুরু করেছি, একদিন ও'র এক নাতি—সম্ভবত ও'র বড়ো ছেলে, পশু-চিকিৎসক ক্ষেত্রমোহন বসুর বড়ো ছেলে শ্রীমান প্রীতিভূষণ বসু আমাদের বাড়ীতে এসে আমাকে বললেন, "দাদু ডাকছেন।" কিছুটা বিস্মিত হয়েই আমি একটা জামা পরে নিয়েই তাকে অনুসরণ করলুম। তাঁর বাড়ীর দোতলায় একেবারে সামনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরটায় অমৃতলাল থাকতেন। সেই ঘরের দরজার সামনে গিয়েই আমি থম্‌কে দাঁড়ালুম। দেখলুম, একখানি ধব্‌ধবে সাদা চাদর মোড়া পুরু তোশকের ওপর বসে একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তিনি আলবোলায় তামাকু সেবন করছেন।

প্রীতিভূষণ ভিতরে ঢুকে গিয়ে বলল, "দাদু, পশুপতিদা এসেছে।" তিনি যেন হঠাৎ সচকিত হয়ে বলে উঠলেন, "কৈ ? কোথায় ?" তারপরে ঘরের মধ্যে আমাকে না দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, "ওকি ? বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ? এস, এস, ভেতরে এস।" তাড়াতাড়ি চটি জোড়া খুলে ভিতরে প্রবেশ ক'রেই তাঁকে প্রণাম করতে যাব, অমনি তিনি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "কর কি ? তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান, আমি কায়স্থ ; আমার

প্রণাম করতে আছে ? আমার মহাপাতক হবে যে।" নাঃ, তিনি যখন কোনওমতেই প্রণাম করতে দিলেন না, আমি তখন অগত্যা নিরুপায় হয়ে তাঁকে জোড় হাত করে নমস্কার করলুম ; সঙ্গে সঙ্গে তিনিও প্রতি নমস্কার করলেন। অমৃতলাল যে তোশকটিতে বসেছিলেন, সেটি পুরো ঘরটা জুড়ে ছিল না ; ঘরের অর্ধেকটাতে ছিল শতরঞ্চি পাতা। আমি ঐ তোশক ঘেঁষে শতরঞ্চির ওপরই বসলুম।

অমৃতলাল কিছুক্ষণ আলবোলাতে সুখটান দেবার পরে আমাকে বললেন, "তোমার ত' এখন ছুটি চলছে ; তাই তোমার কিছুটা সময় আমি নিতে চাই।" আমি বললুম. "বেশ ত'! আমায় কি করতে হবে?" "তোমার হাতের লেখাটি পরিষ্কার ; আর আমার লেখা হচ্ছে কাকের ছানা, বগের ছানা। তাই আমার মাথায় যা-কিছু চিন্তা আসে, তা আমি মুখে ব'লে যাব, তুমি লিখে নেবে। অর্থাৎ তোমায় আমার গণেশের কাজ করতে হবে।" বলা বাহুল্য, আমি সানন্দে রাজী হলুম। "তা হলে আজই শুরু করা যাক, কি বল ?" ব'লেই তিনি কয়েকখানি সাদা ফুলস্কেপ কাগজ এবং দোয়াত কলমের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। প্রথম দিনে ঘণ্টাখানেক ধরে কোনও প্রবন্ধ কিংবা দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলুম, তা আজ আর আমার মনে নেই।

ইতিমধ্যে একটি কথা বলে রাখা ভালো। লেখাপড়ার ব্যাপারে অংকশাস্ত্রে আমার একটা সহজাত ব্যুৎপত্তি থাকলেও বাঙলা সাহিত্যের প্রতি আমার অত্যন্ত প্রীতি ছিল ছোটবেলা থেকেই। ছোট গল্প, উপন্যাস ও নাটক—তিনই আমি পড়তে ভীষণ ভালোবাসতুম। আবৃত্তির প্রতি আমার জন্মগত দক্ষতা থাকায় বাঙলা স্কুলের প্রতিটি উৎসবেই আমাকে একটা না একটা আবৃত্তি করতেই হ'ত। এ-ছাড়া বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বেশ অভিনয়ের মতো ক'রে আমি নাটক পাঠ করতুম। নাটক দেখার প্রতিও ঝোঁক এসে গিয়েছিল।

মনে আছে, দুর্গাপূজার সময়ে শোভাবাজারের তিনটি রাজবাড়ীতে—স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের বাঘওলা বাড়ীতে, রাজা নবকৃষ্ণের গোপীনাথের বাড়ী এবং গ্রে স্ট্রীটে রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ী—এই তিন রাজবাড়ীতেই পূজার তিন দিনই প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীরা অভিনয় করত। এই সব অভিনয় দেখবার জন্যে পাশ সংগ্রহ করতে হ'ত। কিন্তু প্রথম যে-বার আমি বাঘওয়ালা বাড়ীতে অভিনয় দেখি উপরোউপরি দু'দিন, তখন আমি জানতুমই না কোথা থেকে পাশ সংগ্রহ করতে হয়। তাই আমি এক বিরাট দুঃসাহসিক এবং বলতে পারি, অসৎ পন্থা অবলম্বন করি। বাঘওয়ালার বাড়ীর বাঁ পাশে সংলগ্ন ছিল এক বিরাট বাগান। আমি সেই বাগানে লুকিয়ে ছিলুম যতক্ষণ না ওখানকার কর্তৃপক্ষ ঠাকুর দেখতে আসা সাধারণ লোকজনকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে সামনের ফটক বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং প্রায় ১৫।২০ মিনিট পরে পাশ দেখে দেখে লোক ছাড়তে শুরু করেছিলেন। আমি বাগান থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব লক্ষ্য করছিলুম। কাজেই যখন দু পাঁচ-দশ জন লোক ঢুকে ফোল্ডিং চেয়ার দখল করছিলেন, তখন এক ফাঁকে বাগান থেকে

নাটমঞ্চের সামনের উঠানে যাবার পথ দিয়ে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে একটি চেয়ার দখল করে বসেছিলুম।

মনে আছে, প্রথম দিন অভিনীত হয়েছিল ক্ষীরোদপ্রসাদের "আলিবাবা"। নরনারীর যৌন ব্যাপারটা বোঝবার বয়েস না হলেও পুরুষ-নারীর মধ্যে প্রেম-ভালোবাসাটা কেমন যেন আবছা-আবছা বুঝতুম। তার ওপর আমার মনটা যেন কিছুটা নরম ধাতু দিয়ে গড়া। তাই 'আলিবাবা' নাটকে যখন হুসেনের ভালোবাসা ও বিবাহ প্রস্তাবকে দাসী মর্জিনা যেন খানিকটা অগ্রাহ্য ক'রে বলেছিল "তা হয় না, হোসেন", তখন, বিশ্বাস করুন মাত্র বারো তেরো বছর বয়েসী আমার চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। ভাবপ্রবণতা আর কাকে বলে?

পরের দিন অভিনীত হয়েছিল হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত জনপ্রিয় নাটক "জয়দেব"। এর দু'টি দৃশ্য এতদিন বাদেও আমার চোখের সামনে ভাসছে। এক, একটি অল্পবয়সী মেয়ের শ্রীকৃষ্ণবেশে নেচে নেচে "রতিসুখসারে গতমভিসারে" গান গাওয়া। আর দুই, "গীতগোবিন্দ" লিখতে লিখতে এক জায়গায় ঠিক মনের মতো বাক্যাংশ খুঁজে না পেয়ে জয়দেব লেখা অসমাপ্ত রেখে নদীস্নানে গেলেন, আর জয়দেবেরই মূর্তি ধ'রে নারায়ণ নিজে এসে সেই পাদপূরণ করবার জন্যে লিখে গেলেন—"দেহিপদপল্লবমুদারম্"। স্নানান্তে ফিরে এসে যে-লেখা দেখে জয়দেব নারায়ণের অসীম করুণা উপলব্ধি করলেন। এর পরে রীতিমত পাশ নিয়ে আমি গোপীনাথের বাড়ী এবং বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুরের বাড়ীতেও ঐরকম প্রাইভেট থিয়েটার দেখি। শেষোক্ত বাড়ীতে এক বছর আগে অভিনীত হয়েছিল অমৃতলাল বসু রচিত "তরুবালা"।

অবশ্য শোভাবাজারের বিভিন্ন রাজবাড়ীতে বারো-তেরো বছর বয়েসে থিয়েটার দেখবার আগেও আমি একবার পাবলিক থিয়েটার দেখেছিলুম তেতলায় মেয়েদের আসনের মধ্যে মায়ের কোলের কাছে বসে চিকের আড়াল থেকে। থিয়েটারটি ছিল হাতীবাগানের সুখ্যাত স্টার (তখন বানান ছিল—ষ্টার) থিয়েটার। এখন আর কোনও থিয়েটারই ত্রিতল নয়; সবই দ্বিতল। কিন্তু তখন স্টার ছিল ত্রিতল। নীচের তলটি শুধু পুরুষদের জন্যে, দ্বিতলটি ছিল বক্স। একেবারে মাঝে যে-বক্সটি সবচেয়ে বড়ো ও রঙ্গমঞ্চের মুখোমুখি, তাকে বলা হ'ত রয়াল বক্স। বাকী ডাইনে ও বামে, বোধ হয়, পাঁচটি বা ছ'টি ক'রে দশ বা বারোটি বক্স। আর ত্রিতলটি ছিল পুরোপুরি মেয়েদের আসন; সে-যুগের পর্দানশীনদের জন্যে সম্পূর্ণ চিক দিয়ে ঘেরা। বেশীর ভাগই মেয়ে আসতেন ঘরের গাড়ী বা ভাড়া করা ১ম, ২য় বা ৩য় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে। গাড়ী থেকে নেমেই তাঁরা তাঁদের সঙ্গের পুরুষদের নির্দেশ মতো চ'লে যেতেন ত্রিতলে ওঠবার সিঁড়ির দরজায়, যেখানে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিযুক্ত ঝিয়েরা তাঁদের অভ্যর্থনা করত এবং তাঁদের টিকিট অনুযায়ী ত্রিতলে তাঁদের আসন দেখিয়ে দিত। পঞ্চাঙ্ক নাটকের

দু'টি অংক খুব কম সময়ের ব্যবধানে অভিনীত হবার পরে তৃতীয় অংকের আগে একটু বেশী সময় বিরাম দেওয়া হত। সেই সময়ে পুরুষেরা খাবার পান ইত্যাদি নিয়ে ঐ মেয়েদের সিঁড়ির দরজার সামনে এসে উপস্থিত হতেন এবং ঝিয়েরা তাঁদের কথামত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাঁকত, "ওগো, শ্যামবাজারের নিমাই ঘোষের বাড়ী', "সিকদার বাগানের চারু বিশ্বাসের বাড়ী", "পটলডাঙার সিধু মল্লিকের বাড়ী" ইত্যাদি নির্দেশক কথাকে তাদের বাজখাঁই গলা ফাটিয়ে। এই পর্ব শেষ হলে কর্তৃপক্ষ তৃতীয় অংক আরম্ভ হবার ঘণ্টা দিতেন এবং যথাসময়ে আবার থিয়েটার শুরু হয়ে যেত।

এই যে কথাগুলি বললুম, এ অবশ্য আমার প্রথম থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা থেকে নয়। কারণ, আমি প্রথম পাবলিক থিয়েটার (স্টার) দেখি সেই ১৯১১ সালে, যখন আমার বয়েস পাঁচ কি সাড়ে পাঁচ বছর। মূল বইটি ছিল যোগেন বসু প্রণীত "শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী"র নাট্যরূপ। মনে পড়ে, নাটকটিতে একটি ডাকাতের ভূমিকা ছিল, যে পরে এক গৃহস্থ বাড়ীতে ভৃত্য রূপে কাজ নিয়ে একটি ছোট মেয়ের প্রতি স্নেহবশত একজন আশ্চর্য ভালো মানুষে পরিণত হয়। ঐ মূল নাটকের পরে বালক শ্রীকৃষ্ণ, যশোদা প্রভৃতি চরিত্র সংবলিত একটি গীতি-নাটিকা অভিনীত হয়। এই নাটিকার একটি বিশেষ দৃশ্যাংশ আজও আমার মনের মুকুরে প্রতিফলিত হয়। বালক কৃষ্ণের দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে একটি প্রকাণ্ড ফটকের দুই লোহার কড়ায় (শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে লোহার কড়ার ব্যবহার সঙ্গত কিনা, সে-বিবেচনার ভার পাঠকদের উপর) নারকেল দড়ি (আবার সমস্যার বিষয়) দিয়ে বাঁধছেন, আর বালক কৃষ্ণ সুললিত কণ্ঠে গাইছেন—

"বাঁধ মা, বাঁধ মা, বাঁধ মা,
আর আমি পালাব না" ইত্যাদি

পরে যখন ক্রমেই বয়স বেড়ে নাটকাদি নিয়ে আলোচনা করতুম, তখন মাঝে মাঝেই মনে প্রশ্ন জাগত, ঐ গান ও দৃশ্য সংবলিত নাটিকাটির নামই বা কি এবং নাট্যকারই বা কে? আমার এই প্রশ্নের উত্তর পেলুম আমার প্রায় ৭০ বছর বয়সে 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ'-প্রণেতা রমাপতি দত্তের কাছে। রমাপতি দত্ত হচ্ছে বিখ্যাত দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যম পুত্র হরীন্দ্রনাথ দত্তের ছদ্মনাম। তিনি অমরেন্দ্রনাথ প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ" নাটিকাটি আমার চোখের সামনে খুলে ধ'রে একদিন দেখিয়ে দিলেন—আমার দেখা দৃশ্যটি ঐ নাটিকারই অন্তর্ভুক্ত এবং আমার শোনা গান "বাঁধ মা, বাঁধ মা, বাঁধ মা, আর আমি পালাব না" ঐ নাটিকাতে ছাপার অক্ষরে শোভা পাচ্ছে।

যখন থেকে অমৃতলালের মুখের ভাষাকে আমার হস্তাক্ষর মারফত লিপিবন্ধ করতে শুরু করি, তার কিছুদিন পরে থেকেই নিজের অন্তরের অন্তরে আমি উপলব্ধি করতে থাকি, পড়াশুনার প্রতি আমার আর সেই একনিষ্ঠ একাগ্রতাতে যেন ঘাটতি পড়ছে। "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"—এ কথাটা মনেপ্রাণে জানা সত্ত্বেও তখন মনোভাবটা ক্রমেই দাঁড়িয়েছিল—ওস্তাদের

মার শেষ রাতে। পরীক্ষার মাসখানেক আগে থাকতে বেশ চেপে পড়লেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। অমৃতলালের মতো একজন যশস্বী লোকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ হচ্ছে এই মনোভাবের একটি দুর্বার কারণ। এমনও হয়েছে, আমি স্কুল যাবার জন্যে স্নান সেরে খেতে বসতে যাচ্ছি, আচমকা তাঁর কাছ থেকে ডাক এল। অমনই খাওয়া ফেলে ছুটলুম তাঁর বাণী লিপিবদ্ধ করতে। যখন তাঁর বক্তব্য শেষ হ'ল, তখন দেখা গেল, ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে এগারোটা। অমৃতলাল হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে ব'লে উঠলেন, তোমার স্কুল যাবার দেরী করে দিলুম না ত'? আমাকে সবিনয়ে তখনকার সময়ের কথা উল্লেখ করে বলতেই হ'ল—আজ আর স্কুল যাওয়ার টাইম নেই; যাক গে, একটা দিন ত'!

এই গণেশগিরির কাজে অমৃতলালকে আমি ছাড়াও আর একজন বহু সাহায্য করেছেন; তাঁর নাম অমিয়কুমার সান্যাল। বাঙলা স্কুল থেকে উনিও মাইনর পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। উনি আমার থেকে দু' শ্রেণী ওপরে পড়তেন। মাইনর পাশ করবার পরে উনি, যতদূর মনে আছে, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে পড়তে গিয়েছিলেন। আমাদের স্কুলের কিছু দক্ষিণ-পূর্বে কম্বুলিয়াটোলা লেনে ওঁদের বাড়ী ছিল। ওঁর মেজ ভাই, সুনীলকুমার সান্যাল আমার সহপাঠী ছিল এবং বাঙলা স্কুলে পড়তে শুরু ক'রে ওই সুনীলই হয় আমার প্রথম বন্ধু। সেই সূত্রে বহুদিনই আমি ওদের ঐ ৭, কম্বুলিয়াটোলা লেনস্থ বাড়ীতে খেলতে যেতুম। ওদের বাড়ীর সামনেই, একেবারে বাড়ীর লাগোয়া একটা খোলা জমি ছিল; আরও মনে আছে, ওদের বাড়ীতে ঢোকবার দরজার সামনেই ছিল একটি করবী ফুলের গাছ। সুনীলের বন্ধু হিসেবে ওদের বাড়ীর প্রতিটি জনের সঙ্গেই আমার নিবিড় পরিচয় হয়ে যায়। ওদের বাবা ক্যালকাটা কর্পোরেশনের ফুড ইনস্পেক্টর প্রাণগোপাল-বাবু, ওদের মা, ওদের দিদি—তারাদি (কী সুন্দর ছিল তাঁর চেহারা!), অমিয়দা, তৃতীয় ভাই সুবোধ এবং চতুর্থ ভাই সুধাংশুকুমার (যিনি উত্তর-কালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগে অধ্যাপনা করতেন)—সকলেই আমার আপন জন হয়ে গিয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য, যেহেতু আমার বাড়ী একেবারে পাশে বললেই হয় এবং অমিয়দা'র বাড়ী অপেক্ষাকৃত দূরে, সেই জন্যে গণেশগিরির কাজটা আমাকেই বেশীর ভাগ করতে হ'ত। সেই কাজটি সহসা একটু বেড়ে গেল। কেন, সেই কথাই বলি।

একদিন অমৃতলালের সামনে ব'সে আছি, এমন সময়ে সেখানে একজন দোহারা চেহারা বিশিষ্ট এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব হ'ল। যথারীতি অভিবাদনের পরে তিনি ঐ শতরঞ্চির ওপর আসন গ্রহণ করতেই অমৃতলাল বললেন, "তারপর খোকা, হঠাৎ কি মনে করে?" ঐ দোহারা চেহারার মানুষটির 'খোকা' নামের মনে মনে তারিফ না ক'রে পারলুম না। কিছুটা ভণিতা করবার পরে খোকাবাবু তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বললেন,

"আপনার আশীর্বাদে দৈনিক বসুমতী তো বেশ ভালোই চলছে, মফস্বলের গ্রাহকেরা সাপ্তাহিকখানাকেও বাঁচিয়ে রেখেছে ; এবার ভাবছি, একখানা মাসিক বার করব—বেশ ভালো ভালো গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস দিয়ে।" "খুব ভালো কথা", বললেন অমৃতলাল। "আপনি তো এখন থিয়েটার করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, তা আপনাকে আমার এই মাসিকে নিয়মিত লিখতে হবে—আপনার রস-রচনা অপূর্ব হবে।"

"শুনলুম তো তোমার কথা, কিন্তু— ।"

অমৃতলালের কথা শেষ করতে না দিয়েই খোকাবাবু ওরফে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলে উঠলেন—"এর মধ্যে আবার কিন্তু কি ?" "আছে, আছে," বলে অমৃতবাবু আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, "ঐ, ওকে যদি রাজী করাতে পার, তাহলেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে, নইলে নয়।" খোকাবাবু এতক্ষণে আমার দিকে মুখ ফেরালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অমৃতলালের মুখ থেকে শুনলেন, "জানই ত' আমি নিজের হাতে লিখতে পারি না—লিখলে কম্পোজিটাররা সে-লেখা পড়তে পারবে না। আমি মুখে বলি, আর ও সেইটে কাগজে লিপিবন্ধ করে। কাজেই ও যদি নিয়মিত লিখতে রাজী থাকে, তা হলেই আমার কাছ থেকে নিয়মিত লেখা আশা করতে পার।"

খোকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে 'হ্যাঁ, ভাই' বলে আমার দিকে ঝুঁকতেই আমি কালবিলম্ব না করে বলে ফেললুম, "উনি বললে আমি 'না' বলব, এমন ধৃষ্টতা আমার নেই।" "ব্যস, তাহলে তো আর কথাই নেই", খুশী মনে বললেন খোকাবাবু এবং অমৃতলালকে উদ্দেশ্য করে এরই সঙ্গে যোগ করে দিলেন, "তাহলে প্রথম সংখ্যাতেই আপনার একটি লেখা পাচ্ছি।"

হ্যাঁ, ১৯২৯ সালের বৈশাখে প্রথম প্রকাশিত 'মাসিক বসুমতী'র ১ম সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল অমৃতলাল বসু রচিত প্রবন্ধ 'চরকা'। এবং এর পরে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে ঐ মাসিক বসুমতীতে গদ্যে পদ্যে মিলিয়ে অমৃতলালের কত যে রস-রচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। বলা বাহুল্য, এদের অধিকাংশই আমার হস্তলিপি থেকে মুদ্রিত।

লেখা যা কিছু হ'ত দিনের বেলা এবং তার সময়সীমা ছিল বেলা নটা থেকে বেলা একটা বা বড় জোর দেড়টা পর্যন্ত। আগেই বলেছি, পড়তুম হিন্দু স্কুলে, যেখানে উপস্থিতি সম্পর্কে ছিল ভীষণ কড়াকড়ি। কাজেই অমৃতলালের গণেশগিরিটা করতে হ'ত ছুটির দিনেই। ওঁর বিশেষ তাগিদে এক আধ দিন অবশ্য স্কুল কামাই করতেও হয়েছে, যেমন একটি দিনের উল্লেখ আগেই করেছি। তবে সে-রকম কামাই ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

সেই যে ১৯১৩ সালের তেসরা বা চৌঠা আগস্ট (আগেই বলেছি, এই চৌঠা আগস্ট থেকেই প্রথম ইয়োরোপীয় মহাসমর প্রজ্বলিত হয়) থেকে আট বছর বয়সে আমার অমৃতলালের সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ হয়। সেই সান্নিধ্য থেকে গণেশগিরির দরুণ আমি আরও বেশী করে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি ১৯১৯ সাল থেকে এবং এই ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছিল টানা ১৯২৬ সাল

পর্যন্ত। এই সালেই তিনি, কি জানি কী কারণে, ৯।২ রামচন্দ্র মৈত্র লেনের বাড়ী ছেড়ে (যতদূর জানি, ঐ বাড়ীতে তিনি ভাড়াটিয়া হিসেবেই থাকতেন) বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত ডাঃ আর. জি. করের (রাধাগোবিন্দ কর) বসত বাড়ীর ঠিক পিছনে অবস্থিত তাঁদের একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বসবাস করতে শুরু করেন।

এর বছর তিনেক আগে, বাঙলা ১৩৩০ সালে (ইংরেজী সালটা বোধহয় ১৯২৩) নৈহাটিতে চতুর্দশ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর বাঙলা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। মূল সভাপতি ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাব। নাট্যাচার্যের সঙ্গী হিসাবে আমরা তিনটি যুবক যাই। এক, অমিয়কুমার সান্যাল, দুই, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য এবং তিন, আমি। আমাদের থাকবার জায়গা ঠিক হয় নৈহাটিরই গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল গরিফাতে ললিৎমোহন ঘোষালের বাড়ী। জায়গাটা আজ আর ঠিক মনে নেই; খুব সম্ভবত নৈহাটির কোনও স্কুলের সন্নিহিত বিরাট চত্বরে সভামণ্ডপটি প্রস্তুত হয়েছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। উদ্বোধন সঙ্গীত হিসেবে 'বন্দে মাতরম্' গানটি গাওয়া হবার পরে পণ্ডিত হরপ্রসাদ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণটি পাঠ করা শেষ করেছেন, কিংবা সবে পাঠ করতে উদ্যত হচ্ছেন, এমন সময়ে বাইরে থেকে একটা গোলমাল—প্রায় গুঞ্জনের মতো শোনা গেল এবং একটা মিনিট কাটতে না কাটতেই কানে এল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে পৌঁছেছেন এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে।

উদ্যোক্তাদের কাছে ব্যাপারটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। যাই হোক, বহু কণ্ঠের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে বসবার জন্যে যে আসনখানি দেওয়া হ'ল, সেটি ছিল মূল সভাপতি বিজয়চাঁদ মহতাব এবং নাট্যাচার্য অমৃতলালের মধ্যবর্তী। রবীন্দ্রনাথ সৌজন্যবশতঃ বিজয়চাঁদের সঙ্গে অভিবাদন বিনিময়ের পরে তাঁর বামে উপবিষ্ট অমৃতলালকে যেই যুক্ত করে নমস্কার জানাতে গেছেন, অমনই আবেগাপ্লুত অমৃতলাল হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিতে গেলেন। বিব্রত রবীন্দ্রনাথ করেন কি?, করেন কি?" বলে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে গেলেন। আমরা সভামঞ্চের (ডায়াসের) খুব কাছেই বসেছিলুম বলে অমৃতলালের ঠোঁট নাড়া থেকে বুঝতে পারলুম যেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলতে চাইছেন—আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। এর পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এবং অমৃতলালের মধ্যে খুব মৃদুকণ্ঠে সৌহাদ্যপূর্ণ কথাবার্তা হয়।

পরদিন আমরা অনেকেই একত্রে কাঁঠালপাড়াস্থ বঙ্কিমচন্দ্রের পৈত্রিক বাড়ীটি দেখতে যাই। আমাদের মধ্যে যাঁরা উৎসাহী ছিলুম, তাঁরা ঐ বাড়ীর দোতলায় গিয়ে সাহিত্য সম্রাটের সূতিকা গৃহ ও জন্মস্থলটি পরিদর্শন করি। আর বিশেষ ভাবে ঘুরে ফিরে দেখি, ঐ বাড়ীর সামনে রাস্তার অপর দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের দ্বারা নির্মিত সেই ঐতিহাসিক ঘরখানি, যাতে বসে

তিনি বহু উপন্যাসাদি রচনা করেছেন। এই কক্ষে তাঁর ব্যবহৃত দোয়াত, কলম ইত্যাদিও রক্ষিত আছে।

অমৃতলাল আর একটি ব্যাপারে তাঁর লেখনী চালান করতেন। ১৯২০-২২-২৪ সালে প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে কলকাতার বৌবাজার শাঁখারীটোলা অঞ্চল থেকে জেলেপাড়ার সঙ্ বেরুত। এই সঙের অন্তর্ভুক্ত থাকত সারা বৎসরে শহরে এবং অন্যত্র যে-সব উল্লেখযোগ্য ও সমালোচনার উপযুক্ত ঘটনা ঘটত, ছড়া কেটে ও গান গেয়ে সেইসব ঘটনার অনুকৃতি কৌতুক বা প্যারডি। এই জেলেপাড়া সঙের প্রাণ-পুরুষ ছিলেন জ্যোতিশচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি এই সঙের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি অমৃতলালকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। মনে আছে, কোনও একটি ছড়ার মধ্যে তিনি লিখেছিলেন, 'এই বিড়ালই বনে ঢুকলে বন-বিড়ালটি হয়।'

জ্যোতিশচন্দ্রের ছিল যেমন দশাসই চেহারা, রঙটি ছিল তেমনই নিকষ কালো। কিন্তু কি সুন্দর লোক ছিলেন তিনি, যেন জীবন্ত অমায়িকতা। ওঁর আরও দুজন বন্ধুকে নিয়ে উনি অমৃতলালের কাছে প্রায়ই আসতেন। তাঁদের একজনের নাম কালীবাবু এবং অপরজনের নাম শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। শেষোক্ত ব্যক্তি নাকি একদা সংসার ত্যাগ করে বহুদিন ধরে প্রায় সন্ন্যাসীরূপে হিমাচল অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। যখন তাঁকে জ্যোতিশবাবুর সঙ্গে অমৃতলালের কাছে যেতে দেখতুম, তখন তিনি আমহার্স্ট স্ট্রীট ও মানিকতলা স্ট্রীটের সংযোগস্থল থেকে কিছু দূরে আমহার্স্ট স্ট্রীটের পূর্ব ফুটপাতে একখানি মনিহারী দোকান চালাচ্ছিলেন। কালীবাবুর পোশাকী নামটা আমার জানা নেই ; তবে তাঁর উপাধি ছিল মল্লিক। তিনি অকৃতদার এবং শ'ওয়ালেস বা ঐ ধরণের কোনও কোম্পানীর জুট ডিপার্টমেন্টের হিসাবরক্ষক ছিলেন। তবে তাঁর বড়ো পরিচয় হচ্ছে, তিনি খ্যাতিমান পঙ্কজকুমার মল্লিকের আপন কাকা। এই ত্রয়ী কারণে-অকারণে অমৃতলালের কাছে আসতেন বলে আমার সঙ্গেও তাঁদের একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। কালী-বাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল প্রায় তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

অনেকক্ষণ ধরে অমৃতলালের নাম করছি ; কিন্তু তবু তাঁর সম্বন্ধে সকল কথা বলা হয়নি। যেমন ধরুন, নট হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন। যৌবনে তাঁর অভিনয় দেখিনি। কিন্তু বার্ধক্যে মাঝে মাঝে যখন তিনি মঞ্চাবতরণ করতেন, তখন মঞ্চে তাঁকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের ভূমিকায় তিনি যে আশ্চর্য স্বাভাবিক অভিনয় করতেন, তার তুলনায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনীত 'নিমচাঁদ' আমার কাছে যথেষ্ট নিষ্প্রভ মনে হয়েছে। ফূর্তিবাজ, বেপরোয়া, নায়ক অটলের ইয়ার নিমচাঁদকে তিনি মঞ্চের ওপর জীবন্ত করে তুলতেন। নাটকের একেবারে শেষ পর্যায়ে যখন তিনি অটলের দাড়ি-চিবুকটি ডান হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলতেন—"কি বোল বলিলে বাবা, বলো আর বার,

মৃত দেহে হলো মোর জীবন সঞ্চার ॥

মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি ॥"

তখন সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠত।

ওঁর নিজের লেখা 'খাসদখল'-এ নিতাই চরিত্রটি যেমন বাঙলা নাট্যসাহিত্যে একটি অপূর্ব সৃষ্টি—যদিও বলা যেতে পারে, চরিত্রটির মূল আদল আমদানি হয়েছে ঐ নিমচাঁদ থেকেই—অমৃতলালের এই 'নিতাই ইজ্ দি' চরিত্রে আশ্চর্য স্বাভাবিক অভিনয় বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবার মতো।

পারিবারিক বন্ধু নিতাইয়ের উপস্থিতিতে যখন নায়ক লোকেনের অসুস্থা স্ত্রী মোক্ষদাকে পরীক্ষা করবার পরে বিপিন ডাক্তার "গায়ের উত্তাপ মাত্র ৯৯°, সামান্য সর্দিজ্বর, একটা লোক পাঠিয়ে দিন, মিক্সচার খেলে দুদিনেই সেরে যাবে" বলে বেরিয়ে যান, আর সঙ্গে সঙ্গে উষ্মায় ফেটে পড়ে মোক্ষদা বলে ওঠেন, "একটা সামান্য বিধু ঝি, তারও অসুখ করলে হান্‌ড্রেড অ্যাণ্ড টু টেম্পারেচারের কম হয় না, আর আমার কিনা নাইনটি নাইন ? জুতো পরেছে তা মোজা নেই—ও ডাক্তারের ভিজিট আট টাকা নয়, দু'টাকা—দু'টাকা দেবে", তখন সমস্ত দেখে শুনে নিতাই প্রায় কৃত্রিম আক্ষেপ করে বলেন, "দুত্তোর ডাক্তার, সামান্য ছ'গণ্ডা পয়সার মোজার জন্যে ছ' ছ' টাকার ভিজিট হারালি !"

অঙ্গভঙ্গীসহ নিতাইয়ের এই কথা শুনে দর্শকসাধারণ সশব্দে হেসে উঠতেন; অবশ্য এর চেয়েও বেশী উপভোগ্য হ'ত সেই দৃশ্যটি, যেখানে নিতাইয়ের মুখ থেকে নিতাইয়ের গঙ্গা লাভ হয়েছে শুনে ঠাকুর্দা বলে ওঠেন, "বলো কি ? তোমার গঙ্গালাভ !" আর সঙ্গে সঙ্গে নিতাই নিজের কথা শুধরে নিয়ে বলেন, "থুড়ি ! নিতাইয়ের ইজ্ দি ধাপা লাভ, ইজ্ দি দড়ি কলসী লাভ !" সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিনয় কাকে বলে তা অমৃতলাল বারংবার দেখিয়েছিলেন 'খাসদখল'-এ 'নিতাই ইজ্ দি'র ভূমিকায়। তাঁর রচিত 'তরুবালায়' 'বিহারী খুড়ো' কিংবা 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এ মিঃ সিং যাঁদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁরাই বলবেন স্বাভাবিক অভিনয়ের মাধ্যমে এমন কৌতুকের ফুলঝুরি সৃষ্টি করতে তাঁর পরবর্তী যুগের কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। সুরের কৃত্রিমতা কোনও দিনই তাঁর অভিনয়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত না। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, স্বাভাবিক অভিনয়ের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ তাঁর আরও পঞ্চাশ বছর পরে জন্মানো উচিত ছিল। **He was born at least 50 years before he was due.**

বাঙলা ভাষায় কৌতুক নাট্যের রচয়িতা হিসেবে তাঁর জুড়ি নেই। অবশ্য তাঁর রচনাগুলি মাত্র কৌতুকের আধার বললে সবটুকু বলা হবে না, এদের প্রায় প্রতিটিই সামাজিক চাবুক। অমৃতলাল যেখানেই দেখেছেন নিয়মের ব্যতিক্রম, সহজ সরল বাঙালী জীবনে কিছু অতি আধুনিকতা, ব্রাহ্মধর্মের ভিতরের শাঁসটুকু না বুঝে শুধু খোসা নিয়ে লম্ফঝম্প, ইংরেজী শিক্ষার

প্রকৃত মর্যাদা না বুঝে শুধু বিবিয়ানা, সতীসাধ্বী, সুন্দরী স্ত্রীকে উপেক্ষা ক'রে বারনারীর প্রতি মোহ—সেইখানেই তিনি কৌতুকচ্ছলে সমাজকে তিরস্কৃত করেছেন। খাসদখল, বিবাহ-বিভ্রাট, তরুবালা, বাবু, কৃপণের ধন, তাজ্জব ব্যাপার, ব্যাপিকা বিদায়, দ্বন্দ্বে মাতনম্ প্রভৃতি প্রতিটি রচনাই এর সাক্ষ্য দেয়। এ ছাড়া তাঁর আর একখানি নাট্যরূপ অমর হয়ে আছে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের 'সরলা' নামে যে-নাট্যরূপ অমৃতলাল দিয়েছেন, তা বাঙলা রঙ্গমঞ্চে সহস্র সহস্র রজনী অভিনীত হবার পরেও নাট্যপ্রিয় দর্শকদের কাছে অনুমাত্রও পুরাতন হয়নি। তাঁর আর একটি গুরুগম্ভীর নাটক হচ্ছে 'হরিশচন্দ্র'।

অত্যন্ত সান্নিধ্যে এসেছি বলেই বলতে পারছি, অমৃতলাল ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালী। তাঁর একটু বিশেষ ধরণের কালো জুতোজোড়া ছাড়া আর সবই ছিল সাদা ধপ্‌ধপে। তিনি বাইরে বেরোবার সময়ে সার্টের ওপরে সাদা কম ঝুল চোগা জাতীয় একটি জামা পরতেন। এবং এতে তাঁকে খুব জমকালো দেখাত। তাঁর মোজাও ছিল সাদা এবং হাঁটুর ওপর পর্যন্ত লম্বা। এই সম্পূর্ণ সাদা পোশাকের সঙ্গে তাঁর গৌরবর্ণ ও তাঁর কাঁধেরও কিছুটা নীচে পর্যন্ত আলম্বিত শ্বেতশুভ্র কেশদাম তাঁকে একটি অনন্যসুলভ শ্রীমণ্ডিত ক'রে রাখত। এই চেহারার জোড়া কোনও দিনই আমার নজরে পড়েনি।

বাইরের সাদা চেহারার সঙ্গে মিলিয়েই তাঁর সাদা, সৎ মন। জন্ম তাঁর কলকাতা শহরের কম্বুলিয়াটোলায় ১৮৫৩ সালের ১৯ এপ্রিল, বাংলা ১২৫৯ সালের ৬ বৈশাখ, রামনবমী তিথিতে। আর তাঁর মৃত্যু হয় ১৯২৯ সালের ২ জুলাই। কবে থেকে শুরু করে জানি না, রামনবমী তিথিতে তাঁর জন্মদিনটি পালন করতেন সুপ্রসিদ্ধ অ্যাটর্নী ও কংগ্রেসী নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সুশীলা স্ত্রী। তিনি ঐ দিন অমৃতলালকে তাঁদের ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়ীতে নতুন কাপড় পরিয়ে অন্ন-ব্যঞ্জন খাওয়াতেন নিজে তাঁর সামনে বসে থেকে 'এটা খান, ওটা খান' বলে—ঠিক নিজের মেয়ের মতো, কিংবা বলতে পারি মায়ের মতো আন্তরিক ব্যবহার করে।

আমরা এই নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বৈঠকখানা ঘরে বসেই চৈত্র সংক্রান্তির দিনে জেলেপাড়ার সঙ্ দেখতুম।

অমৃতলালের সঙ্গে যখন থেকে আমার পরিচয়, তার আগেই তিনি তাঁর একটি চোখ হারিয়েছেন। তাঁর দুই চোখেই ছানি পড়েছিল এবং দু'টি চোখ দু'বারে দু'জন ইংরেজ সার্জন অপারেশন করেন। যেটি মেনার্ড সাহেব অপারেশন করেন, সেটি নষ্ট হয়ে যায় সার্জনের অকৃতকার্যতার ফলে। নষ্ট চোখের পরিবর্তে একটি সুন্দর পাথরের চোখ এমন আশ্চর্যভাবে বসানো ছিল যে, সহসা সেটিকে পাথরের চোখ বলে মনেই হ'ত না। দ্বিতীয়টি সাফল্যের সঙ্গে অপারেশন করেন স্যাণ্ডার্স সাহেব, মেয়ো হাসপাতালে। অপারেশনের কিছুদিন পরে চোখটি যখন স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, তখন এই মেয়ো হাসপাতালেই তোলা তাঁর একখানি ফোটো—গড়গড়ার নল

মুখে—জনসাধারণের অত্যন্ত পরিচিত হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য, এই চোখের ছানি কাটাবার পর থেকেই অমৃতলাল সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় ত্যাগ করেন এবং পরিবর্তে নানা রকম রচনা করার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন। গদ্যে পদ্যে বহুবিধ রস-রচনার ফাঁকেই এই শতকের বিশের দশকে তিনি তিনখানি নাট্যগ্রন্থ লেখেন। প্রথম দু'টি হচ্ছে কৌতুক নাটিকা ; এক, দ্বন্দ্বে মাতনম্ এবং দুই, ব্যাপিকা-বিদায়। ইংরেজী SHREW কথাটির বাঙলা প্রতিশব্দ হিসেবে তিনি ব্যাপিকা কথাটি ব্যবহার করেন। কিন্তু তৃতীয়টি হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক ; নাম—যাজ্ঞসেনী। যদিও মহাভারতের দ্রৌপদীকে নায়িকা করেই বইটি রচিত, তবু যে-কোনও পাঠকই বলবেন, অমৃতলালের দৃষ্টিভঙ্গীতে যথেষ্ট নূতনত্ব ছিল। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করব, গৈরিশ ছন্দের ব্যবহারে কোথাও কোথাও অমৃতলালের অপটুতা লক্ষণীয়—সময় সময় তা দৃষ্টি কিংবা শ্রুতিকে পীড়া দেয়।

বছর বারো-তেরো ধ'রে মানুষ অমৃতলালকে কেমন দেখেছি, এইবার সেই কথাই বলব। মনে থাকে যেন এটা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত ভাবে অভিনয় বন্ধ করার পরবর্তী যুগের কথা। যখন সভা-সমিতি না থাকলে, কিংবা কোনও বিশেষ অভিনয়ে যোগ দিতে আহূত না হ'লে তিনি নিত্য নিয়মিত-ভাবে বৈকালটা কাটাতেন শ্যামবাজার এ. ভি. (প্রথমে এম. ই.) স্কুলের প্রাঙ্গণে।

সকাল সাড়ে ছটা বা সাতটার মধ্যে তিনি শয্যাত্যাগ করতেন। প্রাতঃকৃত্য সেরে বাড়ীতেই অবগাহন স্নান করতেন। আশ্চর্য হবেন না, ওঁর বাড়ীতে এমন একটি লম্বা, চওড়া ও গভীর চৌবাচ্চা ছিল, যাতে যেমন কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে প্রবেশ করতে হ'ত, ঠিক তেমনই জলের ভিতরেও নামতে হ'ত কয়েকটি ধাপ বেয়ে। জলভর্তি চৌবাচ্চার ভিতরে দাঁড়ালে প্রায় বুক পর্যন্ত জল। এই বিবরণের পরে নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, অমৃতলাল কী করে বাড়ীতে বসেই অবগাহন স্নানপর্ব সমাধা করতেন।

অমৃতলালের প্রিয় তৈল ছিল—ম্যাকাসার অয়েল। স্নানের পর শুষ্ক বস্ত্র ও সাদা সার্ট পরে কিছুটা ল্যাভেন্ডার মিশ্রিত গোপাল জল গায়ে ছিটুতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। প্রাতঃকালীন বৈঠকের পরে অন্নাহার করতেন তিনি একটা থেকে দুটোর মধ্যে। শুনলে অবাক হবেন, 'নোটো' অমৃতলাল নিত্য আহার করতেন হবিষ্যান্ন—ফেন না গালা আলো চালের ভাত ; সঙ্গে থাকত দু'চার রকম ভাতে-ভাত। না, তরকারি উনি পছন্দ করতেন না। অবশ্য ঐ আলো চালের ভাতের সঙ্গে মাছ বা মাংসের তরকারি তিনি সোৎসাহে গলাধঃকরণ করতেন। আহারের পরে তিনি নিয়মিত ভাবে এক ঘণ্টা নিদ্রা যেতেন। বলতেন, যমের দেনা শোধ করছি। উনি বিশ্বাস করতেন, কর্ম-জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন যদি আহারের পরে এক ঘণ্টা ধরে দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত হয়, তাহলে তার পরমায়ু

বৃদ্ধি হয়। রাত্রে নটা সাড়ে নটার মধ্যে নৈশভোজ—যাতে প্রধান ভোজ্য হিসেবে থাকত ছোট ছোট হাতে গড়া রুটি—সেরে তিনি নিয়মিত ঘণ্টা খানেক মহাভারত পড়ে শোনাতেন তাঁর স্ত্রীকে; কোনও দিন এর ব্যত্যয় দেখিনি।

যখন আমি অমৃতলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তখনও কি তিনি মদ্যপান করতেন, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। হ্যাঁ, করতেন; প্রতি সন্ধ্যায় মাত্র এক পেগ্ ক'রে। তবে এর ব্যতিক্রমও ছিল। মাঝে মাঝে তিনি উপ্‌রি উপ্‌রি পাঁচ সাত দিন ধ'রে দিবারাত্র মদ্যপান করতেন; তখন খাওয়া-দাওয়া, স্নানাদি—সব বাদ। ছোট গেলাসে করে প্রায় প্রতি পাঁচ মিনিটে এক গ্লাস করে মদ্যপান করতেন তিনি; সঙ্গে চাট হিসেবে থাকত—শশার কুচো, পোড়া মাংস বা শিক-কাবাব বা ঐ ধরণের আরও কোনও কোনও বস্তু। উপ্‌রি উপ্‌রি পাঁচ সাত দিন ধরে খাবার পরে দিন দুয়েক তিনি নিদ্রা যেতেন সমস্ত ঘর অন্ধকার করে। এরপরে উঠে বেশ করে অবগাহন স্নানের পরে তিনি যখন শ্বেতশুভ্র পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে পথে বেরোতেন, তখন তাঁর রাজকীয় চেহারা দর্শনীয়।

১৯২৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে যখন আমি বঙ্গবাসী কলেজে আই এস-সি পড়ছি, সেই সময়ে একদা পূর্ব প্রস্তাব-মত এক ভদ্রলোক এক বৈকালে অমৃতলালকে একটি বিশেষ ধরণের লাইব্রেরী পরিদর্শন করাবার জন্যে নিয়ে যান, যতদূর মনে পড়ে, একটি সেকেণ্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি ক'রে। সঙ্গে ছিলুম আমি। কিন্তু কি কারণে জানি না, ভদ্রলোকটি অমৃতলালকে দ্রষ্টব্য লাইব্রেরীতে না নিয়ে গিয়ে প্রথমে তাঁকে হাজির করেন তাঁর বাসগৃহে।

যতদূর মনে পড়ে, বাড়ীটি ছিল দর্জিপাড়ার নিকটবর্তী জগন্নাথ সুর লেনে। যাই হোক, সেই বাড়ীর দোতলার একটি ঘরে নানা কথাবার্তার মধ্যে সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হয়। এরপরে হয় একটি বড়ো রকমের জলযোগের আয়োজন। আমি গোঁড়া ব্রাহ্মণসন্তান। সন্ধ্যায় আহ্নিক না করে আমার জলগ্রহণ করবার উপায় নেই। সেই কথা জানাতে তাঁর বাড়ীর মেয়েরা আমার সন্ধ্যাহ্নিক করবার বন্দোবস্ত করে দিলেন; এমনকি পট্টবস্ত্র পর্যন্ত। উপায়ান্তর না দেখে আমাকে তাড়াতাড়ি আহ্নিক ক্রিয়া সেরে নিতে হ'ল। পরে অমৃতলাল এবং আমি উভয়ে ওঁদের বাড়ীর তৈরী নানা রকম সুস্বাদু খাদ্য উদরস্থ করলুম। কিন্তু তারপরে আর লাইব্রেরী পরিদর্শন ঐ রাত্রে যাওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হ'ল না। আমাদের দু'জনকে ভদ্রলোক আবার বাড়ী পৌঁছে দিলেন।

পরে আর একদিন আমাদের সোজা হাজির করা হ'ল ১৫, বিডন স্ট্রীটস্থ সেই লাইব্রেরীতে, যার নাম ছিল অর্ধেন্দু নাট্য-পাঠাগার। বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর স্মৃতিবিজড়িত লাইব্রেরী। ছোট একটি ঘরে গুটিতিনেক আলমারির মধ্যে, বোধ করি শ' ছয়েক নাটক ও নাট্যবিষয়ক গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছে। অমৃতলালের মন্তব্য

লেখবার জন্যে তাঁর সামনে 'মন্তব্য বইটি' খুলে ধরা হ'ল। তিনি তাঁর হস্তাক্ষরকে যতদূর সম্ভব পঠনযোগ্য ক'রে এক বা দুই লাইনে উদ্যোগটির শুভ কামনা করলেন। ভদ্রলোক আমাকে অনুরোধ করলেন, কলেজ থেকে ফেরবার পরে কোনও কোনও বিকালে ঐ পাঠাগারে গিয়ে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করবার জন্যে। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালুম।

আমার কথা আমি রেখেছিলুম; বলতে পারি, খুব বেশী ক'রেই রেখেছিলুম। আমি শুধু একাই ঐ পাঠাগারের কাজে যোগ দিই নি, আমি আমাদের পল্লীর—রামচন্দ্র মৈত্র লেনের দুই বন্ধু, মুরারীমোহন শীল ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে এ ব্যাপারে সঙ্গে নিয়েছিলুম। এঁরা দু'জনেই আমার বাবার কাছে পড়তে আসতেন এবং বয়সে আমার থেকে দু'-এক বছরের বড়োই ছিলেন। এঁরা দু'জনেই সৎ এবং অমায়িক প্রকৃতির ছেলে।

এইখানে একটি কথা বলা দরকার। কলকাতায় আসার পরে জ্ঞান হওয়া ইস্তক শুনে আসছিলুম, আমার বাবা 'মুখার্জি' চ্যাটার্জি' অ্যাণ্ড কোম্পানী'র হেড আপিসের জেনারেল ম্যানেজার। ৫০ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটের দোতলায় অবস্থিত ঐ হেড-আপিস আমি ছেলেবেলাতে দেখেওছিলুম। একটু বড়ো হয়ে জেনেছিলুম, ঐ মুখার্জি' চ্যাটার্জি' কোম্পানীটির মালিক হচ্ছেন আমারই সেজ জেঠামশাই—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। এই কোম্পানী একদা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড', রেলওয়ে প্রভৃতির কন্ট্রাক্টর ছিল এবং কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে শুরু করে উত্তর-ভারতের এলাহাবাদ পর্যন্ত এর কজের পরিধি ছিল। আমার সেজ জেঠামশাই থাকতেন বর্ধমানে। কি কারণে জানি না দশের দশকের সম্ভবত মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার ঐ হেড আপিসটি বন্ধ হয়ে যায় এবং সহসা বাবা বেকার হয়ে পড়েন। উনি কোনও দিনই উদ্যোগী পুরুষসিংহ ছিলেন না। উল্টে ভীষণ অদৃষ্টবাদী ছিলেন। চাকরি যাবার ছিল, তাই গেছে; আবার যেদিন হবার, সেদিন হবে।

সত্যিই, হ'লও তাই। একদিন বৃষ্টি পড়ছিল বিকেল থেকে; রাত্রি ৯টা, তখনও বৃষ্টি পড়েই চলেছে, একটুও বিরাম নেই। সহসা সকলকে চকিত করে সদর দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। আমিই গিয়ে দরজা খুললুম; দেখি ছাতি মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন টাউন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা-মালিক কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী মশাই। তাড়াতাড়ি তাঁকে রাস্তা ছেড়ে ভিতরে আসতে বললুম। ওঁরই টাউন স্কুলে আমার দাদা পড়তেন; সেই উপলক্ষ্যেই তাঁর সঙ্গে বাবার পরিচয়। দাদার খবর নেবার জন্যে কোনও দিন টাউন স্কুলে বাবা গেলে কালীবাবু ওঁকে দিয়ে পরিদর্শকের কাজ করিয়ে নিতেন অর্থাৎ দু'চারটে ক্লাশের ছাত্রদের ইংরেজী বা অঙ্ক সম্বন্ধে বিদ্যে কতদূর তা যাচাই ক'রে নিতেন। আর আমি কালীবাবুকে চিনতুম অন্য কারণে। আমাদের বাড়ীতে পালে পার্বণে যখনই ব্রাহ্মণ ভোজন হ'ত, তখনই আমন্ত্রিতদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী থাকতেন। সেই কালীবাবু অঝোরধারার বৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে রাত নটার সময়ে আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির—"শ্রীনারায়ণ-

বাবু আছেন ?”

বাবা বাড়ীতেই ছিলেন। সামনাসামনি হ'তে কালীবাবু বললেন—“বর্তমানে আপনি তো কোনও কাজ করছেন না ; যতদিন কাজ না পান, আমার স্কুলে পড়ান না। পড়ানোর কাজ আপনি ভালোই জানেন। কি, বলুন, আপনার মত কি ?

বাবা আচমকা কালীবাবুর এই প্রস্তাবে প্রথমটা যাকে বলে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে গেলেন ; পরে সুস্থির হয়ে আমতা করে বললেন, “মন্দ কি ? আপনি যখন বলছেন, আমি করব।” “তাহলে কাল থেকেই আসুন। প্রথমে অবশ্য বেশী মাইনে দিতে পারব না ; মাসে তিরিশটি টাকা দেব ; পরে বাড়বে।” কিন্তু সেই যে আমার বাবা দশের দশকের শেষাশেষি কোনও এক সময় থেকে টাউন স্কুলে পড়াতে গেলেন, সেই টাউন স্কুলেই তিনি রয়ে গেলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিরিশ টাকা থেকে শুরু ক'রে শেষাশেষি তিনি মাসে নব্বই বা পঁচানব্বই টাকা মাইনে পেতেন। প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বৎসরব্যাপী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা জীবনে বাবা তাঁর সাত্ত্বিক চরিত্র, একনিষ্ঠতা, ছাত্রদের প্রতি কোমলে-কঠোরে ব্যবহার প্রভৃতি গুণের জন্যে তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাড়ীতেও বিকেল বেলা কিছু ছেলে—অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েও পড়তে আসত। এমনই দু'টি ছেলে ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও মুরারীমোহন শীল।

অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগারের যে-ভদ্রলোক অমৃতলালকে পাঠাগার পরিদর্শনের জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই হচ্ছেন ওই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ; নাম নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এবং অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার, এই দু'টি সংস্থা তাঁকে সুযোগ দিয়েছিল বহু সাহিত্যিকের খুব নিকট সম্পর্কে আসার। এ-ছাড়া তিনি রাজা হৃষীকেশ লাহার সুযোগ্য পুত্র নরেন্দ্রনাথ লাহাকে তাঁর বাঙালা প্রবন্ধাদি রচনা বিষয়ে নানা রকম সহায়তা করতেন। শুনেছি, এই কাজটি করার জন্যে তিনি শ্রীলাহার কাছ থেকে নিয়মিত মাস-মাহিনা পেতেন। যাই হোক, অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগারের কাজে তিনি আমার সহায়তা পেয়ে বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত এবং অনেকখানি আনন্দিত হয়েছিলেন।

পাঠাগারের একটা কার্যনির্বাহক সমিতি ছিল এবং তাতে ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, কবি নরেন্দ্র দেব, কবি গিরিজাকুমার বসু প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম সংশ্লিষ্ট ছিল। পাঠাগারটি কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনের পক্ষে অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। তবু তারই মধ্যে একটি অধিবেশন ডেকে নলিনী-রঞ্জন আমাকে করে নিলেন সহকারী সম্পাদক, মুরারীমোহন শীলকে করলেন গ্রন্থাগারিক (লাইব্রেরিয়ান) এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে করলেন কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য।

ছেলেবেলা থেকেই আমি নাটকের ভক্ত। নাটক পড়তে ভালবাসতুম, নাটক

দেখতে ভালবাসতুম এবং নাটক করতেও ভালবাসতুম। তাই অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার আমার একটি যোগ্য বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। আমি প্রথমেই মনঃসংযোগ করেছিলুম পাঠাগারের বইয়ের সংখ্যা বাড়ানোর দিকে এবং এর জন্যে অগম্য আমার কোনো স্থানই ছিল না। মনে আছে, পাঠাগারের জন্যে দু' একটি নাটক দান হিসেবে পাব, এই আশায় আমি নটী বিনোদিনী, নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী, প্রথিতযশা নৃত্যকুশলা অভিনেত্রী কুসুমকুমারী প্রমুখ শিল্পীর দ্বারস্থ হতে কুণ্ঠিত হইনি। এখন যেখানে রূপবাণী চিত্রগৃহ, ওরই ঠিক উত্তরে ফুটপাত থেকে দু'ধাপ উঠে ডানহাতি ছিল বিনোদিনীর বাড়ী। যখন ওঁর সঙ্গে আমি কথা কই, তখন ওঁর মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা এবং ওঁর পরণে থান কাপড়। দেখে মনে হয়েছিল ঠিক ব্রাহ্মণের ঘরের এক বিধবা।

ছ' মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পাঠাগারের বইয়ের সংখ্যা ছ'শো থেকে দু' হাজার ছ'শোতে উন্নীত হল। আরও নতুন আলমারি আনতে হল এতো বই রাখবার জন্যে। এ ছাড়া অমল হোমের সহায়তায়—তখন তিনি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদনা করেন—পাঠাগারে বই কেনবার জন্যে কলিকাতা কর্পোরেশন থেকে একটি বাৎসরিক অর্থসাহায্য মঞ্জুর করেছিল। প্রথম বছরের পাওয়া টাকা—অর্থের পরিমাণটি ছিল, যতদূর মনে পড়ে ৫০০ টাকা, তাই দিয়ে বহু ইংরেজী নাটক ও নাট্যবিষয়ক গ্রন্থ কেনা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল ইবসেন ও বার্ণার্ড'শ-এর রচনাবলী।

১৫, বিডন স্ট্রীটের ঘরখানিকে প্রথম থেকেই আমার খুব সংকীর্ণ বোধ হয়েছিল। তাই অনুসন্ধান চলল প্রশস্ততর জায়গার এবং তা পাওয়াও গেল। হরি ঘোষ স্ট্রীট ও রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেনের সংযোগস্থলে ঐ লেনে ঢুকতে ঠিক ডান কোণের বাড়ীতে একটি বেশ খোলামেলা ও বড়ো মাপের ঘর পাওয়া গেল মাসিক ৪০ টাকা ভাড়ায়। পাঠাগার খোলা থাকত বৈকাল ৫টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। এই এতখানি সময় না থাকতে পারলেও আমি সন্ধ্যার দিকে অনেকখানি সময় অতিবাহিত করতুম এখানে। একটি লোকও রাখা হ'ল পাঠাগারকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের জন্যে। কিন্তু শীঘ্রই আবিষ্কার করা গেল, লোকটি যে পরিমাণ চাঁদা আদায় করে, তাতে তার নিজের মাস-মাহিনাটি পূরণ হয়, তার বেশী নয়। ফলে, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পাঠাগারটি স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠতে পারল না। দু'একবার জাঁকিয়ে ওখানে কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন বসল বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত; কাজের কাজ কিছুই হ'ল না। কোনও কোনও সচ্ছল অবস্থার সদস্যের কাছ থেকে এককালীন সাহায্য হিসেবে দান গ্রহণ ক'রে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা কয়েক মাস দেওয়া গেল; কিন্তু এই অবস্থা কতদিন চলে?

এই সময়ে একটি সত্য আমি উপলব্ধি করেছিলুম। নাটক লোকে দেখতে যেমন ভালোবাসে, পড়তে ঠিক ততখানি আগ্রহী নয়। আর একটা কথা।

আজ যেমন লোকে বাঙলা নাটকের ইতিহাস, বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর পঠন-পাঠন ও গবেষণায় ব্রতী, বিশের দশকে তা' আদৌ ছিল না। তাই এই নাট্য পাঠাগারে কোনও দিনই কোনও আগ্রহী পাঠকের মুখ দেখিনি। ভাবছি, আজ যদি এই পাঠাগারটি থাকত, তাহ'লে সেখানে কত আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের ব্যস্ত আনাগোনাই না দেখতে পেতুম।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ এই অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগারের কোনই অস্তিত্ব নেই এবং এর জন্যে আমার নিজের মনের মধ্যে একটি অপরাধ বোধ তীব্র কাঁটার মতো আমাকে বিদ্ধ করে।

প্রায় তিন হাজার বাঙলা এবং ইংরেজী নাটক ও নাট্য বিষয়ক আলোচনার নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিশিষ্ট এই 'অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার'-এর অকল্পনীয় অবলুপ্তির ইতিহাসটি বিবৃত না করলেই নয়। রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেনে পাঠাগারের অস্তিত্বটিকে অর্থাভাবে টিকিয়ে রাখা যখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠল, তখন একটি প্রস্তাব হ'ল, পাঠাগারটিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হাতে তুলে দেওয়া। আমি তখন আপত্তি জানিয়ে বললুম, একটি প্রতিষ্ঠান যখন জন্মেছে, তখন আমাদের সকলেরই আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত, তাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে, বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। যদি এমন কোনও জায়গা পাওয়া যায়, যার জন্যে কোনও খরচা হবে না, তাহলে সেইখানে এই পাঠাগারকে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন উঠল, এমন ঘর কোথায়। আমি সবাইকে জানালুম, দু'চার দিনের মধ্যেই আমি খবর দিতে পারব।

আমার মাথায় ছিল, আমাদের ঠিক পিছনে পশ্চিমের বাড়ী, ১২ রামচন্দ্র মৈত্র লেনে যদি কোনও ঘর পাওয়া যায়। উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার যোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনেয় শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ছয় ভ্রাতা পুত্রকন্যাদিসহ এই বাড়ীতে বাস করতেন। ওঁর সেজ ভ্রাতা সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে না করতেই মারা গিয়েছিলেন তিন পুত্র ও চার কন্যা রেখে, আমরা ও পাড়ায় যাবার আগেই। বিরাট দোমহলা বাড়ী। এঁদের তুলনায় আমরা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হ'লেও আমাদের সকলকেই এঁরা অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখতেন। বিশেষ করে আমি যেন ওঁদেরই বাড়ীর ছেলেদের মধ্যে একজন হয়ে গিয়েছিলুম। শরৎকুমারের ভাইয়েদের মধ্যে একজন ছিলেন, যাঁর নাম ছিল তুলসীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভদ্রলোক অকৃতদার, শিক্ষিত, বাড়ীতে বসেই হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্‌টিস্ করতেন। তাঁর ওষুধের ওপর নির্ভরশীল রোগীর সংখ্যা সামান্য ছিল না। একহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দীর্ঘ চেহারাবিশিষ্ট তুলসীকাকা ব্যাডমিন্টনের যেমন একজন সেরা খেলোয়াড় ছিলেন, শেক্সপীয়ারের বই আবৃত্তি করতেও তাঁর কাছাকাছি আসতে পারে, এমন লোকও ছিল হয়ত সমগ্র কলকাতায় মুষ্টিমেয়। এঁদের বাড়ীতে "আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাব" নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল, যার বরাবরের সম্পাদক ছিলেন বুঁচিবাবু, ভালো নাম সম্ভবত

হরিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বুঁচিবাবু সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি ছিল, যা যে-কোনও লোকের, যে-কোনও কালে অবিশ্বাস্য মনে হবে। বুঁচিবাবুকে কেউ কোনও দিন স্নান করতে দেখেননি। না, আমরা তাঁর অত কাছাকাছি থেকেও কোনও দিন তাঁকে গায়ে জল ঢালতে দেখিনি। বয়েসে একটু বড়ো হবার পরে এ সম্পর্কে আমি বুঁচিকাকাকে প্রশ্ন করেছি। তিনি হাসতে হাসতে উত্তর হিসেবে বলেছিলেন, তাঁকে এক বিরাট জ্যোতিষী বলেছেন, গায়ে উনি জল ঢাললেই ওঁর কম্প দিয়ে জ্বর আসবে এবং তাতেই উনি মারা যাবেন। অতএব জল হইতে শতহস্ত দূরে আমাদের বুঁচিকাকা।

আগে গঙ্গাবক্ষে হুগলী জুবলী ঘাট থেকে আহিরীটোলা ঘাট পর্যন্ত যে তিরিশ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হ'ত, তার উদ্যোক্তা ছিল এই আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাব। প্রফুল্ল ঘোষ, নলিন মালিক, সমর সাহা প্রভৃতি সাঁতারু এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে প্রচুর নাম-যশের অধিকারী হন। এঁরা ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতারও নিয়মিত অনুষ্ঠান করতেন। এঁদের বাড়ীর আর একটি ছেলে, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাডমিণ্টনে একদা প্রচুর নাম কিনেছিলেন।

কিন্তু যেকথা কইছিলুম। এই যে অকৃতদার, হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশনার তুলসীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে আমরা সবাই 'টুলু' বা 'তুলু' কাকা বলে ডাকতুম, এই পশুপতি ছিল তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। তাঁরই কাছে আমি প্রস্তাবটি রাখলুম; খোলাখুলিই বললুম, এমন একটি চমৎকার নাট্যপাঠাগার ঘর ভাড়া না দিতে পেরে উঠে যাবে, এ যেন ভাবাই যায় না। তুলুকাকা আমাদের সমর্থন ক'রে বললেন, "It's a disgrace। বল' কি? ঘরভাড়া দিতে না পারার জন্য এমন একটা প্রতিষ্ঠান উঠে যাবে? তুমি আমাদের এখানে পাঠাগারটিকে স্থানান্তরিত করতে বল। আমাদের বার মহলের দোতলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরটি তো খালিই পড়ে আছে। ওটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে বড় জোর দু'টো দিন লাগুক, তারপর নিয়ে এস তোমার পাঠাগার।" আমি যেন হাতে চাঁদ পেলুম।

কার্যনির্বাহক সমিতির খাতায় উদ্দেশ্যটি একটি প্রস্তাবের আকারে পরিষ্কার ক'রে লিখে সদস্যদের বাড়ী বাড়ী তাঁদের সম্মতি-স্বাক্ষর নিয়ে প্রস্তাবটি পাশ করানো হ'ল এবং তার পরে যথারীতি উৎসাহ ভরে সমস্ত লাইব্রেরীটিকে তুলে আনা হ'ল প্রচণ্ড পরিশ্রম করে। গুটি ছয়-সাত আলমারিতে ঠাসা বইগুলিকে সকলে মিলে অনেক সময় দিয়ে ঝেড়েমুছে রাখা হ'ল। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর একটি 'প্লাস্টার অব প্যারিস'-এর আবক্ষ মূর্তি (বাস্ট) ছিল। এটি প্রায় ফুট তিনেক উঁচু। ওপরের দিকটা সরু, নীচের দিকটা চওড়া—এমন একটি চৌকা কাঠের আলমারির ওপর রাখা। ঐ আলমারির ভিতর রাখা থাকত যত দুষ্প্রাপ্য বই; ধরুন, গায়কোয়াড় সংস্করণ 'ভরত নাট্যসূত্র', গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষিত বই—সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশিম, বাঙ্গলার মসনদ,

দাদা ও দিদি, ছত্রপতি শিবাজী ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের উৎসাহ থাকলে কি হবে, জনগণকে উৎসাহিত করতে পারছি কৈ? নাট্যোৎসাহী পাঠকদের সমাবেশ ঘটছে কৈ?

তবে এই নিরুৎসাহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা সগর্বে বলবার মতো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পার্ষদ, ব্যবহারজীবী এবং অধ্যাপক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আমার সঙ্গে পরিচয়সূত্রে একদা ঐ অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগারে এসে হাজির হলেন এবং তাঁর 'Indian Stage' লেখার ব্যাপারে আমার সাহায্যপ্রার্থী হলেন। "পাঠাগারের দ্বার আপনার কাছে সদাই মুক্ত" এই বলে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানালুম এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে দিলুম, উনি যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ কেউ না কেউ তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে থাকবে।

মনে হয়, এ অবস্থায় তিনি যথেষ্টই উপকৃত বোধ করেছিলেন। দীর্ঘ এক বা দেড় বছর ধ'রে প্রায় প্রতিদিন তিনি তাঁদের রসা রোডের ওপর দক্ষিণ কালীঘাটস্থ বাসা থেকে ১২, রামচন্দ্র মৈত্র লেনস্থ অর্ধেন্দু নাট্যপাঠাগারে এসে তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত অনুসন্ধানের কাজ চালাতেন। এবং এরই ফলে প্রকাশিত হয়েছিল হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বিরাট চারখণ্ডে সম্পূর্ণ বই 'Indian Stage', ইংরাজী ভাষায় লেখা। কিন্তু ভদ্রলোকের কি আশ্চর্য ভদ্রতা জ্ঞান! ঐ বিরাট বইয়ের ভূমিকায় কোথাও তিনি 'অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগারের' নামোল্লেখ পর্যন্ত করেননি, কৃতজ্ঞতা স্বীকার তো দূরের কথা। অথচ আমাকে ঐ চারখণ্ডে সম্পূর্ণ বইটি উপহার দিতে তিনি বিস্মৃত হননি। মানুষ কত সহজেই না নিজেকে ছোট ক'রে ফেলে!

১২, রামচন্দ্র মৈত্র লেনে অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার থাকতে থাকতেই আমরা আর এক খেলায় মেতে উঠলুম। কলেজ ও পাঠাগার নিয়ে যতই ব্যস্ত থাকি না কেন, অমৃতলালের বৈকালিক আসরের জন্যে মন আমাদের পড়েই থাকত। অবসর পেলেই ছুটতুম সেখানে। ওখানেই দেখা হয়ে গেল একটি নতুন ছেলের সঙ্গে; নাম বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। প্রেসিডেন্সী কলেজে করুণাকুমার হাজরা এবং অশোকনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে বি. এ. পড়ত। কিন্তু শেষ পরীক্ষায় ফেল ক'রে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। অমৃতলালের আড্ডায় আমদানি করেছে অশোকনাথই। অশোকনাথ আসলে ছিল আমার থেকে তিন বছরের সিনিয়র। অশোকও আমাদের বাঙলা স্কুল থেকে মাইনের প্রথম হয়ে হিন্দু স্কুলে ভর্তি হয়। ম্যাট্রিকে হয় সে একজন দশটাকার স্কলার (বৃত্তিধারী)। অথচ তারপর আই. এ. পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং বি. এ.-তেও সংস্কৃত অনার্সে ফার্স্ট হয়। এম. এ-তেও ফার্স্ট হতে সে কসুর করে না। উত্তরকালে সে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেণ্টের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান হয়।

অশোকনাথ আসলে আমার থেকে তিন ক্লাশ উঁচুতে পড়ত। হিন্দু

স্কুলেও দেখেছি, ও যখন ফাস্ট' ক্লাশে, আমি তখন ফোর্থ ক্লাশে। কিন্তু হঠাৎ শুনলুম, অশোক 'আণ্ডার-এজ্' হওয়ায় ম্যাট্রিকে 'সেণ্ট্-আপ' হ'ল না (এখানে জেনে রাখা ভালো, আমাদের সময়ে ছেলেদের ষোল বছর বয়েস না হ'লে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হ'ত না); কাজেই আমি যখন থার্ড ক্লাশে, অশোক তখন ফাস্ট' ক্লাশে আটকে ব'সে আছে। তাই শেষ পর্যন্ত সে আমার দু' বছরের সিনিয়ার হয়ে গেল। আমার থেকে বয়সে বড়ো, লেখাপড়াতেও বেশী, কিন্তু কি ক'রে সম্ভব হ'ল জানি না, আমরা এক আড্ডার মানুষ হয়ে গেলুম। কখনও বলি, অশোকদা, আবার কখনও বলি শুধু অশোক এবং না, অশোক তাতে কিছুই মনে করে না।

এই অশোক মারফত আমরা পেলুম, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্যকে। ছেলেটি থাকত গ্রে স্ট্রীটের কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিমে বালাখানা লেনের কাছাকাছি; ওর বাবার নাম ছিল বিধুভূষণ ভট্টাচার্য। শ্রীমান বৈদ্যনাথের যেমন মুখ আল্‌গা, তেমনই সে ছিল রগ্‌চটা। কিন্তু হ'লে হবে কি? সে ছিল আশ্চর্য দিলখোলা: হাসতে হাসতে সে হাঁপিয়ে উঠত। এই বৈদ্যনাথ, অমিয়কুমার সান্যাল (যিনি আমার দু' বছর আগে বাঙলা স্কুল থেকে মাইনরে প্রথম হয়েছিলেন, অমৃতলালের 'গণেশ'-গুচ্ছের একজন হয়েছিলেন এবং অমৃত-বৈঠকের অন্যতম সভ্য) এবং আমি নিয়মিতভাবে ঐ ১২, রামচন্দ্র মৈত্র লেনস্থ অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার কক্ষটিতে প্রতিদিন বৈকালে মিলিত হতুম এবং নানা রকম জল্পনা কল্পনা করতুম। এরই মধ্যে একদিন স্থির হ'ল—আমরা একটি ছোটখাট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান খাড়া করব।

বৈদ্যনাথ গিয়ে অশোকনাথকে বলল—আমাদের প্রস্তাবিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের একটি জুতসই নাম ক'রে দাও। জন্ম নিল—চিত্রাসংসদ। কিন্তু এরই মধ্যে আরও দু' পাঁচজন লোক আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। বীরেন্দ্র ভদ্র 'চিত্রাসংসদ'-এ এসেছিলেন রীতিমত কসরৎ ক'রে। বীরেন পড়ত টাউন স্কুলে; ওর কাকা শ্রীঅনাথ ভদ্রের আবৃত্তি আমি আগে শুনেছিলুম টাউন স্কুলেরই কোনও উৎসবে। ভদ্রলোক নেহাৎ মন্দ আবৃত্তি করতেন না। রামধন মিত্র লেনের উকিল, রায়সাহেব কালীকৃষ্ণ ভদ্রের ছেলে বীরেন বয়েসের তুলনায় একটু জেঠাপ্রকৃতির ছিল, কেমন যেন সহবতের অভাব ছিল ওর মধ্যে। সন্ধ্যার দিকে আমার ফেরবার পথে বীরেন দু' একদিন আমার পাছু নিয়েছিল সম্ভবত ওকে আমাদের যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠতে চলেছে, তার সদস্য করে নেবার জন্যে অনুরোধ জানাবার চেষ্টায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর সাহসে কুলোয়নি। সোজাপথে সুবিধা হবে না জেনে শ্রীমান বীরেন বৈদ্যনাথকে পাকড়াও করল।

গোড়াতেই বলেছি, বৈদ্যনাথ একটি দিলখোলা ছেলে। সে বীরেনের আমড়াগাছিতে জল হয়ে গিয়ে তার হয়ে আমার কাছে আমতা-আমতা ক'রে বললে, "ছেলেটা একেবারে হেদিয়ে উঠেছে, ওকে নিয়ে নে, ভাই পশুপতি।

আমরা ওকে ঠিক গড়ে পিটে নিতে পারব।" বদ্যিনাথের আকুতিতে আর না করা গেল না, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আমাদের চিত্রাসংসদের একজন সদস্য শ্রেণীভুক্ত হলেন।

১৯২৬ সালের মাঝামাঝি কোনও একদিন 'চিত্রাসংসদ'-এর উদ্বোধন হ'ল ঐ ১২, রামচন্দ্র মৈত্র লেনের দোতলার পশ্চিমের বিরাট হলঘরটিতে, যেখানে অন্তত ৫০০ লোকের আসন হয়। হলটি যাকে বলে packed to suffocation—ভীড়ে ভীড়াক্কার। বিশেষ অতিথিবর্গের মধ্যে ছিলেন—নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু, আচার্য মন্মথমোহন বসু, উত্তরপাড়ার রাজকুমারেরা এবং আরও অনেক গণ্যমান্য অতিথি, যাঁদের নাম আজ আর মনে করতে পারছি না। গান হয়েছিল, সমবেত তারের যন্ত্রে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজানো হয়েছিল, 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং অমৃতলাল রচিত একটি নাটকের 'নাটকের প্রস্তাবনা' অংশটি (যাতে একজন সাহেব সাজা ইঙ্গবঙ্গ ছিল) অভিনীত হয়েছিল। এ ছাড়া হয়েছিল আবৃত্তি। সভাশেষে একমুখে সকলে নবগঠিত 'চিত্রাসংসদ'-এর জয়জয়কার করলেন। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, অমৃতলাল স্বয়ং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এবং আরও আশ্চর্যের কথা শেষ পর্যন্ত ঠায় ব'সে থেকে অনুষ্ঠান শেষে আমাকে ডেকে পাঠাবেন। আমি তো কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। কোনক্রমে রঙ কালিগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলে গায়ে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে ওঁর সামনে হাজির হয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিতে গেলুম। উনি যথারীতি বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি কি ঐ নাটকটির অভিনয় কখনও রঙ্গমঞ্চে দেখেছ? অন্তত ওর ঐ প্রস্তাবনাটুকু?" আমি ঘাড় নেড়ে 'না' বলাতে উনি কিছুটা বিস্মিত হলেন; পরে বললেন, "দেখ, এই বিশেষ ভূমিকাটি আমি নিজে অভিনয় করতুম। কিন্তু আমি বলব, তুমি আমার চেয়েও ভালো অভিনয় করেছ।" বলে উঠে দাঁড়ালেন, আমার পিঠ চাপড়ালেন এবং মুখে বললেন, "God bless you". এত বড়ো প্রশংসা আমি আমার জীবনে দু'বার পাইনি; মনটা আমার অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দে ভরে গেল।

সালটা ১৯২৫-২৬-এর মাঝামাঝি। ঠিক এই সময়টাতেই কলকাতায় ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন তার দ্বারোদ্ঘাটন করে। কোম্পানীর ভারতীয় প্রোগ্রামের অধিকর্তা ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। নৃপেনবাবু একজন ভালো ক্ল্যারিয়োনেটবাদক ছিলেন। ওঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর থিয়েটারে। নৃপেনবাবু এবং ওঁর সহকারী রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যায়। এবং তারই ফলে কিনা জানি না, 'চিত্রাসংসদ'ই হচ্ছে প্রথম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, যারা বাইরে থেকে মাত্র তারের যন্ত্রের সাহায্যে ব্রডকাস্টিং-এ রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজায়। এ ছাড়া প্রথম নাটকে দল হিসেবেও নাট্যানুষ্ঠান ব্রডকাস্ট করে। ব্রডকাস্টিং-এ আমাদের প্রথম নাটক ছিল রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'; বৈকুণ্ঠ—ভারতবর্ষ মাসিকের মুদ্রাকর প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের ছেলে পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য,

বৈকুণ্ঠের ভাই—বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, কেদার—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং ঈশান—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ব্রডকাস্টিং থেকে দু'বার অভিনীত হয়। এ-ছাড়া অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভাগিনেয় দেবেন্দ্রনাথ বসু (ব্যাঙ্‌বাবু) রচিত একটি হাস্যরসাত্মক প্রহসন 'পিণ্টু গোপাল'। চিঠিতে এবং লোকমুখে নৃপেন্দ্রনাথ ক্রমাগতই চাইতেন আমাকে—যাতে আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু নানা কারণে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। 'চিত্রাসংসদ'-এর তরফ থেকে যে-দু'জন প্রতিনিয়তই নৃপেনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, তারা হচ্ছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। তাই শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ওরা দু'জনেই ক্রমে বেতারের অঙ্গীভূত হয়ে গেল। বীরেন তার নিজের নামটি বজায় রাখলেও বৈদ্যনাথ কি কারণে জানি না তার নামটি পরিবর্তিত ক'রে নতুন নাম নেয়—বাণীকুমার। বাণীকুমার হিসেবে বৈদ্যনাথ বেতারের জন্যে বহু গান লিখেছে এবং বহু নাটক প্রণয়ন করেছে। এবং তার শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে—মহিষাসুর বধ। কিন্তু 'মহিষাসুর'-এর কথায় পরে আসছি। তার আগের অনেক কথাই বাদ পড়ে আছে।

'অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার', 'চিত্রাসংসদ'—সব মিলিয়ে-জুলিয়ে চলছে এবং ওরই সঙ্গে কলেজের পড়াও। ১৯২৭ সালের গোড়ায় স্কটিশ চার্চেশ কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে (আমার ছিল ম্যাথমেটিক্‌সে অনার্স; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে সময়টা অনার্স পরীক্ষা হবো হবো, সেই সময়ে আমার হ'ল দুরন্ত রক্তামাশয়, একদিন শ'খানেক বারেরও বেশী দাস্ত হ'তে আমার জ্ঞান লুপ্ত হয়—ফলে অনার্স পরীক্ষা আর আমার দেওয়া হয়নি) স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্যে চ'লে গেলুম দেওঘর—বৈদ্যনাথধাম। সেখানে ক্যাস্টার্স টাউনে 'আরোগ্য আলয়' নামে একটি বেশ খোলামেলা বাড়ীতে নির্বিবাদে দিন কাটাচ্ছি আমার বরাহনগরের সেজদিদির পরিবারের সঙ্গে। সেজদিদি আমার সেজ জেঠামহাশয়ের মেয়ে; নাম রাধারাণী। জামাইদা হরিদাসবাবু বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটিতে কোনও একটি বড়ো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমরা বড়ো জেঠামশাইয়ের মেয়ে ইন্দুদিদিকে বলতুম বড়দি; এর পরে মেজদিদি কাকে বলতুম, তা' আজ আর আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। তার পরে এই বরাহনগরের সেজদিদি। এমন সম্প্রীতি আমাদের আর কারো সঙ্গে ছিল না। আমাদের কত রকম অত্যাচারই যে তিনি হাসিমুখে সহ্য করতেন, তা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বছরের দু'টো দিন তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিয়ে তিনি এক রকম উৎসবই করতেন। এক, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন; কত রকম রান্না যে তিনি নিজের হাতে রেঁধে সেদিন তাঁর ভাইয়েদের—আপন এবং তুতো ভাইয়েদের খাওয়াতেন, তার একটা পুরো ফিরিস্তি আজ আর আমরা কেউই দিতে পারব না। আর দুই হচ্ছে, বিজয়া দশমীর সন্ধ্যার পরে। ভর পেট নানা রকম খাওয়া, যার সঙ্গে থাকত মিষ্টি ও সিদ্ধি। সিদ্ধির মাত্রাধিক্য হলে আমি যে প্রায়ই বেতাল হয়ে পড়তুম, সে কথা মনে হলে এখনও আমার কৌতুক উদ্রেক হয়।

যাই হোক, ঐ দেওঘরের 'আরোগ্য আলয়'-এ একদিন এসে পৌঁছল আমার বন্ধু মুরারিমোহন শীলের একখানি খামে ভর্তি চিঠি। চিঠি আনুপূর্বিক পড়ে তো আমার মাথায় হাত। এ কি হ'তে কি ঘটে গেল? আমি বুঝতেই পারলুম না, আমার কিছুদিনের অনুপস্থিতির মধ্যে আমার বন্ধু মুরারি হঠাৎ মাথা গরম ক'রে এ কি করল? চিঠিতে সে জানিয়েছে, ১২, নম্বর রামচন্দ্র মৈত্র লেনের বাইরের দোতলার দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে পাঠাগারের থাকা নিয়ে প্রথমে বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে ওর কিছু কথা কাটাকাটি হয় এবং পরে সেই বিবাদে এসে যোগ দেন তুলসীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (তুলুকাকা)। ক্রমে সেই বিবাদ এমন চরমে ওঠে যে, তিনি মুরারিকে ওই ঘর থেকে বার ক'রে দিয়ে দরজায় নিজেদের তালা দিয়ে দেন। উত্তেজিত মুরারি, কার সঙ্গে পরামর্শ করে জানি না, শেষ পর্যন্ত পুলিশ নিয়ে আসে, কিন্তু পুলিশও ব্যর্থ হয় 'অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার'-কে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কবল থেকে উদ্ধার করতে। না, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মশাই এ-ব্যাপারে কোনও সাহায্যহস্ত প্রসারিত করেননি। মনে হয়, তিনি পাঠাগার সম্বন্ধে একেবারে নিঃস্পৃহ ও নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আমি কলকাতায় ফিরে সুযোগ-সুবিধামত পাঠাগারের কথা পাড়তেই তুলুকাকা—তিনি অত্যন্ত আবেগপরায়ণ বা sentimental লোক ছিলেন,—আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলতেন, "অন্য কথা কও।" পরে দেখেছিলুম, পাঠাগারটিকে সম্পূর্ণ ওঁরা ওঁদের বিরাট ঠাকুর দালানে নামিয়ে দিয়েছিলেন এবং ঠাকুরদালানে ঢোকবার পথে জালের দরজা তৈরী করিয়ে তাতে চাবি দিয়ে দিয়েছিলেন। পরিতাপের সীমাপরিসীমা রইল না। আমি ভালো মনে কি করতে চেয়েছিলুম, আর এ কি হ'ল শেষ পর্যন্ত! কেন এমনটা ওঁরা করলেন? পরে তিনি বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের 'চিত্রাসংসদ'-এর জন্যে কোণের ঘরটি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পার। যতদিন 'পাঠাগার'টি চাবিবন্ধ ছিল, ততদিন আমরা চিত্রাসংসদের সভ্যরা মিলিত হতুম পশ্চিমদিককার বিরাট হলঘরে।

বছরটা ১৯২৭ই হবে। শরৎকালের প্রারম্ভে ভাদ্রের শেষাশেষি আমরা 'চিত্রাসংসদ' থেকে একটা উৎসব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলুম, যার নাম দেওয়া হ'ল—'শেষ বর্ষণ'। গানের নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে, তারের যন্ত্রগুলি ঝঙ্কার তুলতে আরম্ভ করেছে নিপুণ বেহালা-বাদক অবনী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, এমন সময়ে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। জিতেন একদিন আর কলেজ থেকে ফিরল না। আমাদের থেকে বছর খানেক কি দুয়েকের ছোট, জিতেন্দ্রনাথ বসু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় টাউন স্কুল থেকে ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ছিল। রঙটি শ্যামলা হলে কি হবে, ভারী সুশ্রী চেহারা। চোখে ছিল পুরু চশমা। কম্বুলিয়াটোলা লেন যেখানে এসে শ্যামপুকুর স্ট্রীটের মুখ বরাবর মিশেছিল, সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক দ্বারিকানাথ ঘোষের সন্দেশ তৈরীর আড়ত যেখানে, তারই প্রায়

পাশাপাশি তার বাড়ী ছিল।

আমাদের কাছে জিতেনের আদর ছিল তার গানের গলার জন্যে। প্রায়ই বিকেলে বাগবাজারের নিয়োগী ঘাটে গঙ্গার ধারে বসে সে তার মধুর মিষ্টি কণ্ঠের গান শুনিয়ে আমাদের পাগল করে দিত পৃথিবী আমরা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকতুম। এমন ঈশ্বরদত্ত সুকণ্ঠের অধিকারী আমার জীবনে আমি দু'টি দেখিনি ; কারও সঙ্গে তুলনা না ক'রেই বলব, না ওর জোড়া গাইয়ে আজ পর্যন্ত আমার নজরে আসেনি। সেই জিতেন একদিন কলেজ থেকে ফিরল না : অথচ 'শেষ বর্ষণ' উৎসবের দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। পুলিশের সাহায্যে পৃথিবী তোলপাড় করে ফেলা হল, না, জিতেনের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। সে যেন সহসা বায়ুর সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

আমাদের একজন গাইয়ে চাই 'চিত্রাসংসদ'-এর জন্যে। সবাই অনুসন্ধানে লেগে গেলুম। দু' দিন যায়, পাঁচ দিন যায়, গাইয়ের সন্ধান আর মেলে না। শেষে যখন প্রায় হাল ছেড়ে আমরা সবাই বসে আছি, এমন সময়ে এক বৈকালে কলিকাতা পুলিশের 'ওয়েট-লিফ্‌টার' সাব-ইনস্পেক্টার জ্ঞান দত্তের ভাই সত্য দত্ত এক ভবিষ্যযুক্ত ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে দেখছি, সত্যর গলা কানে গেল—দেখুন, চলবে কিনা। ভদ্রলোককে বসতে বললুম এবং নাম জিজ্ঞেস না করেই বললুম— "আপনি গান জানেন ?" তিনি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু কিছু।" সামনেই হারমোনিয়াম খোলা ছিল, ফরমায়েশ করলুম, "তাহলে একখানা হোক না।"

ভদ্রলোক হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে বাজিয়ে গাইলেন একখানি শ্যামা সঙ্গীত। গলাটি ভালো। একটু থেমে বললুম, 'কিছু আধুনিক, টাধুনিক—'

"কি রকম আধুনিক চান ?" ভদ্রলোকের প্রশ্ন।

আমতা আমতা করে বললুম, "এই রবীন্দ্র সঙ্গীত—"

"হ্যাঁ, রবীন্দ্রসঙ্গীতই গাইছি," বলেই গাইতে শুরু করলেন, "আজি মর্মর-ধ্বনি কেন জাগিল রে"।

ভদ্রলোক যখন গাইছেন, তখন মনে মনে আমি না হেসে থাকতে পারিনি। বোধ করি, সেই চাপা হাসির কিছুটা কোনও অসতর্ক মুহূর্তে আমার ঠোঁটের কোণে হয়ত ফুটে উঠেছিল। ভদ্রলোক গান শেষ করেই আমাকে প্রশ্ন ক'রে বসলেন, "আপনি হাসলেন যে ! এটা কি রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় ?"

আমি শান্ত ভাবেই জবাব দিলুম, "গানের ভাষাটি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের রচনা, কিন্তু গানটি রবীন্দ্র সঙ্গীত নয়।"

"কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না", বললেন ভদ্রলোক এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়ে বললেন, "হিজ মাস্টার্স ভয়েসে কে. মল্লিকের রেকর্ড শোনেননি ? ঠিক এই ভাবে গাওয়া আছে।"

"আমিও সে-কথা মানছি ; তবে কথা কি জানেন—ভদ্রলোক রবীন্দ্র

সঙ্গীত গাইতেই জানেন না।"

আমার সামনের ভদ্রলোক আমার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক। আমি আমার কথাকে আর একটু পরিষ্কার করে বললুম, "রবীন্দ্রনাথের রচনা যে-কোনও সুরে না বুঝে গাইলেই তা রবীন্দ্র সঙ্গীত হয়ে ওঠে না। আপাততঃ থাক এ-সব কথা। আমার নাম পশুপতি চট্টোপাধ্যায়; আপনার নামটি কি, ভাই?"

ভদ্রলোক বললেন, "শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক।"

"বাড়ী?"

"আমহার্স্ট স্ট্রীটের যুগোলকিশোর দাস লেনে।"

"তাই নাকি? তা ঐ যুগোলকিশোর দাস লেনে আমার একজন অতি পরিচিত ব্যক্তি থাকেন, নাম কালীবাবু।"

"উনি আমার ছোট কাকা", পঙ্কজ সবিনয়ে উত্তর দিল।

আমি ওর সমস্যাটা বুঝতে পেরে ব্যাপারটা পরিষ্কার করবার জন্যে বললুম, "কালীবাবু, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং জেলেপাড়ার জ্যোতিশচন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে প্রায়ই অমৃতলাল বসু মহাশয়ের কাছে আসেন ত', সেই থেকে ওঁদের সঙ্গে আমার পরিচয়।" কথায় কথায় জানতে পারলুম, পঙ্কজ আমারই সঙ্গে বঙ্গবাসী কলেজেও পড়েছে। তবে প্রতিটি সেক্শনে ২৭০/২৮০ জন ক'রে ছাত্র থাকার দরুণ আমরা নিকট-সান্নিধ্যে আসতে পারিনি। এরপরে পঙ্কজকে বসিয়ে রেখে আমি একটি কাজ করলুম। তখনকার দিনে কিছুটা বাদামী রঙের, আজকাল কভার পেপারগুলি যে রঙের হয়, অনেকটা সেই রঙের বড়ো সাইজের লেখবার কাগজ পাওয়া যেত; আমরা বলতুম বালির কাগজ। সেই একখানা কাগজ টেনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান থেকে একখানি গান বেছে নিলুম এবং সেটিকে পঙ্কজের সামনে ধ'রে জিজ্ঞেস করলুম, এই গানটি জান? সে ঘাড় নেড়ে বললে, "না।"

আমি তখন গানখানি তার সামনে পড়লুম—একবার, দু'বার, তিনবার; পরে বললুম, "কবি কি বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছ?" ব'লেই গানটির ভাবধারা কিছুটা ব'লে দিলুম। তারপর বললুম, "রবীন্দ্রনাথ গানে সব সময়ে সম্পূর্ণ লাইনটা শেষ করেন না; ধর, মাত্র অর্ধেকটা এগিয়েই আবার ফিরে গোড়া থেকে ধরেন। এই ব'লে ঐ বালির কাগজে গানখানা সম্ভাব্য কি ভাবে ভেঙে গাওয়া হবে, সেইভাবে সাজিয়ে লিখে দিলুম। পরে বললুম, গানের মূল ভাবটি প্রকাশিত হয়, এমন সুর বসিয়ে যে-ছন্দে গানটি বাঁধা, সেই অনুযায়ী তাল বসাবে। দেখবে, গানের সুর তৈরী হয়ে গেছে।"

পঙ্কজ আমার লেখাটিকে আরও দু'একবার যখন প'ড়ে দেখছে, তখন স্বভাবতই জিজ্ঞেস করলুম, "আরও কিছু জানবার আছে?"

"না, ঠিক আছে", ব'লেই সে কাগজখানাকে সযত্নে মুড়ে তার পকেটে রাখতে রাখতে বলল, "কিন্তু কালই তো হয়ে উঠবে না।"

"কে বলছে, তোমাকে কালই তৈরী ক'রে আনতে? সাত দিন, দশ দিন—

যত দিন লাগুক না কেন? যতক্ষণ না তোমার মনে হচ্ছে ঠিক ঠিক হয়েছে, ততক্ষণ আসবার দরকার নেই—ঠিক হ'লে আসবে।"

পঙ্কজ যেন তখনই সুর তৈরী করতে গেল, সেইভাবে ঝট্ ক'রে উঠে পড়ল এবং সবাইকে প্রায় সাংড়া নমস্কার জানিয়ে বলল—"আসি।" পর-মুহূর্তেই সে ঘরের বাইরে চলে গেছে।

না, পঙ্কজ সাত দিনও নয়, দশ দিনও নয়, ঠিক পাঁচ দিন বাদেই এসে হাজির এবং প্রথমেই আমাকে বললে, "দেখুন, গানখানিকে আপনি যেমন ভেঙে ভেঙে লিখে দিয়েছিলেন, তার দু'একটিকে বাগ মানাতে পারিনি, নইলে দেখবেন, সবটাই আপনার অনুযায়ী হয়েছে।" পঙ্কজ হারমোনিয়াম ধরল, মনে মনে যেন কাকে প্রণাম ক'রে নিল, তারপর গাইল—বিভোর হয়ে গাইল। গান শেষ করা মাত্রই আমি তাকে বেশ সাহস দিয়েই বললুম—"হ্যাঁ, এটি রবীন্দ্র সঙ্গীত হয়েছে।"

পঙ্কজ অবাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। পরে বললে, "এই গান আমি কখনও কাউকে গাইতে শুনিনি, এই গানের কোনও রেকর্ড আছে কিনা, তাও জানি না। তবু আপনি বলছেন, এটি রবীন্দ্র সঙ্গীত হয়েছে?"

আমি বেশ জোরের সঙ্গে জবাব দিলুম, "হ্যাঁ, আমি বলছি, হয়েছে; একশো বার বলছি, হয়েছে। এবং এও ভবিষ্যদ্বাণী আমি করছি, তোমার দ্বারা খুব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত হবে। যাতে তুমি রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখবার সুযোগ পাও, সে ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব।"

আমার জানা ছিল, দু'পাঁচ দিন বাদেই জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে ভাদ্রোৎসবের অনুষ্ঠান বসবে। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা সুদর্শন ও সুসাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের। পুরোপুরি যাকে আর্টিস্ট বলে মণিলাল ছিলেন তাই। নৃত্যবিশারদ হিসেবে তো তাঁর জুড়ি ছিল না। শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগাধীনে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 'সীতা' নাটকে দর্শকরা যে নবধারার নৃত্য দেখে পুলকিত হন, তা' এই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফল। আর্ট থিয়েটারে অপরেশচন্দ্র লিখিত 'ফুল্লরা' নাটকের নাম-ভূমিকায় নীহারবালা যে কটি দর্শকচিত্ত বিহারী নাচ নেচেছিলেন, তার প্রতিটিই মণিলালের স্বকপোলকল্পিত। শ্রীশ বসু রচিত 'পুণ্ডরীক' নাটকে সিতারার ভূমিকায় অভিনেত্রী কৃষ্ণভামিনী যে অসিনৃত্য প্রদর্শন করেন, তাও এই মণিলালেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। অঙ্কনেও তাঁর আশ্চর্য পারদর্শিতা ছিল।

সর্ব দিক দিয়ে একজন শিল্পী হিসেবে সার্থক পুরুষ ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। আমি এই মণিলালদা'কে গিয়ে আমাদের নতুন বন্ধু পঙ্কজ মল্লিকের কথা বললুম। মণিদা' উৎসাহিত হয়ে বললেন, "তুমি খুব ভালো সময়ে এসেছ, পশুপতি। একে ত' ভাদ্রোৎসব এবারে দু'তিন দিন ধ'রে

দু'বেলাই অনুষ্ঠিত হবে ; তার ওপরে দিনুদা উৎসবটিকে নিজে পরিচালনা করবেন। আমি তোমাকে খান চার-পাঁচ কার্ড দিয়ে দিচ্ছি। তুমি ছেলেটিকে নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে। আমার সঙ্গে পরিচয় ক'রে তো দেবেই ; তার পরে সময় বুঝে আমি দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ক'রে দেব। ব্যস, তাহ'লেই তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি।"

মণিলালদা'র কাছ থেকে কার্ডগুলি নিয়ে আমি জোড়াসাঁকো থেকে সোজা ছুটলুম মাণিকতলা-আমহার্স্ট স্ট্রীটের সংযোগ বরাবর যুগোলকিশোর দাস লেনে এবং ভাগ্যক্রমে পঙ্কজকে বাড়ীতেই পেয়ে গেলুম। তাকে সমস্ত কথা বলতে সে রীতিমত উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল, প্রথম অধিবেশনে যাবার আগে আমরা দু'জনে কোথায় মিলিত হব। সব ক'টি অধিবেশনই আমরা দেখলুম। দিনদা' মাঝে ব'সে, তাঁর বামে অমিতা সেন (খুকু) এবং দক্ষিণে রমা কর (সুরেন করের মেয়ে)। কী আশ্চর্য জোয়ারী দিনদার কণ্ঠে! হাঁ, পুরুষ মানুষ বটে! এই অধিবেশনগুলিতে যোগ দেওয়ার ফাঁকে পঙ্কজের শুধু মণিদার সঙ্গেই পরিচয় হল না, তাঁর মারফত দিনদার সঙ্গেও পরিচয় পর্বটা সারা হয়ে গেল। এই হ'ল পঙ্কজ-কুমার মল্লিকের রবীন্দ্রগীতি চর্চার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

কয়েক মাস পরে 'চিত্রাসংসদ'-এ আর একটি যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, এইখানে সেটি ব'লে নিতে চাই ; নইলে পরে আর হয়ত' সময় ও সুযোগ পাব না। শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'ষোড়শী' মঞ্চস্থ করবার পর কিছুকাল অতিবাহিত হ'লে 'চিত্রাসংসদ' থেকে 'ষোড়শী' অভিনয় করার উদ্যোগপর্ব শুরু হয়। আমি প্রস্তাব করি, 'ষোড়শী'র একেবারে শেষ দৃশ্যটি অভিনীত হবার আগে আমরা একটি দৃশ্য সংযোজন করব, যেখানে অত্যাচারী জমিদার জীবানন্দকে কোনও রকমে আঘাত না করবার যে নিষেধাজ্ঞা ষোড়শী সাগর সর্দারের ওপর জারি করেছিলেন, সে-কথা সাগরের কিছু কিছু অনুচরের জানা না থাকায় তারা নিরস্ত্র জীবানন্দকে এমনভাবে প্রহার করে, যা জীবানন্দের মৃত্যু ডেকে আনে।

অবশ্য এই মারের ব্যাপারটিকে প্রধানতঃ নেপথ্যেই সংঘটিত করবার ব্যবস্থা হয়। জীবানন্দকে মেরে সাগরের লোকেরা ফিরে যাবার পরে মঞ্চ এক মুহূর্ত খালি থাকবে এবং পরে এক বাউল গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করবে এবং এই গানটি হবে রবীন্দ্রনাথ রচিত কবিতা 'শেষ খেয়া' থেকে সঙ্কলিত চারটি স্তবক : "দিনের শেষে ঘুমের দেশে······আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের এই শেষ খেয়ায় ?" এর মধ্যে মাত্র দু'টি স্তবক মঞ্চে গাওয়া হবে। বাকীটুকু চলবে শেষ দৃশ্যের শুরুতে। পঙ্কজকে বললুম—"সুর করো।" সে ত' রেগে অস্থির ; বলে, "তোমার যত সব আজগুবি কাণ্ড! কবিতার চারটে স্তবক বেছে নিয়ে বলছ কিনা—এইটে গান হিসেবে গাইতে হবে।"

আমি ও আমার সঙ্গে বীরেন বললে, "কেন হবে না ? গান হিসেবে কি দারুণ appealing—মর্মস্পর্শী হবে!" তখন আমার কেনা একটি টেবিল-

হার্মোনিয়াম নিয়ে পঙ্কজ সুর করতে বসল এবং বীরেন তাতে ফোড়ন যোগাতে লাগল। এবং শেষ পর্যন্ত "দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটাপরা ঐ ছায়া ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ" একটি অবিস্মরণীয় গান হিসেবে রূপ পেল। এর কিছুদিন পরেই ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত 'ঋতুরঙ্গ-নৃত্যে গীতাভিনয়ে' "তুমি কি কেবলই ছবি" কবিতাকে গান হিসেবে গাওয়া হতে দেখেছিলুম এবং সে-কথা পঙ্কজকে জানাতে সে অবাক হয়ে বলল, "বলিস কি? তাহ'লে তো আমরা 'দিনের শেষে' কে গানে রূপান্তরিত ক'রে ভুল করিনি।" বৈদ্যনাথ ও আমি সমস্বরে বললুম—"আলবৎ নয়।"

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করতে না করতেই যে আমার একটু একটু ক'রে ডানা খুলতে শুরু করেছিল, সে-কথা পাঠক মাত্রই অনুমান করতে পারছেন। এই পাখা মেলার কার্যে প্রধান সহায়ক হয়েছিল বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। প্রবেশিকার ফল বেরিয়েছে কি না বেরিয়েছে, আমরা দু'জনে মিলে তখন হেঁটে পাড়ি দিতে শুরু করেছি শ্যামবাজার থেকে ঠন্‌ঠনে কালীতলায় কবি নরেন্দ্র দেবের আড্ডায় যোগ দেবার জন্যে প্রতি রবিবার। বেলা সাড়ে আটটা নটা নাগাদ তাঁর বাড়ী পৌঁছে সেখানে দেখতুম কবি গিরিজাকুমার বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং আরও কোনও কোনও সাহিত্যসেবীকে। ওখানে ঘণ্টা খানেক গুলতানি মারবার পরে আমরা সকলে মিলে পদব্রজে রওনা হতুম মেছুয়াবাজার স্ট্রীটস্থ শিল্পী চারু রায়ের বাসগৃহের দোতলার ঘরখানির উদ্দেশ্যে। এই ঘরে আমরা নিশ্চিতভাবেই দেখতে পেতুম শিল্পী-পত্নী মায়া রায়কে, শিল্পীর ভগ্নী ঝানুকে (ভালো নামটি আমি ভুলে গেছি) এবং তাঁর স্বনামধন্য স্বামী, সিনেমা আর্টিস্ট ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যিনি একদা ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টসের নির্বাক ছবি 'নিষিদ্ধ ফল'-এর নায়ক হিসেবে যশস্বী হয়েছিলেন এবং পরে নিউথিয়েটার্সে বহু ছবির নায়ক হিসেবে কাজ করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। ভদ্রলোক অত্যন্ত রসিক এবং চমৎকার ভদ্র ছিলেন।

এগারোটা, সাড়ে এগারোটা নাগাদ চারুদা'র বাড়ী পৌঁছুবার পরে আর্ট, সাহিত্য, নাটক, নৃত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা এবং প্রচুরতর মতামত বিনিয়োগের মাধ্যমে যে প্রাপ্যটি ছিল আমাদের বাঁধাধরা, সেটি হচ্ছে, মায়াবৌদির নিজের হাতে তৈরী করা এক প্লেট ক'রে মোহনভোগ ও তার সঙ্গে এক কাপ ক'রে চা। কালেভদ্রে এই মোহনভোগের পরিবর্তে মায়াবৌদি তৈরী ক'রে বসতেন মুচ্‌মুচে তেলেভাজা বেগুনী বা পটুলি।

একটা কথা কবি নরেন্দ্র দেবের মুখে লেগেই ছিল; সেটি হচ্ছে, "দ্যাখ্ চারু, তুই এই মায়া-মার্কা মুখ আঁকাটা এবার ছাড়তো!" কথাটা অনেক সময়ে মায়া বৌদির উপস্থিতিতেই হ'ত। অথচ, কি আশ্চর্য, এ-কথায় কোনও দিনই আমরা তাঁকে অণুমাত্রও অভিমান করতে দেখিনি। সব সময়েই তাঁর মুখে মৃদু হাসিটি লেগেই থাকত। পাতলা চেহারার শ্যামলা মায়া বৌদির একটা ভিন্ন জাতের শ্রী ছিল, যার মায়া চারুদা' কিছুতেই কাটাতে পারতেন না।

বেলা একটা দেড়টা পর্যন্ত রীতিমত আড্ডা মেরে আমরা যে-যার বাড়ী ফিরতুম। আমার বাড়ী ছিল সব থেকে দূরে—ফিরতে তিনটে হয়ে যেত।

১৯২৩ সালে, যে-বছরে নৈহাটিতে চতুর্দশ বর্ষীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয়, সেই বছরই রথযাত্রার পুণ্যদিনে আর্ট থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন হয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'কর্ণার্জুন' নাটক দিয়ে। এই আর্ট থিয়েটারের উদ্বোধন এবং প্রতিষ্ঠা নিয়ে সে-যুগের নাট্য জগতে একটা রীতিমত হৈ-চৈ প'ড়ে যায়। বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম দেখা যায় যে, কোনও একজন থিয়েটারের মালিক না হয়ে একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী থিয়েটারের মালিকানা গ্রহণ করলেন। এবং সে-মালিক কারা? অ্যাটর্নী নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, অ্যাটর্নী সতীশচন্দ্র সেন, বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সের মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, বিখ্যাত জমিদার কুমারকৃষ্ণ মিত্র এবং বিরাট ধনী ও ব্যবসায়ী গঙ্গাধর মল্লিক।

স্টার থিয়েটার বাড়ীটি বলতে গেলে, আপাদমস্তক সুসংস্কৃত করা হ'ল। কাঠের গ্যালারী তুলে দিয়ে থিয়েটারের মেজেকে পিছন দিক থেকে সামনের দিকে ক্রমশঃ ঢালু ক'রে কংক্রিট করা হ'ল এবং তার ওপর প্রথম দু'তিন সারি ছেড়ে দিয়ে আগাগোড়া টিপ্-আপ চেয়ার বসানো হ'ল। শেষের দু'তিন পংক্তি কাঠের; বাকী সব গদিমোড়া। ঐ কাঠের দু'তিন পংক্তির এক একটি আসনের মূল্য নির্ধারিত হ'ল ১ টাকা প্রতি আসন। বাকী গদিমোড়া আসন-গুলি দুই, তিন ও পাঁচ টাকা ক'রে। বলা বাহুল্য, কাছেরগুলির দাম বেশী। আর সামনের দু'তিন সারিতে থাকত ভেলভেটের গদিমোড়া সোফা-সেটি।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলেন ম্যানেজার; তিনিই নাট্যশিক্ষক এবং অভিনীত হ'ল তাঁরই লেখা নাটক 'কর্ণার্জুন'। নিয়তির চক্রে অসামান্য যোদ্ধা হয়েও কর্ণের রথচক্র মেদিনী গ্রাস করায় তাঁর সকল শৌর্য-বীর্য বৃথায় গেল, এই হ'ল নাটকের বক্তব্য। এইবার প্রশ্ন, এই নতুন নাটকে অভিনেতা-অভিনেত্রী কারা।

আজ থেকে ৬০ বছর আগেকার কথা যাঁদের আবছা আবছা মনে আছে, তাঁরা বলবেন, প্রাচীরপত্রে একসঙ্গে এত নতুন নাম-না-জানা শিল্পীর নাম তাঁরা পূর্বে কখনও দেখেননি। যতদূর মনে আছে, তাতে পরপর এই নাম-গুলি ছিল: তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশচন্দ্র মিত্র বি-এল, অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিভাননী, কৃষ্ণভামিনী, নীহারবালা প্রমুখ।

বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে, বোধকরি, এই প্রথম পংক্তি নম্বর এবং আসন সংখ্যা সংবলিত অগ্রিম টিকিট বিক্রয়ের প্রথা প্রবর্তন করা হয়। থিয়েটারের সেক্রেটারী, অক্লান্ত পরিশ্রমী এবং বহু গুণান্বিত প্রবোধচন্দ্র গুহ মশাই প্রতিদিন সকালে নিজে এই অগ্রিম টিকিট বেচতে বসতেন—এ-দৃশ্য আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।

আগেই বলেছি ১৯২৩ সালের রথের দিন 'দি আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড'-

এর পরিচালনায় সুসংস্কৃত স্টার থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন হয় 'কর্ণার্জুন' নাটক নিয়ে। এই 'কর্ণার্জুন' নাট্যাভিনয়ে বাঙলার নাট্যপ্রিয় দর্শকবৃন্দ অন্ততঃ তিনটি নতুন জিনিস প্রত্যক্ষ করেন। এক, অভিনয়ের ভিতর কিছু কিছু নূতনত্ব; দুই, দৃশ্যপট গঠনে 'কাট্-আউট'-এর প্রচুর ব্যবহার এবং তিন, পাত্র-পাত্রীদের বেশবাসে চমকপ্রদ পরিবর্তন।

অভিনয়ের মধ্যে যে নূতনত্ব, তার ভিতর কিন্তু সমতা ছিল না। তিনকড়ি চক্রবর্তী যে উচ্ছ্বাসবর্জিত ভাবে, হস্তপদ সঞ্চালনের সঙ্গে তাঁর সংলাপ বলতেন, নরেশচন্দ্র মিত্রের চাতুর্যপূর্ণ চক্ষুক্রিয়াসহ কিছুটা যেন চিবিয়ে চিবিয়ে সংলাপ বলা তার থেকে বহুলাংশে পৃথক। আবার অহীন্দ্র চৌধুরীর সিনেমাধর্মী অঙ্গভঙ্গীসহ কিছুটা থেমে থেমে বাচন এঁদের থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের। মাত্র একটি দৃশ্যে (সভাস্থলে দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিবাদ হিসেবে) দুঃশাসন-বেশে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুমিষ্ট, সাবলীল আবৃত্তি আবার এক ভিন্ন স্বাদ বহন ক'রে এনেছিল।

আগে কি পৌরাণিক, কি ঐতিহাসিক নাটকে পুরুষ শিল্পীরা বেশীর ভাগ সময়েই ব্যবহার করত ভেলভেটের হাফপ্যাণ্ট ও ভেলভেটের জ্যাকেট। এই প্রথম দেখা গেল, কর্ণ, অর্জুন, ভীম, দুর্যোধন প্রমুখ পুরুষ চরিত্রগুলি সিল্কের কাপড় এক বিচিত্র উপায়ে ফেত্তা দিয়ে পরেছেন, দেহের উপরিভাগে চক্‌চকে মখমলের হাফ হাতা জ্যাকেট, গলায় ও হাতে পরেছেন বড়ো বড়ো নকল মুক্তোর হার ও বালা। সব মিলিয়ে দর্শকরা বেশ খানিকটা নূতনত্ব উপভোগ করেছিল, এ-কথা মানতেই হবে।

কিন্তু স্টারে এই নতুন দলের অভিনয় দেখবার আগেই নাট্যরসিক দর্শকেরা অন্ততঃ তিনটি নতুন নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এই তিনটি নতুন নাম হচ্ছে—শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এই দশকের উত্তরার্ধে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সিনিয়র মেম্বারদের মধ্যে শিশিরকুমারের অভিনয় প্রতিভা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। পরে তিনি যখন বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপকের পদ ত্যাগ ক'রে ম্যাডান থিয়েটার্স গঠিত বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন এবং ১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে (বর্তমানের শ্রী সিনেমায়) ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'আলমগীর' নাটকের নাম-ভূমিকায় দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করেন, তখন বাঙলার নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দ নাট্যগগনে এক নব সূর্যোদয় দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

অপর দিকে মিনার্ভা থিয়েটারে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা' নাটকে দুই শিক্ষিত আধুনিক ভাবাপন্ন অভিনেতা—নরেশচন্দ্র মিত্র, বি-এল এবং রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়কেও দর্শকগণ অভিবাদন জানান। বোধকরি, ম্যাডানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় শিশিরকুমার ঐ ক্ষীরোদপ্রসাদেরই আর একখানি নাটক 'রঘুবীর'-এ কয়েক রাত্রি অভিনয়

করবার পরে ওঁদের সংস্রব ত্যাগ করেন।

এর পরে শিশিরকুমার নিজের দল গড়বার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং ১৯২৩ সালে ইডেন গার্ডেন্স-এ যে কংগ্রেস একজিবিসন হয়, তাতে কয়েকদিন ধ'রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'সীতা' নাটক অভিনয় করে নাট্যরসিক দর্শক-বৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। কিন্তু একটি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা না করতে পারলে তাঁর মন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছিল না। শীঘ্রই তিনি অ্যালফ্রেড মঞ্চটি সম্বন্ধে একটি বন্দোবস্তে এলেন। এবং স্থির হয়, ১৯২৪ সালের দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় শিশির সম্প্রদায় ঐ দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক নিয়েই দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করবেন। কিন্তু সাধারণ্যে অভিনয় করতে গেলে নাটকের অভিনয়স্বত্ব ক্রয় করা প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র পুত্র দিলীপকুমারের কাছ থেকে সেই স্বত্ব ক্রয় করতে হবে। শিশিরকুমার খবর নিয়ে জানলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই দিলীপকুমার কলকাতায় আসছেন।

এদিকে আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ দেখলেন, তাঁরা এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে চলেছেন। কাজেই ছলে বলে কৌশলে তাঁরা সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরোধিতা করতে অগ্রসর হলেন। তাঁরা দিলীপকুমার পণ্ডিচেরী থেকে কোন্ বিশেষ ট্রেনে কলকাতা এসে পৌঁছুচ্ছেন, সে খবর পর্যন্ত সংগ্রহ করলেন। হাওড়া স্টেশনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সের হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মশাই এবং আরও কেউ কেউ।

দিলীপকুমার হরিদাসবাবুকে দেখে প্রথমটা বিস্মিত হলেন কিন্তু তাঁর অমায়িকতাকে তিনি সরল চিত্তে গ্রহণ করলেন। হরিদাসবাবু তাঁকে তাঁর গাড়ীতে তুলে সম্ভবতঃ তাঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ও তাঁর স্বর্গত পিতার বইয়ের প্রকাশক হিসেবে দু'পাঁচ কথা কইতে কইতে তাঁর থিয়েটারের জন্যে 'সীতা'র অভিনয় স্বত্বের কথাও পাকা ক'রে নিলেন। এর পরে হরিদাসবাবুর গাড়ী চেপেই দিলীপকুমার যখন তাঁর কলকাতার আস্তানা, থিয়েটার রোডে তাঁর মামা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে এসে পৌঁছুলেন, সেখানে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি দেখে অবাক হলেন যে, স্বয়ং শিশির-কুমার ভাদুড়ী নাকি তাঁরই আগমন প্রতীক্ষায় অধীর ভাবে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু যখন তিনি শিশিরকুমারের আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হলেন, তখন তিনি নিরুপায়। তিনি হতাশভাবে বললেন, পাখী হাতছাড়া হয়ে গেছে। এবং বুঝলেন, কি ধূর্ততার সঙ্গেই না হরিদাসবাবু শিশিরকুমারের মুখের গ্রাসটি ছিনিয়ে নিয়েছেন।

শিশিরকুমার তো পড়লেন অকুল পাথারে। তাহলে কি দোলের সন্ধ্যায় তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষে নাট্যরসিক দর্শকদের অভিবাদন করবার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে? তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন; বললেন—দোলের সন্ধ্যায় দোলের নাচ-গান দিয়েই তুমি দর্শকদের আপ্যায়িত করবে। হেমেন্দ্রকুমার কিছু গান বাঁধলেন এবং তাদের সঙ্গে কিছু পুরোনো গান ঠিক ঠিক ভাবে

পঃ চঃ—৪

যোগ দিয়ে নাচ-গানের ডালি সাজালেন—'বসন্তলীলা'। দলে ছিলেন অসামান্য সুরকার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, নৃত্যপরিকল্পনাকারী মণিলাল, নৃত্যকুশলী নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও তাঁর শিষ্যস্থানীয় নৃপেশ রায়, সুকণ্ঠ অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, সুকণ্ঠী প্রফুল্লবালা এবং আরও অনেকে।

জোর মহলা দিয়ে তৈরী হয়ে গেল 'বসন্তলীলা' গীতিনাট্য। এবং ১৯২৪ সালের দোলের সন্ধ্যায় আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চ থেকে তা' অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হ'ল রসিকজন সমক্ষে। শিশিরকুমার এর পরই মালিনী নামে একটি তরুণী অভিনেত্রীকে উদিপুরীর কঠিন ভূমিকাটি আয়ত্ত করিয়ে মধ্য সাপ্তাহিক আকর্ষণ স্বরূপ খুললেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'আলমগীর'। পাঠকদের অবগতির জন্যে এইখানে ব'লে রাখি, শিশিরকুমারের নাট্য প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—কারুর কারুর মতে অবিসংবাদীভাবে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে আলমগীরের ভূমিকাভিনয়।

তখনকার দিনে কলকাতা শহরের নতুন রাস্তা সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ (বর্তমানের চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ) বিডন স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত তৈরী হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। তার অগ্রগতি রোধ ক'রে সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে মনোমোহন পাণ্ডের স্বত্বাধিকারিত্বে 'মনোমোহন থিয়েটার'। গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষকে (দানীবাবুকে) সম্বল ক'রে তিনি একের পর এক নাটক চালিয়ে যাচ্ছেন—'বঙ্গে বর্গী', 'দেবলাদেবী', 'আলেকজাণ্ডার', 'ললিতাদিত্য' প্রভৃতি। কিন্তু ললিতাদিত্য দেখেই তিনি বুঝলেন, প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রমকারী দানীবাবুকে দিয়ে আর চলে না। অতএব—

কথাটা শিশিরকুমারের কানে এল। তিনি কালবিলম্ব না করে মনোমোহন পাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন এবং প্রথমে দু' বৎসরের চুক্তিতে থিয়েটারটি ভাড়া নিলেন ১৯২৪ সালের মে মাসের মাঝামাঝি—আসলে ১লা জ্যৈষ্ঠ থেকে। এই এগ্রিমেণ্টের জামিনদার হলেন নিমতিতার জমিদার মহেন্দ্র চৌধুরী। মনোমোহন থিয়েটারের সামনে দু'পাশে ফটক—একটি ফটক দিয়ে গাড়ী ঢুকবে এবং অপরটি দিয়ে বেরোবে। যে প্রাচীর ছিল, তার মাঝে গোটা চারেক স্তম্ভের ওপর ছিল পুরোনো যুগের ফ্যাশান মতো গ্যাসের পাইপকে ডান হাত দিয়ে তুলে ধরা পরী।

শিশিরকুমার থিয়েটারটির সংস্কারকার্যে মনোনিবেশ ক'রে প্রথমেই উৎপাটিত করলেন ঐ প্লাস্টার অব প্যারিসে নির্মিত পরীর দলকে। তার পরিবর্তে ঐ স্তম্ভগুলির ওপরে বসানো হ'ল পুরো সোনালী রঙ-করা বৃহদায়তন কলস, যা সহসা দেখলে স্বর্ণকলস ব'লে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। প্রেক্ষাগৃহের ভিতরের তিন দেওয়ালে ঠিক কোমর উঁচুতে আঁকা হল টানা প্রায় এক ফুট চওড়া স্থান জুড়ে মৃণালসহ পদ্মদল। টিকিট ছাপা হ'ল বাঙলায় পংক্তি এবং আসন সংখ্যা দিয়ে। এই ব্যাপারে শিল্পী চারু রায়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।

আর নাটক ? না, ওখানে আর্ট থিয়েটারের কাছে মাথা নত ক'রে হারমানা

চলবে না। ঐ 'সীতা'ই করতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের না হয়, অন্য কারুর। গোবরডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নাটক লেখার বাতিক ছিল। তিনি প্রায়ই তাঁর নাটকের পাণ্ডুলিপি বগলে ক'রে শিশিরকুমারের কাছে হাজির হতেন। শিশিরকুমার যোগেশচন্দ্রকে বললেন, সীতা নাটকের একটি খসড়া তৈরী করতে ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' অবলম্বনে। শিশিরকুমারেরই পরামর্শ অনুযায়ী নাটকের একটি ছক তৈরী হয়ে গেল—প্রজানুরঞ্জনের জন্যে সীতাকে বনবাসে দেওয়া থেকে শুরু ক'রে সীতার অযোধ্যায় ফিরে এসেও প্রজাদের সামনে নিজের শুচিতা সম্বন্ধে পুনরায় পরীক্ষা দেবার দাবিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত।

বিবেক ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব, সীতাগতপ্রাণ মানুষ রাম এবং প্রজানুরঞ্জক রাজা রামের বিরোধকে এমন সুচারু কৃতিত্বের সঙ্গে এই নাটকে ফুটিয়ে তোলা হ'ল যে, মন ব'লে উঠল, ভাগ্যে আর্ট থিয়েটার দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'কে হরণ করেছিলেন, তাই এমন একটি দর্শকচিত্ত-বিমোহন নাটক দেখতে পাওয়া গেল। বিশেষ এই নাটকের বিখ্যাত "লব-প্রাপ্তি" দৃশ্য হচ্ছে অনবদ্য নাট্য-পরিস্থিতি রচনার এক বিরল নিদর্শন।

শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে সসৈন্যে লক্ষ্মণ বেরিয়েছেন রাজ্য পরিক্রমায়। বাল্মিকীর তপোবনের কাছে আসতে সেই ঘোড়াকে আটক করল আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রেরই পুত্র লব। যুদ্ধে সসৈন্য লক্ষ্মণ লবের কাছে পরাস্ত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু লবের নিজের বিবেক তাকে দংশন করল। আদর্শ নরপতি রামচন্দ্রের যজ্ঞের জন্যে উৎসর্গীকৃত ঘোড়াকে আটক ক'রে সে ভালো কাজ করেনি। অবশ্য ঐ অশ্বের রক্ষার জন্যে নিযুক্ত সৈন্যদের ক্লীবত্ব তাকে আশ্চর্য ক'রে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে স্থির করল, সে নিজে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে জানাবে, তাঁর যজ্ঞের অশ্বকে রক্ষা করা সম্বন্ধে তাঁর ক্লীব সৈন্যবৃন্দের ব্যর্থতার কথা।

এ দিকে স্বয়ং রামচন্দ্র গুরু বশিষ্ঠের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যজ্ঞের জন্যে স্বর্ণ সীতা নির্মাণে ব্যস্ত। নির্মাণ করবেন তিনি স্বয়ং নিজ হাতে। তাই তিনি প্রিয়তমা সীতার ধ্যানে মগ্ন, গভীরভাবে মগ্ন। এমন সময় নিতান্ত অতর্কিতে তাঁর কর্ণে প্রবেশ করল এক উত্তেজিত কণ্ঠের আওয়াজ—"কোথা? কোথা রাজা রামচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ;"—এই সংলাপ বলতে বলতেই লব শূন্য রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে এবং তার সংলাপ শেষ হ'তে না হ'তেই ভিতর থেকে রামের উৎকণ্ঠিত উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"কার? কার কণ্ঠস্বর?"

তারপর রাম অন্তঃপুর থেকে নির্গত হয়ে লবকে দেখে স্তম্ভিত, মুগ্ধ। তিনি দেখেন, এই বালক তো আমারই সীতার প্রতিচ্ছবি—'সেই নীল নলিন নয়ন দুটি, সেই আঁখি তারকা করে ঝলমল—' কিন্তু না, নিরপরাধা সীতার প্রতি অবিচারকারী রামচন্দ্রকে লব ক্ষমা করতে পারে না ; সে রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা ক'রে উত্তেজিত এবং প্রায় ক্রন্দনরত অবস্থায় বেরিয়ে গেল রামচন্দ্রকে একান্তভাবে অভিভূত করে।—এই লব-প্রাপ্তির দৃশ্য যাঁরা শিশিরকুমার ও

জীবন গাঙ্গুলী দ্বারা মনোমোহন নাট্যমন্দিরে অভিনীত হ'তে দেখেছেন, তাঁরা ধন্য। যাঁরা এই অভিনয় দেখেননি, তাঁদের এই দৃশ্যের মহিমা বুঝিয়ে বলতে পারি, এমন ভাষা আমার জানা নেই।

যতদূর মনে পড়ে, ১৯২৪ সালের ৭ আগস্ট, ২২ শ্রাবণ, সুসংস্কৃত মনোমোহন নাট্যমন্দিরে যোগেশচন্দ্রের 'সীতা' সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। প্রথম সন্ধ্যায় শিশিরকুমারের অগণিত বন্ধুবান্ধব, অনুরাগীরা তাঁর যাত্রা শুভ হোক, এই কামনা ক'রে তাঁকে উপহারস্বরূপ ভেট দেন রাশি রাশি শ্বেত পদ্ম। আমরা 'অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার'-এর পক্ষে তাঁকে উপহার দিয়েছিলুম একশত শ্বেত পদ্ম। সেদিন যাঁরা প্রেক্ষাগারে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা দেখেছেন, মঞ্চের সম্মুখভাগে শ্বেতপদ্মের সে কি সমারোহ!

মনোমোহন নাট্যমন্দিরে এই 'সীতা'র অভিনয় দেখেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সে-যুগের প্রতিটি খ্যাতিমান পুরুষ। বলা বাহুল্য, অভিনয় দেখে অভিভূত হননি, এমন একটিও লোক ছিলেন না।

'সীতা'র আব একটি আকর্ষণীয় বিষয় ছিল, এর গানগুলি। হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত গানে সুর সংযোগ করেছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের কণ্ঠে "অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে" এবং "ধরার মেয়ে, ধরার মেয়ে, আয়গো ধরার মেয়ে" চিরকালের জন্যে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আর নাটকটির প্রারম্ভ ভাগে প্রফুল্লবালার কণ্ঠের সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত : "কথা কও, কথা কও" যেন সুরের ঝর্ণাধারা!

এই 'সীতা' অভিনয় প্রসঙ্গে দু'জন বিশিষ্ট দর্শক সম্পর্কে সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন ধরণের ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। প্রথম দর্শক হচ্ছেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শাস্ত্রীমশাইকে রীতিমত আমন্ত্রণ করে আনা হয় 'সীতা' দেখবার জন্যে। তাঁর বসবার জন্যে একটি বড় সোফার বন্দোবস্ত করা হয়, যা স্বাভাবিকভাবেই প্রথম সারির আসনেরও সামনে বসানো হয়। আগে থাকতেই কথা ছিল, অভিনয় শেষে শিশিরকুমার নিজে এসে শাস্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করবেন। প্রেক্ষাগৃহ খালি হয়ে গেলে শিশিরকুমার গায়ে একটি চাদর ঢাকা দিয়ে শাস্ত্রমশাইয়ের সামনে এসে তাঁর পদধূলি নিয়ে দাঁড়ালেন এবং জানতে চাইলেন, অভিনয় তাঁর কেমন লেগেছে।

শাস্ত্রীমশাইয়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর 'ভালোই' শিশিরকুমারের মনঃপূত হল না। তিনি সবিনয়ে বললেন, আরও কিছু উনি শুনতে চান তাঁর কাছ থেকে। শাস্ত্রীমশাই চোখ তুলে তাকালেন শিশিরকুমারের চোখের দিকে এবং বললেন, "যা বলব, তা সইতে পারবে?"

শিশিরকুমার স্মিত হাস্যে বললেন, "খোলাখুলি শুনব ব'লেই ত' আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি ; আপনার মন্তব্য থেকে শিখতে পারব।"

শাস্ত্রীমশাই তখন বললেন, "আবৃত্তি তোমার খুবই ভালো; তুমি সুকণ্ঠের অধিকারী। কিন্তু সংলাপ বলবার সময়ে তুমি বড্ড বেশী হাত নাড়ো, আঙুল নাড়ো; এটা না করলেই পার।"

শিশিরকুমার জবাবে বললেন, 'যদি অনুমতি করেন, তো বলি।'

"বলো, বলো।" বললেন শাস্ত্রীমশাই।

শিশিরকুমার তখন ধীর কণ্ঠে বললেন, "আমার দর্শকদের মধ্যে ক'জন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন? মাত্র একজন। এবং তিনি বসেছিলেন সকল দর্শকের পুরোভাগে। কিন্তু আমার যাঁরা দর্শক-লক্ষ্মী, তাঁরা ঐ পিছনে বসে থাকেন। আমার সংলাপ প্রচলিত গদ্যে নয়, প্রধানতঃ যাকে গৈরিশ ছন্দ বলা হয়, তাইতে। ঐ দর্শকসাধারণ এই ছন্দোময় সংলাপের বহু কথাই বুঝতে পারেন না; আমি তাই সংলাপ বলার সঙ্গে হাত বা আঙুল নেড়ে তাঁদের বুঝিয়ে দিতে চাই, কি কথা বলছি—যাকে প্যারাফ্রেজ (paraphrase) করা বলে, কতকটা তাই আর কি। বলুন, অন্যায় করি কি?"

শাস্ত্রীমশাই কান পেতে শুনলেন শিশিরকুমারের কথা। বোধ করি, এক মুহূর্ত থেমে বললেন, "শিশির, আমি অতটা ভেবে দেখিনি; আমি আমার কথা ফেরত নিচ্ছি। তুমি ঠিকই কর। যাঁরা পয়সা দিয়ে তোমার প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের কথা ভাবতে হবে বৈকি—নিশ্চয়ই ভাবতে হবে।" এরপরে শিশিরকুমার শাস্ত্রীমশাইকে তাঁর গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় বিশিষ্ট দর্শক হচ্ছেন রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন। না, শিশিরকুমারের নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি 'সীতা'র নাট্যাভিনয় দেখতে হাজির হননি। দীনেশচন্দ্রের বাড়ী ছিল বাগবাজারের বিশ্বকোষ লেনে; প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর ঠিক পাশের বাড়ীতেই তিনি থাকতেন। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে তিনি বেহালার ট্রাম ডিপোর কাছে একখানি নতুন গৃহ নির্মাণ করেন। এক রবিবার বিকেলবেলা ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও দু'জন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে একটি ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে তিনি তাঁর বাগবাজারের বাড়ী থেকে বেহালায় যাচ্ছিলেন। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ধ'রে বিডন স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছে তিনি ট্যাক্সিচালককে বিডন স্ট্রীট ধ'রে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের রাস্তা ধরতে বলেন। উত্তরে ট্যাক্সিচালক বলে, "এ-রাস্তায় ভীষণ জ্যাম (ভীড়) হবে।" কিন্তু দীনেশবাবুর জেদাজেদিতে সে শেষ পর্যন্ত ঐ বিডন স্ট্রীটের রাস্তা ধরেই অগ্রসর হয়।

ট্যাক্সিচালকের কথাই ঠিক। কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই সামনে দেখা যায় প্রচুর গাড়ী এবং তার মধ্যে ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়ীই বেশী। এক ইঞ্চি এগোবার পথ নেই। দীনেশচন্দ্র জানতে চাইলেন, সামনে কোনও বিয়ে বাড়ী আছে নাকি। ট্যাক্সিচালক সবিনয়ে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে না, স্যার—থিয়েটার, শিশিরভাদুড়ীর থিয়েটার।"

"বলে কি? শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটার দেখবার জন্যে এত ভীড় হয়?" বললেন দীনেশচন্দ্র এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বললেন, "চারু, আজ আর বেহালা

যাব না। চলো, সবাই মিলে শিশির ভাদ্ড়ীর থিয়েটার দেখি গে।"

চারুবাবু বলে উঠলেন, "কিন্তু টিকিট পাবেন কোথা? একেবারে ফুল-হাউস।" "চল তো আমার সঙ্গে—দেখি, টিকিট পাই কিনা", বলেই দীনেশচন্দ্র ট্যাক্সিচালককে তাঁর পাওনার অতিরিক্ত কিছু অর্থ দিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেন এবং পদব্রজে চারজন গিয়ে পেঁছুলেন মনোমোহন নাট্যমন্দিরের টিকিট ঘরের সামনে।

চারুবাবুর কথাই ঠিক; সামনেই ঝুলছে—"প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ" বোর্ড। দীনেশবাবু কিন্তু আদৌ পিছপাও নন। তিনি উৎসাহ ভরে টিকিট ঘরের সামনে গিয়ে বললেন, "আমাদের জন্যে চারখানা টিকিট দিতে পারেন?" টিকিট ঘরের ভিতর থেকে জানানো হ'ল যে টিকিট আর নেই, সব টিকিটই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। দীনেশচন্দ্র তখন একখানি একশো টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে বললেন, "আমাদের জন্যে চারটে বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করে দিন, আমরা তার জন্যে একশো টাকা দিতে প্রস্তুত।"

একশো টাকার পরিবর্তে তখনই চারখানি গদি-আঁটা চেয়ার প্রথম সারির সামনে স্থাপিত হ'ল। দীনেশচন্দ্র সপার্ষদ 'সীতা' অভিনয় দেখতে বসে গেলেন। অভিনয় করতে করতে আচম্বিতে শিশিরকুমার দেখলেন, সামনেই দীনেশচন্দ্র সেন বসে আছেন। 'সীতা'র প্রথম দৃশ্য অভিনীত হ'ত পুরো এক ঘণ্টা ধরে। প্রথম দৃশ্য শেষে শিশিরকুমার জানতে চাইলেন, দীনেশচন্দ্রকে কি নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল? যখন শুনলেন ওঁরা চারজন একশো টাকা টিকিট কেটেছেন, তখন শিশিরকুমার হতভম্ব। "তোমরা কেউ কি দীনেশচন্দ্র সেনকেও চেন না? যাও, ওঁর হাতে একশো টাকা এখনই ফেরত দিয়ে এস।"

লোক ছুটল টাকা ফেরত দিতে। কিন্তু দীনেশবাবু টাকা ফেরত নিতে একেবারেই নারাজ। তিনি বললেন, "শিশিরবাবুর এটা ব্যবসা; উনি তো দাতব্য প্রতিষ্ঠান খোলেন নি।" শিশিরকুমারকে ব্যাপারটা জানানো হল। তিনি বললেন, "অভিনয় শেষে যেন ওঁদের আটকানো হয়।" কথামতোই কাজ হল। শিশিরকুমার গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে দীনেশচন্দ্রের সামনে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, "অনেক আগেই আপনার কাছে নিমন্ত্রণ পেঁছানো উচিত ছিল; আপনি টাকাটি ফেরত না নিলে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।" দীনেশচন্দ্রও নেবেন না, শিশিরকুমারও নাছোড়বান্দা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত শিশিরকুমারেরই জয় হল।

'সীতা' অভিনয়ে প্রথম দেখা গেল, প্রয়োগনৈপুণ্য কাকে বলে। সমগ্র অভিনয়টির ভিতর দিয়ে এমন একটি সুষম ছন্দ প্রবাহিত হয়েছে, যা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। স্পষ্ট বোঝা যায়, মাত্র একটি মস্তিষ্কই এখানে কাজ করেছে—নাটকটির রচনা থেকে শুরু করে তার সম্পূর্ণ রূপারোপ পর্যন্ত। বাঙলা থিয়েটারে আগে ছিল অভিনয়-শিক্ষক বা মোশান মাস্টারের আধিপত্য। এই প্রথম সৃষ্টি হল একটি পদবী—প্রয়োগকর্তা বা প্রযোজক।

'সীতা'য় ছোট বড়, প্রতিটি ভূমিকাই যে সুঅভিনীত হয়েছিল, এ-কথা

না বললেও চলে। তবে বিশেষ করে নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিকায় শিশির-কুমারের অভিনয় ছাড়া আরও দু'টি অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টির কথা না বললে অন্যায় হবে। প্রথম 'সীতা'র ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভার জীবন্ত চরিত্রচিত্রণের কথা। কী অপরূপ যে তাঁর কণ্ঠস্বর, তা বলে বোঝানো যায় না। তাঁকে মধুকণ্ঠী বললেও মনে হয়, সবটুকু প্রকাশ করে বলা হল না। আর দুই হচ্ছে, মহর্ষি বাল্মিকীর চরিত্রে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিনয়ের কথা। এই ভূমিকায় তিনি এমন প্রাণস্পর্শী অভিনয় করতেন যে, উত্তরকালে তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল মহর্ষি।

মনোমোহন নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার 'সীতা'র পরে অভিনয় করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী'। মহর্ষি গোতমের পত্নী অহল্যা জেনেশুনেও গোতমের ছদ্মবেশী ইন্দ্রের প্রতি আসক্ত হওয়ায় মুনির শাপে প্রস্তরীভূত হওয়া এবং পরে রামের করুণায় মুক্তি পাওয়ার বৃত্তান্তকে অবলম্বন করে নাটকখানি রচিত। সুঅভিনীত হলেও নাটকখানি জনসমাদর লাভে বঞ্চিত হয়। মাত্র মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অভিনীত 'চিরঞ্জীব'-এর হাস্যরসাত্মক ভূমিকাটি দর্শকেরা প্রাণ ভরে উপভোগ করেছিলেন।

এরপরে শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'জনা' নাটকটিকে নবভাবে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করেন ১৯২৫ সালের ৩রা জুন। এর দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পনার ভার নেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের পুত্র অনাথ-নাথ মৈত্র। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে শিশিরকুমার তখন ভুবনেশ্বরে বসবাসকারিণী. নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরীকে নিয়ে আসেন। কিন্তু 'জনা' অভিনয়ে যে ভূমিকাটি প্রতিটি দর্শককে সম্মোহিত করেছিল, সেটি হচ্ছে নায়িকার ভূমিকা। এই ভূমিকায় নৃত্যগীতকুশলা চারুশীলার আশ্চর্য সাজ-সজ্জা এবং ততোধিক আশ্চর্য ভঙ্গীসহ বাচন ও পদচারণা দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। নায়িকার ভূমিকায় শিশিরকুমারের শিক্ষাদান সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার কথা স্বয়ং চারুশীলার মুখ থেকে আমি হঠাৎই শুনে ফেলেছি।

মনোমোহন থিয়েটারের ভিতর দিকে, বলতে পারা যায়, স্টেজের ডান পাশে কিছুটা জায়গা ছেড়ে একটি ত্রিতল বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীটি ঐ থিয়েটারের নানাবিধ কাজে লাগত ব'লে থিয়েটারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি প্রায়ই ঐ বাড়ীর দোতলার একটি ঘরে যেতুম মনোমোহন নাট্যমন্দিরের অতি সম্মানিত অভিনেতা ললিতমোহন লাহিড়ীর সঙ্গে কথাবার্তা কইবার জন্যে।

লাহিড়ীমশাই ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি এবং ভীষণ সাত্ত্বিক প্রকৃতির। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনে "ফুড ইনস্পেক্টার" কিংবা ঐ জাতীয় কোনও কাজ করতেন। 'সীতা'র বশিষ্ঠের ভূমিকাটিতে তাঁর অভিনয় হত অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ। একদিন বেলা এগারোটা নাগাদ তাঁর সঙ্গে দেখা করবার পরে নীচে নামছি, এমন সময় দেখি, সিঁড়ির ডানদিকে নীচের তলার বন্ধ দরজাটি হঠাৎ খুলে গেল এবং ঐ ঘর থেকে যেন প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এলেন কিছুটা

আলুথালুবেশে শ্রীমতী চারুশীলা।

স্টেজ আর ঐ বাড়ীর মাঝখানের খোলা জায়গাটিতে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীমতী প্রভা সমেত ঐ থিয়েটারেরই জন কয়েক অভিনেত্রী। এঁরা সঙ্গে সঙ্গেই চারুশীলাকে ঘিরে ধরলেন। কিছুটা মুক্তবায়ু সেবন করে ধাতস্থ হবার পরে চারুশীলা এঁদের যা বললেন, তার সারমর্ম হল : গেল ৭২ ঘণ্টা ধরে তিনি ঐ ঘরে শিশিরকুমারের কাছ থেকে 'জনা'র নায়িকা ভূমিকার পাঠ নিয়েছেন। তিনি নারী এবং নৃত্যগীতপটিয়সী ; তিনি যথেষ্টই ছলাকলা জানেন বলে তাঁর গর্ব ছিল। কিন্তু প্রবীরের মতো বীরের পতন ঘটাবার জন্যে নারীকে কতখানি ছলনাময়ী হ'তে হয়, তা' তিনি শিখলেন একজন পুরুষমানুষের কাছ থেকে। তাঁর খুবই লজ্জা করছে স্বীকার করতে যে, পুরুষ শিশিরকুমার ছলাকলার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, নারী ও বারবণিতা হওয়া সত্ত্বেও তা' তাঁর জানা ছিল না। বলা বাহুল্য, আমি ওঁদের অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েই কথাগুলি শুনেছিলুম।

এর পরে শিশিরকুমার মনোমোহন নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ করেন 'হাঞ্চব্যাক অব নোটরদম' অবলম্বনে ব্যারিস্টার শ্রীশ বসু রচিত 'পুণ্ডরীক' নাটক। একজন সাধারণ নর্তকীর প্রতি মন্দিরের পুরোহিতের মোহ নাটকটির বিষয়বস্তু। দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার দিকে শিশিরকুমার বিশেষ নজর দিয়েছিলেন এর প্রযোজনায়। রুস্তানা ইরানীর ভূমিকায় চারুশীলা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে দর্শক সাধারণের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ন্যুব্জদেহ কাশীমদের ভূমিকায় গোপালদাস ভট্টাচার্য সকলের যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তেমনই আশ্চর্য নাট্যদক্ষতার পরিচয় দেন সাকী পাগলীবেশে তারাসুন্দরী। তবুও মনে হয়, নাটকটির বিষয়বস্তু তেমন হৃদ্য নয় ব'লে পুণ্ডরীকের ভূমিকায় স্বয়ং শিশিরকুমারের আশ্চর্য অভিব্যক্তিপূর্ণ অভিনয় সত্ত্বেও নাটকটি শেষ পর্যন্ত তেমন আর্থিক সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

এদিকে ১৯২৭ সালে স্কটিশ চার্চেস কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করবার পরে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ইণ্ডিয়ান ভার্ণাকুলাস" বিভাগে ভর্তি হই বাঙলাকে প্রধান ভাষা হিসেবে নিয়ে এবং সহযোগী ভাষা (subsidiary) ওড়িয়াকে নিয়ে। এর সঙ্গে পালি ও প্রাকৃত পড়া আবশ্যিক ছিল। আমাদের বিভাগের কর্তা ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। এ-ছাড়া ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র (পালি শিক্ষক), মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাকৃত শিক্ষক), প্রিয়রঞ্জন সেন (বাঙলায় পাশ্চাত্যপ্রভাব বিষয়ক শিক্ষক), বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বিনায়ক মিশ্র (ওড়িয়াশিক্ষক) এবং আরও দু'একজন। আমার সহপাঠী ছিলেন কবি অজয়কুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বিভাস রায়চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এনামুল হক প্রমুখ। আমাদের সঙ্গে যে একমাত্র ছাত্রী ছিলেন, তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক হেম রায়চৌধুরীর কন্যা স্নেহলতা রায়চৌধুরী।

এই এম-এ ক্লাশে পড়তে ঢুকেই আমি একটি কাজ ক'রে বসি। একদিন আমাদের 'চিত্রাসংসদে'র বন্ধু বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য হঠাৎ একটি আলমারী থেকে 'প্যাগেসাস' ম্যাগাজিনটি বার করে কোনও একটি পাতায় মনঃসংযোগ করে। ও কি পড়ছে জানতে চাইলে ও আমার হাতে ম্যাগাজিনটি দেয়। আমি দেখি, ও 'অস্কার ওয়াইল্ড'-এর লেখা 'অ্যাক্ট্রেস' গল্পটি পড়ছিল। জিজ্ঞেস ক'রে জানলুম, ও ঐ গল্পটির একটি বাঙলা অনুবাদ করবে 'নাচঘর' পত্রিকায় ছাপাবার জন্যে। আমি হঠাৎ ব'লে বসলুম, আমি গল্পটির অনুবাদ করব। বৈদ্যনাথ বললে, "তুমি যদি সত্যিই অনুবাদ কর, আমি খুশীই হব। কিন্তু যদি না কর, তাহলে হেমেনবাবুর (নাচঘর-সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায়) কাছে আমাকে বেইজ্জত হতে হবে।"

আমি বললুম, "হ্যাঁ আমি করব এবং কাল সকালেই তুমি পাবে।"

পরদিন সকালে বৈদ্যনাথ যখন এল, তখন আমি ম্যাগাজিনটি ফেরত দিয়ে বললুম, "হয়নি, ভাই।"

"জানতুম, তোর দ্বারা হবে না", বলতে বলতে ঐ পত্রিকার পাতা উল্টে বৈদ্যনাথ সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল আমার লেখা তার মধ্যে রয়েছে। সে একেবারে উল্লসিত হয়ে লাফিয়ে উঠল এবং বলল, "আমি এখনই চলছি হেমেনবাবুর কাছে।" আমি 'অ্যাক্ট্রেস' গল্পের বাঙলা নাম দিয়েছিলুম 'অভিনেত্রীর ছিন্নবীণা'।

দিন দু'তিন পরে এক রবিবার সকালে বৈদ্যনাথ আবার আমার বাড়ীতে এল এবং কোনও রকম ভণিতা না করে বলল, জামাটা পরে আমার সঙ্গে আয় তো, একটু ঘুরে আসবি। আমি বৈদ্যনাথকে জানতুম—সে যা ধরবে, তা করবেই—একেবারে যাকে বলে নাছোড়বান্দা। কাজেই দ্বিরুক্তি না করে আমি তার সঙ্গে বেরোলুম। সে আমাকে একেবারে নিয়ে গিয়ে তুলল হেমেন্দ্র-কুমারের সামনে। "এই নিন, ধরে এনেছি", বলে বৈদ্যনাথ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আমি তো লজ্জায় অধোবদন। হেমেন্দ্রকুমার আমাকে দেখে বললেন, "আরে, একে তো আমি চিনি ; কতদিন নরেন, প্রেমাঙ্কুর, গিরিজা প্রভৃতির সঙ্গে ঘুরতে দেখেছি।" এর পরে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "দ্যাখো, নাচঘর-এর জন্যে প্রতি হপ্তায় তোমার কাছ থেকে একটি লেখা চাই। কোনও রকম ওজর আপত্তি শুনব না।"

'অভিনেত্রীর ছিন্নবীণা'ই আমার প্রথম লেখা (অনুবাদ), যা 'নাচঘর'-এ প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে, বাঙলা শ্রাবণের কোনও এক তারিখে। এর পরে হপ্তা দুয়েক বাদে 'নাচঘর'-এ আমার লেখা বেরোতে শুরু করে প্রতি হপ্তায়—হ্যাঁ হপ্তার পর হপ্তা। তখন 'নাচঘর' পত্রিকার মালিক ছিলেন রংপুরের টেপার জমিদার নলিনীমোহন রায়চৌধুরী। তাঁর একখানি বইয়ের দোকান ছিল কলেজ স্কোয়ারে। এই দোকান চালাতেন অতুলচন্দ্র দত্ত নামে এক ভদ্রলোক।

'নাচঘর'-এ কিছুদিন ধরে নিয়মিত ভাবে আমার লেখা বেরোবার পরে

হঠাৎ একদিন দেখি, 'সম্পাদক—হেমেন্দ্রকুমার রায়' ছাপার অক্ষরে এই লেখাটির ঠিক নীচেই আর একটি লাইন ছাপা হয়েছে—'সহ-সম্পাদক—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়'। বোধ করি, কাগজটির সঙ্গে আমাকে আরও বেশী করে বাঁধবার জন্যেই হেমেন্দ্রকুমার এই কাজটি করেছিলেন। সাপ্তাহিক 'নাচঘর' কাগজের দাম ছিল দু'পয়সা কিংবা এক আনা। হলে হবে কি, কাগজটির জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। শুক্রবার, বেলা ১১টা / ১২টা নাগাদ কাগজটি হকারদের কাছে পেঁছোবার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যেত। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল, এই কাগজের পাঠকরা ছিলেন সবাই শিক্ষিত; এমন কি বহু উচ্চশিক্ষিতও নিয়মিতভাবে এই কাগজটি পাঠ করতেন। এটি বিশেষ ক'রে জানতে পারলুম সেই দিন, যে দিন আমার ক্লাশে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন—"যে কাজটি (home task) করতে দিয়েছিলুম, সেটি করা হয়েছে কি? অবশ্য না হওয়া বিচিত্র নয়। কারণ, 'নাচঘর'-এর লেখা তো আগে—সেটি ঢের বেশী জরুরী।"

শুধু লেখা তো নয়, এমন কি প্রুফ দেখার কাজও আমার ঘাড়ে। সুকিয়া (বর্তমানে কৈলাশ বসু) স্ট্রীটের 'কার্তিক প্রেস'-এ নাচঘর ছাপা হ'ত। কমলকৃষ্ণ দালাল ছিলেন এই প্রেসের মালিক। এই প্রেসটি সম্বন্ধে বড়ো কথা এই যে, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রমুখ সে যুগের বহু নামকরা সাহিত্যিকের উপন্যাসাদি এই প্রেসে ছাপা হ'ত। প্রতি বৃহস্পতিবার যতটা সকাল সকাল সম্ভব, আমাকে এই প্রেসে গিয়ে বসতে হ'ত এবং গেলি-প্রুফ থেকে শুরু ক'রে ফাইনাল মেক্-আপ প্রুফ পর্যন্ত সমস্ত দেখে প্রিন্ট-অর্ডার দেবার পরে আমি ছুটি পেতুম।

বলা বাহুল্য, 'নাচঘর'-এর কৃপায় আমার সঙ্গে ক্রমেই বেশী লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'তে থাকল—বহু অভিনেতা, অভিনেত্রী, নাট্যকার, চিত্র-পরিচালক। মনে আছে, একদিন আমি সেযুগে ৪০, দমদম রোডস্থ 'ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কর্পোরেশন' স্টুডিওটি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলুম। প্রতিষ্ঠানটির সর্বাধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—তখনও তিনি ডি. জি. নামে পরিচিত হননি—আমাকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সমস্ত স্টুডিওটি ঘুরে ঘুরে দেখালেন। অবশ্য দেখাবার বিশেষ কিছু ছিল না গোটা দু'তিন ডেব্রি এবং আর্টেল ক্যামেরা ছাড়া। তখনও পর্যন্ত ছিল নির্বাক যুগ, কৃত্রিম ইলেক্ট্রিক আলোর ব্যবহার তখনও পর্যন্ত শুরু হয়নি। সূর্যের আলোককে রিফ্লেক্টারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করে ছবি তোলা হ'ত। তবে যেখানেই কাঁচা ফিল্মের ব্যবহার সেখানেই একটি রসায়নাগার বা ল্যাবোরেটারী থাকবেই থাকবে। এখানে এক্সপোজ্‌ড্ ফিল্ম ডেভেলপ্‌ড্ হবে এবং পজিটিভ ফিল্ম সম্পাদিত বা এডিটেড ফিল্ম অনুযায়ী প্রিণ্টেড এবং ফিক্স্‌ড্ হবে।

এ বিভাগটিও আমাকে বিশেষভাবে দেখানো হ'ল। তারপর আমার সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিলেন ধীরেনবাবু দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া (বলা হ'ল উনি ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার-ডিরেক্টার), কৃষ্ণগোপাল (বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান), সবিতা দেবী (আসল নাম আইরিশ গ্যাসপার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের তখনকার কিউরেটারের কন্যা) এবং আরও কারো কারো সঙ্গে। আরও দেখলুম, স্টুডিওর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের একাংশে নির্মিত সেট—কৃত্রিম ঘরবাড়ী। তখন ওখানে শ্যুটিং চলছিল 'ফ্লেমস্ অব ফ্লেশ' বা 'কামনার আগুন' ছবির। এতে নায়ক আলাউদ্দীন খিলজির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন 'কল্লোল' সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ, নায়িকা পদ্মিনীর ভূমিকায় ছিলেন সবিতা দেবী, উপ-নায়ক দেশভক্ত দেববর্মণের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দেবকীকুমার বসু এবং উপ-নায়িকা দেববর্মণের অনুরাগিণীর চরিত্র-চিত্রণ করেছিলেন ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী রমলা দেবী (প্রেমলতিকা)। ছবিখানি ধর্মতলা স্ট্রীটের (বর্তমানে লেনিন সরণী) 'রূবি' সিনেমায় (যার বর্তমান নাম জ্যোতি সিনেমা) দেখানো হয়েছিল। ছবিখানি সম্পর্কে সেই সময়ে কোনও একটি কাগজে মন্তব্য বেরিয়েছিল—"ছবিটিতে যত না আগুন, তার চেয়ে বেশী ধোঁয়া।"

চোখের সামনে 'চিত্রা' (বর্তমানে 'মিত্রা') সিনেমাকে তৈরী হ'তে দেখলুম। আর্য ফিল্মসের 'বুকের বোঝা' এই সময় নির্মিত হয়। হরেন্দ্রলাল ঘোষ (বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও) ছিলেন এই ছবির প্রযোজক। নীতীন বসু ছিলেন এই ছবির ডিরেক্টার-ক্যামেরাম্যান। ছবির নায়িকা বীণার ছবি বিশেষ যত্নের সঙ্গে ভালো কাগজে 'সিপিয়া' রঙে ছাপিয়ে 'নাচঘর'-এর সামনের পাতায় এমন সূক্ষ্মভাবে এঁটে দেওয়া হয় যে, কেউ ইচ্ছে করলেই ছবিটিকে খুলে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে পারবেন।

এই ব্যাপার নিয়েই আমি প্রথম হরেন ঘোষের সান্নিধ্যে আসি। তখনও সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের গতিরোধ ক'রে রয়েছে 'মনোমোহন থিয়েটার' এবং সেখানে সগৌরবে অভিনীত হচ্ছে শচীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত 'গৈরিক পতাকা'। আর্ট থিয়েটার্সের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী প্রবোধচন্দ্র গুহ এই নাটকটির ব্যাপারে একটি বড়ো রকমের চালাকি খেলেছিলেন। পুলিশ মহলে তাঁর প্রচুর জানা-শুনা ছিল। তারই জোরে তিনি কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পরে পুলিশের ইস্তাহার বার করিয়ে নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ করিয়ে দেন। বেশ কয়েক হপ্তা বন্ধ রাখবার পরে বড়ো বড়ো পোস্টার মারফত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, "বহু আবেদন নিবেদনের ফলে রাজরোষমুক্ত 'গৈরিক পতাকা'র অভিনয়ের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছে।"

এর পরে যখন নাটকটির আবার অভিনয় শুরু হ'ল, তখন তা দেখতে যাকে বলে বাদুড়-ঝোলা ভীড়।

এক রবিবার বিকেলে বিডন স্ট্রীটে 'মনোমোহন থিয়েটার'-এর বিপরীত ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ঐ বাদুড়-ঝোলা ভীড় দেখছিলুম এবং মনে মনে প্রবোধ-বাবুর কৌশলী বুদ্ধির তারিফ করছিলুম। হঠাৎ পিছন থেকে আমার পিঠে

একটি হাত পড়ল ; ফিরে তাকিয়ে দেখি হরেন ঘোষ। প্রীতি বিনিময় করছি তাঁর সঙ্গে, কিন্তু আমার নজর চ'লে যাচ্ছে তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি চেহারার দিকে। ভদ্রলোকের মাথার চুল পিছন দিকে ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে ; চওড়া বুক, কোমর সরু, চোখে দীপ্তি। পরণে খদ্দরের কাপড় মালকোঁচা দিয়ে পরা, গায়েও খদ্দরের পাঞ্জাবি, পায়ে কোলাপুরী স্যাণ্ডাল।

আমি যে ভদ্রলোককে নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করছি, হরেন ঘোষের তা চোখ এড়াল না। তিনি যেন অনেকটা খুশী খুশী ভাব নিয়েই বললেন, এই ভদ্রলোক সবে ইংলণ্ড থেকে এসেছেন। কিন্তু বোম্বাই শহরেই তিনি দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হন এবং সম্পূর্ণ ভোল পাল্টে এই পোশাক পরেছেন। এঁর নাম হচ্ছে উদয়শঙ্কর, খুব ভালো নাচতে পারেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, নাচবার উপযোগী চেহারাই বটে।

এর কয়েক দিন পরেই হরেন ঘোষের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলুম, এলিট সিনেমার বিপরীতে সমবায় ম্যানসনে 'অ্যাকাদেমী অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস' হলে উদয়শঙ্কর একটি 'ড্যান্স রিসাইট্যাল' (নাচের নমুনা) দেবেন। শুনলুম, হরেন ঘোষ যখন এই হলটি ব্যবহারের জন্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমতি চাইতে যান, তখন তিনি নাকি স্মিতহাস্যে বলেছিলেন, "বলো কি হরেন, পুরুষ মানুষ আবার নাচবে কি ? আমি তো জানি, মেয়েরাই নাচে, আর পুরুষ মানুষকে নাচায়।" কিন্তু যেদিন সন্ধ্যায় রসিকজন সমক্ষে উদয়শঙ্কর তাঁর নৃত্যকুশলতার পরিচয় দিলেন, সেদিন আসরে উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। আমাদের মনে হয়েছিল, অজন্তা আর্ট যেন মূর্ত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

এ-কথা বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না যে, শ্রীশঙ্করের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় তো হয়েই ছিল, এমন কি সেই পরিচয় একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে পরিণত হয়ে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

শ্রীশঙ্কর আসলে বাঙালী এবং তাঁর উপাধি চৌধুরী হ'লেও তিনি আদৌ বাঙলা লিখতে পারতেন না। আমি তাঁকে বাঙলায় নাম সই করতে শেখাই এবং 'নাচঘর'-এর এক পূজা সংখ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধও প্রকাশ করি। জন্ম থেকেই তাঁর বাঙলা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। তাঁর বাবা ছিলেন ঝালওয়ারের মহারাজের দেওয়ান এবং তিনি অঙ্কন শিক্ষা ব্যাপারে রথেনস্টিনের ছাত্ররূপে ইংলণ্ডে বহুকাল কাটান। নাচের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন ইংলণ্ডে থাকবার সময়েই এবং পরে ফ্রান্সে অ্যানা পাভলোভার নৃত্যসঙ্গী হন। কিন্তু ১৯২৮ সালে পাভলোভা যখন দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন, তখন তাঁর অনুরোধ সত্ত্বেও উদয়শঙ্কর ভারতে আসেন নি। তিনি যখন ফ্রান্সে থাকেন, তখন সিমকীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং যখন শ্রীশঙ্কর তাঁর দল গঠন করেন, তখন তিনি সিমকীকে ভারতে আনিয়ে নেন।

অবশ্য নিউ এম্পায়ারে প্রথম যখন হরেন ঘোষের ব্যবস্থাপনায় উদয়শঙ্কর

দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করেছিলেন, তখন তিনি একাই নেচেছিলেন; অবশ্য একটি দর্শকগ্রাহ্য প্রোগ্রাম করবার জন্যে সঙ্গে ছিল আলি-ভগ্নীদ্বয়ের নাচ, কর্ণেল এ. সি চ্যাটার্জির দুই কন্যা ঊষা ও প্রিয়ার (আসল নাম—অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা) নাচ, পবনের ঢোল, কৃষ্ণচন্দ্র দের গান, তিমিরবরণের সরোদ ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে যখন তিনি সম্পূর্ণ দল গঠন করেন, তখন তাঁর নৃত্যে সুর যোজনা করবার ভার পান তিমিরবরণ ও তাঁর সহ-শিল্পীবৃন্দ, যার মধ্যে ছিলেন বিষ্ণুদাস শিরালী।

উদয়শঙ্কর নৃত্য-সম্প্রদায় কলকাতার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চ থেকে তাঁদের জয়যাত্রা শুরু ক'রে দিল্লী, লক্ষ্নৌ, এলাহাবাদ, কাশী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, আমেদাবাদ প্রভৃতি সারা ভারতের বড়ো বড়ো নগরী প্রদক্ষিণ করবার পরে সাগরপারে পাড়ি দেন এবং প্রথমে ইংলণ্ড ও পরে আমেরিকা জয় ক'রে আবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯২৯ সালে আমার এম. এ. পরীক্ষা দেবার কথা। সেই অনুযায়ী আমি পরীক্ষার ফি (৮০ টাকা)-ও জমা দিয়েছিলুম। কিন্তু নানা ব্যাপারে আমি তখন এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলুম—যাকে অক্টোপাশের বন্ধন বললেও অত্যুক্তি হবে না। পরীক্ষার তারিখ যখন সত্যিই এগিয়ে এল, তখন মনে হ'ল, আমি আদৌ প্রস্তুত নই। কাজেই শেষ পর্যন্ত আমি ঐ ১৯২৯-এর পরীক্ষা দিতে হাজির হলুম না।

এক বৎসর বাদে, ১৯৩০ সালে কিন্তু আমি আবার ফি জমা দিয়ে যথারীতি পরীক্ষা দিই এবং তাতে সেকেণ্ড ক্লাশে ফার্স্ট হয়ে উত্তীর্ণ হই। খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি, যদি প্রথম দিন পরীক্ষা দিতে দিতে আমার জ্বর না আসত এবং তারই জন্যে লেখবার টেবিলে মাথা রেখে প্রায় দেড়-দু'ঘণ্টা কাল ধ'রে আচ্ছন্নের মতো প'ড়ে না থাকতুম, তাহ'লে ঐ পরীক্ষায় আমি অব্যর্থভাবে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারতুম। আবার এ-কথাও ঠিক যে, সেবারে ভাগ্যক্রমে প্রথম দিনের পরে যদি পরপর অন্তত তিন দিন ছুটি না থাকত, তা'হলে হয়ত অসুস্থতার জন্যে আমার পরীক্ষা দেওয়াই হ'ত না।

কিন্তু নিজের কথা থাক। থিয়েটারের কথায় ফিরে আসি। আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেডের অধীন স্টার থিয়েটার 'কর্ণার্জুন', 'ইরাণের রাণী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' মঞ্চস্থ করবার পরেই কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। অপরেশচন্দ্রের 'বন্দিনী', 'শ্রীকৃষ্ণ' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় অন্তত আর্থিক দিক দিয়ে আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত না হওয়ায় দলের প্রতিটি লোকই কেমন যেন ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েন। ঠিক এই সময়ে, কি জানি কি কারণে, আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড 'মনোমোহন থিয়েটার'টি ভাড়া নেন এবং এক সঙ্গে দু'টি থিয়েটার চালাতে থাকেন। দেখা যায়, মনোমোহন-এর ভার সম্পূর্ণভাবে প্রবোধচন্দ্র গুহের ওপর ন্যস্ত। এই 'মনোমোহন'-এই মন্মথ

রায় কৃত 'মহুয়া' নাটকের 'নাচঘর'-এ প্রকাশিত আমার সমালোচনাকে উপলক্ষ্য ক'রেই নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে ওঠে।

'মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ' ত্যাগ করবার পরে ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি শিশিরকুমার তাঁর দল নিয়ে কর্ণওয়ালিস রঙ্গমঞ্চে (বর্তমানে শ্রীসিনেমা) তাঁর আসর পাতেন। তিনি প্রথমেই মঞ্চস্থ করেন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক ২৬ জুন তারিখে। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে মঞ্চস্থ করেন 'তপতী'। এই নাট্যাভিনয় দেখে 'নাচঘর'-এ আমি মন্তব্য করি, "বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ অন্তত ৫০ বচ্ছরের মধ্যে এ-রকম উচ্চ মানের অভিনয় করতে পারবে না কিংবা প্রয়োগনৈপুণ্য দেখাতে পারবে না।"

এই মন্তব্য, বোধ করি, শিশিরকুমারের অভিমানকে আহত করে এবং তিনি কালবিলম্ব না ক'রে কবির কাছ থেকে 'তপতী'র অভিনয়স্বত্ব কিনে নিয়ে তাঁর নাট্যমন্দিরে (কর্ণওয়ালিসে তাঁর থিয়েটারের তিনি এই নামকরণই করেছিলেন) তার অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে কাশ্মীরের দৃশ্যে শিল্পী জাহর আপেল গাছ, আখরোট গাছ প্রভৃতি এঁকেছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত! শিশিরকুমারের অভিনয়প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'র সামগ্রিক মাধুর্যের নাগাল পায়নি।

শিশিরকুমার সম্বন্ধে একটি অপবাদ আর্ট থিয়েটার্স তাঁদের নিজস্ব সাপ্তাহিক পত্রিকা, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র সম্পাদিত 'বৈকালী'তে খুব ফলাও ক'রে প্রকাশ করতেন। সেটি হ'চ্ছে, শিশিরকুমার নাকি গার্হস্থ্য বা সামাজিক নাটক মঞ্চস্থ করতে ভয় পান। কারণ, তাহলেই নাকি তাঁর কেরামতি ধরা প'ড়ে যাবে। শিশিরকুমার বোধ করি, মনে মনে হাসতেন। ১৯২৭ সালের জুন মাসে তিনি এই অন্যায় রটনার উচিত জবাব দিলেন।

আমি তখন বি, এ, পরীক্ষা দেবার পরে দেওঘরে 'আরোগ্য আলয়ে' ছুটি উপভোগ করছি যতদিন না ফল বেরোচ্ছে, ততদিনের জন্যে। এমন সময়ে নিতান্ত আশাতীতভাবে আমার কাছে গিয়ে পেঁছুল খামে-ভরা এক হ্যাণ্ডবিল, যাতে বড়ো বড়ো ক'রে লেখা আছেঃ নব কলেবরে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'; যোগেশের ভূমিকায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে প্রেরক বন্ধু মুরারিমোহন শীলকে লিখলুম, "উদ্বোধন রজনীর জন্যে দু'টি ৫ টাকার টিকিট কিনে রাখ; আমি যথাসময়ে পেঁছুব।" কথামতই কাজ হ'ল। এবং আমরা দুই বন্ধু যথাসময়ে ৫ টাকার দু'টি পাশাপাশি আসন অধিকার করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

নির্দিষ্ট যবনিকা অপসারিত হতেই দেখা গেল, ঘরের দেওয়ালে গিরিশ-চন্দ্রের একটি সুবৃহৎ তৈলচিত্র টাঙানো রয়েছে। নাটকের নায়ক হচ্ছেন যোগেশচন্দ্র ঘোষ। কাজেই যোগেশচন্দ্রের পিতা হিসেবে গিরিশচন্দ্রকে হাজির করাকে খুবই ন্যায়সঙ্গত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলে স্বীকার করতেই হবে।

কারণ, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সত্যিই যোগেশ চরিত্রের সৃষ্টিকর্তা বা জনক। গিরিশচন্দ্রের তৈলচিত্রকে ব্যবহার ক'রে শিশিরকুমার দর্শকদের কাছে এক বাজী জিতলেন।

তাঁর দ্বিতীয় বাজী জেতা হল, যখন বৃন্দাবন গমনোদ্যত শাশুড়ী উমাসুন্দরীর হাত থেকে লক্ষ্মীর কৌটো নিতে গিয়ে বড়বৌ জ্ঞানদার হাত থেকে সেই কৌটো অসাবধানে নীচে প'ড়ে গেল।

এমন আশ্চর্যভাবে ও সুকৌশলে আসন্ন অশুভের ইঙ্গিত এই 'প্রফুল্ল' নাট্যাভিনয়ে আগে কখনও দেওয়া হয়নি। তাই জনসাধারণের মধ্যে স্বতঃস্ফুরিত গুঞ্জন উঠল—সাবাস, শিশিরকুমার।

যোগেশের ভূমিকায় গিরিশতনয় দানীবাবু অভিনয় করতেন কড়া ইস্ত্রি করা কফওয়ালা লংক্লথের সার্ট পরে। যতক্ষণ না তিনি নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে মাতাল এবং অর্ধোন্মাদ হয়ে একেবারে খালি গা হয়ে পড়তেন। শিশিরকুমার পরলেন সাদা লংক্লথেরই চাইনীজ কোট এবং শেষের দিকে কয়েকটি দৃশ্যে তিনি গায়ের কাপড়ে আবৃত হয়ে মঞ্চাবতরণ করতেন—কখনও খালি গায়ে দেখা দেননি। সেই বিখ্যাত কালীঘাটের দৃশ্যে একটি পথিকের পিছনে 'একটা পয়সা' 'একটা পয়সা' ব'লে ধাওয়া ক'রে দানীবাবু রীতিমত চমকের সৃষ্টি করতেন। কিন্তু শিশিরকুমার ও-পথ দিয়ে গেলেন না। যোগেশ শিক্ষিত, নিজের অদম্য পরিশ্রমে দশের একজন হয়েছিল। সেই যোগেশ যতই মাতাল হোক না কেন, তার সহজাত আভিজাত্য কোথায় যাবে? তাই কালীঘাটের দৃশ্যে শিশিরকুমার পথিককে দেখে তার পিছু ধাওয়া করতেন না, তাকে ডাকতেন—"ও মশাই শুনছেন, ও মশাই, চারটে পয়সা দিতে পারেন, চারটে?"

দানীবাবুর অভিনয় ছিল অশিক্ষিত পটুত্ব, শিশিরকুমারের অভিনয়ে দেখলুম, চরিত্রটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে উপলব্ধি ক'রে তারই মার্জিত রূপায়ণ। আমাদের সঙ্গে সকল দর্শকই ধন্য ধন্য করতে লাগল।

আর এই শিশিরকুমারেরই 'প্রফুল্ল' অভিনয় দেখে বুঝতে পারলুম, নাটকটির নাম 'প্রফুল্ল' রাখা হয়েছে কেন? কুটবুদ্ধিপরায়ণ রমেশের সমস্ত অপকৌশলকে পরাস্ত ক'রে ঘোষ বংশের একমাত্র বংশতিলক যাদবকে যে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করেছিল, ঘোষ বংশকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যে আপ্রাণ লড়াই করেছিল, সেই সরলমনা প্রফুল্লই তো এই নাটকের আসল নায়িকা। শ্রীমতী প্রভার চরিত্র চিত্রণ আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। তাঁর মুখের "আমি ডালবাটা ভাতে খেতে বড্ড ভালেবাসি" সংলাপটিকে কি সহজে ভোলা যায়?

প্রফুল্ল অভিনয়ে জয়পতাকা উড়িয়ে শিশিরকুমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর্ট থিয়েটার্সের 'প্রফুল্ল' অভিনয়কে, যাকে বলে, একেবারে নস্যাৎ ক'রে দিলেন। এর পরে তিনি খুললেন—দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'। কিন্তু আগেই বলেছি, অমৃতলাল বসু চিত্রিত 'নিমচাঁদ'-এর কাছে শিশিরকুমারের

'নিমচাঁদ' আমার কাছে বেশ নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল।

শিশিরকুমার আবার চলে গেলেন ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটক 'নর-নারায়ণ'। এই নাটকে কর্ণের ভূমিকায় স্বয়ং শিশিরকুমার, শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় বিশ্বনাথ, পদ্মার চরিত্রে কৃষ্ণভামিনী ও দ্রৌপদী বেশে চারুশীলা দর্শকদের অভিভূত করতে পারলেও বইটি কিছুটা উচ্চাঙ্গের হওয়ায় বেশী দিন চলেনি।

শিশিরকুমারের পরবর্তী ঘোষণা নাট্যামোদী জনসাধারণকে চমকিত ক'রে তুলল; প্রাচীরপত্র প'ড়ে গেল—নাট্যমন্দিরে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' অভিনীত হবে। 'দেনা-পাওনা' অবলম্বনে ভারতীর পূজা সংখ্যায় 'ষোড়শী'র নাট্যরূপ প্রথম দেন শিবরাম চক্রবর্তী। কিন্তু নাট্য-মন্দিরে যে-ষোড়শী মঞ্চস্থ হতে চলেছে, তার নাট্যরূপ দেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি গোপন কথা প্রকাশের লোভ এখানে সংবরণ করতে পারছি না।

শিশিরকুমারের একজন বিদগ্ধ বন্ধু ছিলেন, যাঁর নাম সুধাংশু মুখোপাধ্যায়। এই সুধাদা 'ষোড়শীর' নাট্যরূপটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখার পরমন্তব্য করেন কাহিনী শেষ করতে হবে জীবানন্দের মৃত্যুতে অলকার হাত ধ'রে জীবানন্দ ফকিরসাহেবের শৈবালদিঘীর আশ্রমে গেলে চলবে না। সুধাদার কথা শুনে শরৎচন্দ্র রীতিমত ক্ষেপে যান। সোনাকে পুড়িয়ে তাকে সমস্ত খাদমুক্ত করার মতোই জীবানন্দকে যখন একজন খাঁটি মানুষে পরিণত করা হ'ল, তখন সে অলকার (ষোড়শীর পূর্বনাম) হাত ধ'রে শৈবালদিঘীর আশ্রমে গিয়ে সেখানে থেকে জনসাধারণের উপকার ব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করবে, এইটাই তো স্বাভাবিক।

শরৎচন্দ্রের এই যুক্তি শুনে সুধাদা বললেন, শরৎদা, তুমি উপন্যাস লেখ, নাটকের তুমি বোঝো কি? নাটক চায়, জীবানন্দ যখন দোষমুক্ত হয়ে চরিত্রের দিক দিয়ে একটি আদর্শ মানুষে পরিণত হ'ল, যখন তাকে গ্রহণ করবার, বরণ করে নেবার পথে অলকার কোনও বাধাই রইল না। তখনই জীবানন্দের মৃত্যু ঘটবে, যা অলকার জীবনে ক্ষণিক হাহাকার তুলে তাকে স্বনির্ধারিত পথে চলবার অবাধ মুক্তি দেবে। তাই 'ষোড়শী' নাটককে ট্রাজিডি বা বিয়োগান্ত হতেই হবে, কমেডি (মিলনান্ত) হ'লে দর্শকরা হেসে উঠবে, বলবে—এতো যে আয়োজন, এতো যে পরিস্থিতি রচনা, সব বৃথা হয়ে গেল।

সুধাদর মতই যে ঠিক, তা' যাঁরাই 'ষোড়শী'র অভিনয় দেখেছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন মুক্তকণ্ঠে। আকস্মিক বিপদের কথা শুনে ষোড়শী যখন মৃত্যুপথযাত্রী জীবানন্দের পায়ের তলায় আছড়ে পড়ে বলে—"এ তুমি চলেছ কোথায়? তুমি যে সংসার চেয়েছিলে, স্ত্রী চেয়েছিলে, পুত্র চেয়েছিল—স্বামী" ইত্যাকার হৃদয়বিদারক সংলাপ, তখন সমস্তপ্রেক্ষাগৃহ যেন আকুলভাবে গুমরে ওঠে। এর পরিবর্তে অলকার হাত ধরে জীবানন্দ শৈবালদিঘীর আশ্রমের পথে

পা বাড়ালেন, এ-দৃশ্য ভাবতেই পারা যায় না।

অবশ্য এখানে একটি অনুযোগ করা হয়ত অবান্তর হবে না। জীবানন্দের মৃত্যুর কারণ ঘটাবার জন্যে সাঁকো থেকে পদস্খলন হওয়ার চেয়ে আরও কোনও যুক্তিসিদ্ধ, সঙ্গত কারণ খুঁজে বার করা উচিত ছিল। 'ষোড়শী' সম্পর্কে আর একটি কথা। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে জীবানন্দের চেহারার যে বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে শিশিরকুমারের চেহারার কোনই মিল নেই। কোথায় সেই ছিপছিপে চেহারা, যার বয়েস পঁচিশও হতে পারে আবার পঁয়তাল্লিশও হতে পারে! আমার জানার মধ্যে এই রকম চেহারাধারী একমাত্র লোক ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া।

'ষোড়শী'র পরে শিশিরকুমার হাত দিলেন একেবারে ভিন্নধর্মী নাটক 'শেষরক্ষা'য়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোড়ায় গলদ' নামে হাস্য-রসাত্মক নাটকটিকে শিশিরকুমারের অভিনয়োপযোগী কিছু অদলবদল ক'রে তার নাম দিলেন—'শেষরক্ষা'। গদাই এবং ইন্দুমতীর নামবিভ্রাট থেকে বিবাহবিভ্রাট হচ্ছে এর মূল বিষয়বস্তু। ওরই সঙ্গে পার্শ্বচরিত্র হিসেবে আছে বিনোদ এবং কমলমণি। এদের মধ্যে নানা পরিস্থিতি রচনা ক'রে হাসির ফোয়ারা ছোটাতে আছেন দুই বর্ষীয়ান স্বামী স্ত্রী—চন্দ্রদা ও ক্ষান্তমণি। এই দুই ভূমিকায় শিশিরকুমার ও চারুশীলা দর্শকদের একেবারে মাতিয়ে তুলতেন। আগে বলতে ভুল হয়ে গেছে যে, "ষোড়শী'তে নাম-ভূমিকায় চারুশীলা তাঁর আন্তরিক মনোজ্ঞ অভিনয় দ্বারা নিজেকে একজন পাকা ঝানু অভিনেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শিশিরকুমার বহুদিন একই সঙ্গে প্রথমে 'ষোড়শী' ও পরে 'শেষক্ষা' অভিনয় করেছেন। এতে শিল্পীদের যদিও ডবল পরিশ্রম করতে হ'ত, কিন্তু দর্শকদের হ'ত দুনো পাওনা—তারা চুটিয়ে উপভোগ করত প্রথমে মর্মভেদী ট্রাজিডি ও পরে প্রায় পাগল ক'রে দেওয়া হাসির হররা।

এর পরেই শিশির সম্প্রদায় প্রধানত শিশিরকুমারের মদ্যাসক্তি ও সম্প্রদায় পরিচালন ব্যাপারে অনাসক্তির জন্যে আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এই আর্থিক বিপর্যয়কে রোখবার জন্যে শিশিরকুমার নাট্যমন্দিরকে একটি যৌথ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ১৯২৮ সালে তিনি মঞ্চস্থ করেন যোগোচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'দিগ্বিজয়ী'। লুঠেরা, নৃশংস নাদিরশাহের চরিত্র-চিত্রণে শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়-প্রতিভার একটি স্মরণীয় নিদর্শন দর্শকবৃন্দকে উপহার দিলেন। কিন্তু দর্শক-সহানুভূতি আকর্ষণ করল নাদিরের উন্নতমনা বন্ধু সালে বেগ-এর চরিত্রে বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর মনোজ্ঞ অভিনয়। ফলে যখন উচ্ছৃঙ্খল বন্ধু নাদিরকে সালে বেগ গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেন, তখন দর্শক অন্তঃকরণ থেকে নাদিরের প্রতি অণুমাত্রও সহানুভূতি বর্ষিত হত না। এই সহানুভূতিবর্জিত, নৃশংস ভিলেন যে-নাটকের নায়ক, যতই সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে তা অভিনীত হোক না কেন, তা' কিছুতেই দর্শক-সহানুভূতি আকর্ষণে

সমর্থ হয় না। নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী যখন আমাকে নাটকটি না চলার কারণ জিজ্ঞেস করেন, তখন আমি তাঁকে এই কথাই বলেছিলুম।

'দিগ্বিজয়ী'কে মঞ্চস্থ করবার পরে শিশিরকুমার পল্লীসমাজের নাট্যরূপ 'রমা' অভিনয় করেন ; কিন্তু প্রৌঢ় রমেশ দর্শক আকর্ষণে অসমর্থ হয়। এর পরে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নাটিকা 'শঙ্খধ্বনি'তে কেতনলালের ভূমিকায় শিশিরকুমারের পুরো চল্লিশ মিনিটব্যাপী একক অভিনয়—স্বপ্নাবস্থায় তাঁর বাচন এবং যথাযোগ্য অভিব্যক্তি সহকারে নিজের কৃত অপরাধ স্বীকার—দর্শকবৃন্দকে আশ্চর্যভাবে অভিভূত করে।

সত্যিই, হেনরী আর্ভিং-এর 'দি বেল্‌স্' অবলম্বনে 'শঙ্খধ্বনি'র অভিনয়ে শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভার যে নিদর্শন পাওয়া গেল, তা তুলনারহিত। বোধকরি, পৃথিবীর নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে এ একটি বিরল নিদর্শন। আর একটি চমকের তিনি সৃষ্টি করেছিলেন গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাট্যাভিনয়ে। এই নাটকে তিনি এক একদিন একই সঙ্গে ভীম, বৃহন্নলা (অর্জুন), কীচক, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ—এই পাঁচটি ভূমিকায় পাঁচ রকম অভিনয়ের নিদর্শন দর্শকসম্মুখে উপস্থিত ক'রে নিজের অভিনয় ক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেন।

কিন্তু এত রকম করেও নাট্যমন্দির লিমিটেডকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা গেল না। ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে ফেব্রুয়ারী মাসের এক মঙ্গলবার একটি বিশেষ অভিনয়ের প্রারম্ভে শিশিরকুমার স্বমুখে ঘোষণা করলেন, "নাট্যমন্দিরকে বাঁচাবার সব রকম চেষ্টাই আমার ব্যর্থ হয়ে গেল। লিমিটেড কোম্পানী করলুম ; কিন্তু মাত্র ৩০,০০০ টাকার বেশী শেয়ার বিক্রি হ'ল না। এ অবস্থায় আমাকে থিয়েটার বন্ধ করতেই হচ্ছে—আজই নাট্যমন্দিরের অভিনয়ের শেষ দিন।"

কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, নাট্যমন্দিরের মতো প্রতিষ্ঠানও শেষ পর্যন্ত চলল না। হিসাবে পাই না, যেখানে প্রায় ১৫০/২০০ রজনী 'সীতা' ক্রমান্বয়ে 'ফুল হাউস'-এ চ'লে নাট্যমন্দিরকে দিয়েছে দুই থেকে তিন লক্ষ টাকা, অথচ যে প্রতিষ্ঠানের মাসিক ব্যয় এগারো হাজার টাকার বেশী নয়, যেখানে 'ষোড়শী', 'শেষরক্ষা'র মতো নাটক রাত্রির পর রাত্রি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়, সেখানে টাকার অভাব হয় কেন ?

এ ছাড়াও কথা আছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে প্রথমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পরে দেশগৌরব যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মনোমোহন নাট্যমন্দিরের দর্শক সমক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, কয়েকটি সহজ শর্ত পালন করলে তাঁরা শিশিরকুমারকে 'কর্পোরেশন থিয়েটার' তৈরী ক'রে দেবেন। এ সুযোগ শিশিরকুমার গ্রহণ করলেন না কেন, এ প্রশ্নও আমাদের আন্দোলিত করেছে।

স্পষ্ট ক'রে বলা প্রয়োজন, শিশিরকুমারের অত্যধিক মদ্যাসক্তি এবং তজ্জনিত উচ্ছৃঙ্খলতাই হচ্ছে নাট্যমন্দিরের পতনের মূল কারণ। তাঁর

নিজের চতুর্থ ভ্রাতা ঋষিকেশ ভাদুড়ী এবং ম্যানেজার সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় দু'জনেই ছিলেন অপদার্থ। তা'ছাড়া শিশিরকুমারের কথা ও কাজ—এ দুইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার সাহস তাঁদের ছিল না। কাজেই ট্যাক্সি থেকে নেমে শিশিরকুমার ১৬ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিতে বললে সেই আদেশ তাঁদের শিরোধার্য করতেই হ'ত। আমাকে শিশিরকুমার 'ছোট নাচঘর' ব'লে ডাকতেন। কিন্তু যেদিন তিনি অত্যন্ত বেসামাল অবস্থায় দর্শকদের সামনে হাজির হলেন, আমি 'নাচঘর'-এ তাঁর এই গর্বিত আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছিলুম। এবং সেই থেকেই তিনি আচারে আচরণে জানাতেন, তিনি আমার ওপর খুবই রুষ্ট।

নাট্যমন্দির ভেঙে দেবার পরে শিশিরকুমার আর্ট থিয়েটার্স পরিচালিত 'স্টার থিয়েটার'-এ যোগদান করেন এবং 'চাণক্য' (চন্দ্রগুপ্ত), 'রসিক' (চিরকুমার সভা), 'সাজাহান' (সাজাহান), 'মৃগাঙ্ক' (মন্ত্রশক্তি) প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন। এমন সময়ে তাঁর সামনে আসে একটি অভাবিত সুযোগ।

সতু সেন তখন আমেরিকায় নাট্যপ্রযোজনা পদ্ধতি শিখে ছোট ছোট আদর্শ প্রযোজনা প্রদর্শন করছিলেন। তিনি ভাগ্যক্রমে এলিজাবেথ মারবারী নামে একজন অভিজাত মহিলার সঙ্গে পরিচিত হন। ইনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নামকরা অভিনেতৃ দলকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে গিয়ে তাদের দ্বারা সেখানে অভিনয় করাতেন। আগেই তিনি 'মস্কো আর্ট থিয়েটার'কে নিয়ে গিয়েছিলেন। সতু সেনের কথায় তিনি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় দলকে নিউ ইয়র্কে অভিনয় করবার সুযোগ দিতে রাজি হলেন।

এ ব্যাপারে সতু সেন শিশিরকুমারকে যথারীতি পত্র দিলেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে এরিক ইলিয়ট নামে একজন বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক ও নাট্যোৎসাহী ভদ্রলোকের দৌত্যে শিশির সম্প্রদায়ের আমেরিকা যাওয়া স্থির হয়। কিন্তু দাম্ভিক শিশিরকুমারের একবারও মনে হ'ল না যে, তিনি 'কামারের হাটে ছুঁচ বেচতে যাচ্ছেন'। একবারও তিনি ভাবলেন না যে, এই দুর্লভ সুযোগ যখন বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পীরূপে তাঁর কাছে এসে পোঁছেচে, তখন বাঙলার বিশিষ্ট শিল্পীদের সমন্বয় ঘটিয়ে, সুবৃহৎ 'সীতা' নাটককে ২/২॥ ঘণ্টার উপযোগী ক'রে কাটছাঁট করার পরে প্রচুর মহলা দিয়ে তৈরি হয়ে এবং আগে থেকে কোনও বিশিষ্ট মঞ্চশিল্পীকে নিউ ইয়র্কে সতু সেনের কাছে পাঠিয়ে উপযোগী মঞ্চসজ্জা তৈরী করিয়ে নেবার পরে তাঁর সদলবলে সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। তা' না ক'রে তিনি তাঁর এখানকার মঞ্চে ব্যবহৃত দৃশ্যসজ্জা নিউ ইয়র্কে পাঠালেন এবং বেচা চন্দ্র, পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ বসু প্রমুখ এমন সব লোককে তাঁর দলভুক্ত করলেন, যাঁদের অভিনয় করা সম্বন্ধে কোনই অভিজ্ঞতা নেই।

ভাদুড়ী মশাই দলের মেয়েদের নিয়ে ১৯৩০-এর ২৫ অক্টোবর তারিখে

নিউ ইয়র্কে পৌঁছুতেই প্রায় আট ন'খানি মোটরে ক'রে জনসমাকীর্ণ পথ দিয়ে তাঁর দলবলকে নিয়ে যাওয়া হ'ল নিউ ইয়র্ক সিটি হলে এবং সেখানে নিউ ইয়র্কের ডেপুটি মেয়রের সভাপতিত্বে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হ'ল। শোনা গেল, শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যশালা বিল্টমোর থিয়েটারে প্রতি সপ্তাহে নটি ক'রে প্রদর্শনী হিসেবে পুরো আট সপ্তাহের টিকিট নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এবং টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য হচ্ছে ১২ ডলার।

কিন্তু এর পরেই সব বিপরীত ব্যাপার ঘটতে শুরু করল। ড্রেস-রিহার্সাল দেখে মিস মারবারী রীতিমত ক্ষেপে গেলেন এবং যখন দেখলেন, যে-দৃশ্যপট কলকাতা থেকে এসেছে, তা বিল্টমোর স্টেজের মাত্র এক-চতুর্থাংশ স্থানকে ঢাকতে পারে, তখন তিনি চুক্তিপত্রটি বাতিল করে দিলেন। শুনেছি, দৃশ্যপট-গুলিকে থিয়েটারের সামনের রাস্তায় স্তূপাকার করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

দেশের সম্মান রক্ষার জন্যে সতু সেন যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে আড়াই মাস পরে ভ্যাণ্ডারবিল্ট থিয়েটারে ১৯৩১-এর ১২ থেকে ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত সাত দিনে ৭টি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর প্রশংসিত হ'লেও তাঁর অঙ্গভঙ্গী ও গতিবিধি আতিশয্যপূর্ণ বলে বর্ণিত হয়। বরং সীতার ভূমিকায় প্রভা উচ্চ প্রশংসিত হন। একখানি কাগজ বলে, "রানী অন্তত দু'বার চোখের জল ফেলেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আমরাও ফেলেছিলুম।"

অত্যন্ত হীন ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় শিশিরকুমারকে ফিরতে হয়েছিল একটি কার্গো বোটে অর্থাৎ মালবাহী জাহাজে। তাও সম্ভব হ'ত না, যদি না সতু সেন তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতেন। বাঙলা তথা ভারতের এবংবিধ সম্ভ্রমহানিতে আত্মম্ভরী শিশিরকুমার একটুও লজ্জিত বোধ করেছিলেন কি? নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় ভারতের নাট্যলক্ষ্মীর মাথা হেঁট করানোর জন্যে দায়ী হয়ে তিনি কি একটুও অনুশোচনা করেছিলেন?

কলকাতায় ফিরে হাওড়ার নাট্যপীঠ থেকে শুরু ক'রে রঙমহল পর্যন্ত বহু থিয়েটারে দু' বা চার রাত্রি অভিনয় করবার পরে তিনি স্টার থিয়েটার লীজ নিলেন ১৯৩৩ সালের শেষাশেষি এবং এইখানে রইলেন ১৯৩৭ সালের মে মাস পর্যন্ত। 'নব নাট্য মন্দির' এই নামে তাঁর প্রতিষ্ঠানে সর্বপ্রথম অভিনীত হয় শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ'। আরও কয়েকটি নাটকের পরে এখানে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় শরৎচন্দ্রেরই 'বিজয়া'। আর একখানি নাটক, যা দর্শকদের চমকিত করে, সেটি হচ্ছে জলধর চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'রীতিমত নাটক'। এই নাটকে শিশিরকুমার 'দিগম্বর'-এর ভূমিকায় প্রেক্ষাগৃহের একটি আসন থেকে উঠে মঞ্চপ্রবেশ ক'রে অভিনবত্বের সৃষ্টি করেন। নাটকটি দর্শক-মহলে যথেষ্ট উত্তেজনার সঞ্চার করে এবং শিশিরকুমারকে আর্থিক সাফল্য এনে দেয়। কিন্তু এর পরে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' অবলম্বনে 'আচলা' এবং স্টারে শিশিরকুমারের শেষ নাটক, রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' জনসাধারণকে তেমন আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি।

১৯৩০ সালে 'ইণ্ডিয়ান ভার্নাকুলার্স'-এ এম. এ. পাশ করবার পরে আমার ইচ্ছা হয়েছিল ইংরাজীতে এম. এ. পড়বার জন্যে এবং আমি ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেণ্টের ইংরাজী ক্লাশে ভর্তি হই এবং নিয়মিত ক্লাশ করতে শুরু করি আশুতোষ বিল্ডিং-এ। কিন্তু এই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'নাচঘর'-এর দায়িত্বও সমানে বহন ক'রে চলেছিলুম।

এখানে বলা দরকার ১৯৩১ সালের কোনও এক সময়ে নলিনীমোহন রায়চৌধুরী 'নাচঘর'-এর স্বত্বাধিকারিত্ব ত্যাগ করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও হরেন্দ্রলাল ঘোষ, সাধারণ্যে যাঁর পরিচিতি ছিল হরেন ঘোষ ব'লে। তাঁর হয়ে তাঁর মেজ ভাই ধীরেন ঘোষ কাগজটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করায় আমাকে তাঁরই সঙ্গে বেশী যোগাযোগ রাখতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে কাগজটি ছাপবার জন্যে প্রেসও পাল্টায়। কান্তিক প্রেস ছেড়ে আমরা চ'লে আসি গ্রে স্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের মোড় বরাবর একটি প্রেসে। প্রেসটি আমার বাড়ীর কাছাকাছি হওয়ায় আমার এতে কিছুটা সুবিধেই হয়েছিল।

এই ১৯৩১ সালের ১৪ মার্চ 'নাট্য নিকেতন' নামে একটি নতুন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্ম হয়। অক্লান্তকর্মা প্রবোধচন্দ্র গুহ রাজা রাজকিষণ স্ট্রীটের প্রায় মাঝামাঝি, প্রায় রাজাবাগান জংশন রোডের (বর্তমান নাম ক্ষুদিরাম বসু রোড) মুখোমুখী একটি খালি জমি, যার পিছন দিকটা হোগলকুঁড়িয়া স্ট্রীট (বর্তমানে সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তারই ওপর এই থিয়েটারটিকে গ'ড়ে তোলেন।

এখানে প্রথম যে-নাটকটি মঞ্চস্থ হয়, সেটি হচ্ছে রায়বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ রচিত 'ধ্রুবতারা' উপন্যাসের হেমেন্দ্র রায় প্রদত্ত নাট্যরূপ। ঠিক পরেই মন্মথ রায় লিখিত 'সাবিত্রী' নাটকটি অভিনীত হয়। এই সময়ে আমেরিকা ফেরত শিশিরকুমার ও দানীবাবু মিলিতভাবে 'চন্দ্রগুপ্ত', 'প্রফুল্ল' ও 'জনা' অভিনয় করেন নাট্যনিকেতনে ১৯৩১-এর জুলাই মাসে।

এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল আমেরিকা প্রত্যাগত সতু সেনের নাট্য নিকেতনে যোগদান এবং তাঁর পরিচালনায় নভেম্বরের মাঝামাঝি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত 'ঝড়ের রাতে' নাটকের শুভমুক্তি। নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ললিত মিত্র, নীহারবালা, সুশীলাসুন্দরী, শেফালিকা (পুতুল) অভিনীত এই নাট্যাভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে আশ্চর্য টীম-ওয়ার্ক বা দলবদ্ধ সামগ্রিক অভিনয়, মঞ্চ-পরিবেশ এবং আলোক-প্রক্ষেপণের চাতুর্যের জন্য। এতে আর একটি বিষয় ছিল লক্ষণীয়। সমগ্র নাটকটি অভিনীত হ'তে প্রতিদিন একই সময় নিত; এমনকি প্রতিটি দৃশ্য অভিনীত হ'তে একই সময় লাগত।

কাজী নজরুল ইসলামের 'আলেয়া', নিরুপমা দেবীর 'দিদি' (শিবরাম

চক্রবর্তী কৃত নাটক), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সতীতীর্থ' (এই নাটকে প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন রাণীবালা ও সুহাসিনী), জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'আঁধারে আলো' (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত একই নামের কাহিনী থেকে পৃথক) ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'বিপ্লব' অভিনীত হতে ১৯৩২ সালের আগস্ট মাস কেটে যায়। এরই কিছুকাল পরে শিশিরকুমার তাঁর অনুগত কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে প্রবোধচন্দ্র গুহের কাছে আসেন এবং তাঁর আনুকূল্যে ও সম্মতিক্রমে সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত (যিনি কালো রবীন্দ্রনাথ নামে অন্তরঙ্গ মহলে পরিচিত ছিলেন) রচিত 'মহাপ্রস্থান' নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু মহাভারতের 'মহাপ্রস্থান' পর্ব নিয়ে রচিত নাটকটি কি নাট্যবস্তু, কি অভিনয়, সকল দিক দিয়েই এমন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয় যে, ভাদুড়ীমশাইকে এই একটি নাটক অভিনয়ের পরেই নাট্যনিকেতন থেকে পাততাড়ি গুটোতে হয়।

এর পরে নাট্যনিকেতনে যে মঞ্চসফল নাটকটিকে দর্শক-সাধারণ হর্ষধ্বনি সহ স্বাগত জানায়, সেটি হচ্ছে অনুরূপা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাসের অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত নাট্যরূপ—'মা'। এই নাটকে প্রতিটি ভূমিকা যেমন সুষ্ঠু ও চিত্তাকর্ষকভাবে অভিনীত হয়, এমনটি বঙ্গরঙ্গমঞ্চে ক্বচিৎ দেখা যায়। অহীন্দ্র চৌধুরী (অরবিন্দ), নীহারবালা (ব্রজরানী), নির্মলেন্দু লাহিড়ী (নিতাই), চারুশীলা (শরৎশশী), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (মৃত্যুঞ্জয়) এবং সরযূবালা (বালক অজিত)—প্রত্যেকেই এই নাটকে যাকে বলে, চুটিয়ে অভিনয় করেছিলেন। পরিস্থিতি রচনায় এমন সার্থকতা বোধকরি, অপরেশ-চন্দ্র খুব কম নাটকেই অর্জন করেছিলেন। মর্মস্পর্শী হয়েছিল বালক অজিত বেশে সরযূবালার অনবদ্য অভিনয়। পারিতোষিক বিতরণী সভায় অরবিন্দের (অরবিন্দ যে অজিতের পিতা, একথা অজিতের জানা থাকলেও অরবিন্দের তখনও পর্যন্ত জানা ছিল না) সামনে তাঁর কণ্ঠের "সিন্ধুতলে নিমজ্জিতা সীতা" বিষয়ক আবৃত্তি আজও পর্যন্ত আমার কানে ঝঙ্কৃত হচ্ছে।

এই 'মা' নাটক অভিনয়কালে একটি রাত্রির ঘটনার কথা এখানে না প্রকাশ ক'রে থাকতে পারছি না। অহীন্দ্র চৌধুরী 'মা' নাটকের অভিনয়কালে মাস মাইনে না নিয়ে প্রতি রাত্রে অভিনয়ের জন্যে একটি নির্দিষ্ট টাকা নিতেন। চুক্তি ছিল, উনি মঞ্চে অবতীর্ণ হবার আগেই টাকাটি তাঁকে দিয়ে দিতে হবে। অভিনয় রাত্রে টিকিটঘর সামলাতেন প্রবোধবাবুর মেজ ছেলে সুধীরচন্দ্র গুহ। এক রাত্রিতে তিনি, কি কারণে জানি না, অহীন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করেন, "প্রথম অঙ্কটি অভিনয় করুন, আমি এরই মধ্যে টাকা নিয়ে তৈরী হয়ে থাকব।"

অহীন্দ্রবাবুর মনটি একটু খুঁতখুঁত করতে থাকলেও তিনি তাঁর অনুরোধ রক্ষা ক'রে প্রথম অঙ্কের অভিনয় সমাপ্ত করেন। কিন্তু এর পরে আবার অনুরোধ আসে, হিসাবে গুরুতর গরমিল হওয়ায় টাকাটির কিনারা করা যায়নি ; তাই উনি দ্বিতীয় অঙ্কটাও চালিয়ে দিন। এই অঙ্কের শেষে সুধীর-

বাবু টাকা নিয়ে অহীন্দ্রবাবুর সামনে হাজির হবেন। এই সময়ে আমি অহীনবাবুর কাছেই বসেছিলুম। তিনি আমাকে বললেন, "দেখ পশুপতি কি রকম সব কথা! আচ্ছা ঠিক আছে। এই দ্বিতীয় অংকটাও করছি। কিন্তু তার পরে টাকা না পেলে আমার কর্তব্য আমি করব।" এই ব'লে তিনি মঞ্চাবতরণ করতে গেলেন।

আমি শেষ পর্যন্ত কি হয়, তা দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না ব'লে অহীনবাবুর মেক্-আপ রুমেই অপেক্ষা করতে লাগলুম। যথা সময়ে দ্বিতীয় অংকও শেষ হ'ল। কিন্তু সুধীরবাবুর তখনও পর্যন্ত দেখা নেই। অহীন্দ্রবাবু আমাকে বললেন, "দেখছ তো কাণ্ড! অতএব আমি প্রস্থান করছি। তুমি সাক্ষী রইলে।" এই ব'লে অহীনবাবু তাঁর ভূমিকার জন্যে পরিহিত সাজ পরেই থিয়েটারের পিছন দিককার—হোগলকুঁড়িয়া স্ট্রীটে পড়বার দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন কালবিলম্ব না ক'রে। তখন তাঁর পরণে সাদা থান, গায়ে গরদের চাদর, হাতে একটি কম্বলের আসন। তাঁর গৃহীত চরিত্র অরবিন্দের তখন পিতৃ-বিয়োগ হয়েছে, তাই এই বেশ। তিনি তাঁর মেক্-আপ রুম ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমিও সেস্থান পরিত্যাগ ক'রে প্রেক্ষাগৃহের একটি আসন অধিকার ক'রে বসলুম, কারণ আমার ছিল ওখানে অবাধ গতি। দেখতে চাইলুম, এই সঙ্গীন অবস্থাকে কর্তারা কিভাবে সামাল দেন।

যবনিকা অনেকক্ষণ পরে উত্তোলিত হ'লে দেখা গেল, নিতাই-বেশী নির্মলেন্দু লাহিড়ী মঞ্চের ওপর থেকে দর্শকদের অভিবাদন ক'রে বলতে শুরু করলেন: "একটি দুঃখের কথা আপনাদের জানাচ্ছি। আজকে অহীন্দ্রবাবু অসুস্থ শরীর নিয়েই অভিনয় শুরু করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সেটা যে ভেদ-বমিতে দাঁড়াবে, এটা কেউই আগে থাকতে বুঝতে পারেননি। রোগটা যখন কিছুতেই বাগ মানছে না, তখন তাঁকে বাধ্য হয়েই হাসপাতালে পাঠাতে হ'ল।"

এই পর্যন্ত শুনেই দর্শক আসন থেকে কেউ কেউ জানতে চাইলেন: কোন হাসপাতালে? নির্মলেন্দুবাবু তখনই উত্তর দিলেন—"দেখুন, মোটরে ক'রে তাঁকে পাঠানো হয়েছে; ঠিক কোন হাসপাতাল তাঁকে ভর্তি করবে, সে-খবর এখনও পাওয়া যায়নি। এখন আপনারা যদি অনুমতি করেন, তাহলে তাঁর ভূমিকাতে আমি অভিনয় করব, আর আমার ভূমিকাটা করবেন সন্তোষ সিংহ মশাই। যদি কেউ এই ব্যবস্থা অপছন্দ করেন, তিনি স্বচ্ছন্দে টিকেটঘর থেকে তাঁর টিকিটের টাকা ফেরত নিতে পারেন।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই নির্মলবাবু দর্শকদের নমস্কার জানিয়ে মঞ্চ পরিত্যাগ করলেন এবং যবনিকা প'ড়ে গেল।

এইখানে একটি বিচিত্র দর্শক-মনোবৃত্তি কাজ করল। নাটক দেখতে ব'সে খুব কম লোকই শেষ পর্যন্ত না দেখে উঠে যায়, বিশেষ যদি নাটকটি ভালো হয়। 'মা' নাটকটি দু'অঙ্ক দেখবার পর অবস্থা বিবেচনা ক'রে তাই এই

ভূমিকা পরিবর্তনকে প্রায় সকলেই হৃষ্টচিত্তে মেনে নিলেন; মাত্র একজন দর্শক টিকিটের টাকা ফেরত নেবার জন্যে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করলেন।—আসল ব্যাপারটা ধামা চাপাই রয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আরও একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ আত্মপ্রকাশ করেছিল ঐ হাতী-বাগান পাড়ায়। রাজা রাজকিষণ স্ট্রীটের মোড়টা পেরিয়ে হেদুয়ার দিকে, কিংবা আরও বিশেষ ক'রে বলা যায়, হোগলকুড়িয়া স্ট্রীটের দিকে এগোলে বাঁদিকে যে সুরকীর কলটা দেখা যেত, সেইটি উঠে গিয়ে ওখানে নির্মিত হ'ল রঙমহল রঙ্গমঞ্চ বিশিষ্ট নট রবীন্দ্রমোহন রায় এবং অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের যুগ্ম প্রচেষ্টায়।

১৯৩১ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে এর দ্বারোদ্ঘাটন হয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রচিত 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক দিয়ে। এতে শিশিরকুমার শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রভা বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় অবতরণ করেন। অপরাপর ভূমিকায় ছিলেন নৃপেশ রায়, যোগেশ চৌধুরী, রবি রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, তারকবালা (মিস লাইট) ও সরযূবালা। সত সেন ছিলেন এর স্টেজ ম্যানেজার। শিশিরকুমার ও সম্প্রদায়কে এই মঞ্চে অভিনয় করবার জন্যে এককালীন বোনাস দেওয়া হয় দশ হাজার টাকা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নাটক বা তার অভিনয় নাট্যপ্রিয় দর্শকদের তেমন খুশী করতে পারল না।

এরপরে যখন গুটিকয়েক পুরোনো নাটকে অভিনয় অন্তে সহসা শিশির-কুমার তাঁর দলবল নিয়ে রঙমহল ত্যাগ করলেন, বলব, চুক্তি ভঙ্গ ক'রেই, তখন রবি রায় ও কৃষ্ণচন্দ্র সহসা নিতান্ত অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। কিন্তু তাঁরা শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে আইনের পথে না গিয়ে থিয়েটার চালানোর দিকেই মনোনিবেশ করলেন এবং প্রয়োজন বোধে প্রবোধচন্দ্র গুহের নাট্যনিকেতন থেকে কোনও কোনও শিল্পীকে নিয়ে নাট্যাভিনয় বজায় রাখতে লাগলেন। যেমন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'রুমেলা'র নাম-ভূমিকাতে অভিনয়ের জন্য তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন শেফালিকা বা পুতুলকে। 'দেবদাসী', 'রঙের খেলা' ও 'সিন্ধু গৌরব' অভিনয়ের পরে এঁরা ১৯৩২-এর জুলাইয়ে মঞ্চস্থ করেছিলেন জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'অসবর্ণা' নাটক।

এই নাট্যাভিনয়টিকে আমার বিশেষভাবে মনে আছে কয়েকটি বিশেষ কারণে। এই নাটকের নায়িকারূপে সরযূবালা তাঁর বান্ধবীর কাছে বর্ণনা করেছিলেন প্রথম পুরুষ সহবাসের সময়ে তাঁর বিচিত্র মনোভাবের কথা। এই বর্ণনার এক জায়গায় ছিল—"লাল হ'ল সরযূর জল।" কিন্তু নিজের নাম সরযূ ব'লে তিনি ঐ কথাটি পালটে দিয়ে বলেছিলেন—"লাল হ'ল যমুনার জল।" এই নাটকের একটি দৃশ্যে কালিকাতাণ্ডব নৃত্য করেন সরযূবালারই ছোট বোন আঙুর। এবং এই নৃত্যের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র দে মঞ্চেরই একপাশে দাঁড়িয়ে গেয়েছিলেন—"নেচেছ প্রলয়নাচে, হে নটরাজ, তাথৈ তাথৈ"। যতদূর মনে হয়, ঝাঁপতালে মালকোশ রাগে। এই নাচ ও গানের সঙ্গে সতু সেন মঞ্চ ও

প্রেক্ষাগৃহ বিভিন্ন ধরণে ও বিচিত্রভাবে আলোক নিভিয়ে জ্বালিয়ে দর্শককে যে-ভাবে স্তম্ভিত করেছিলন, তার তুলনা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আর কোনও নাটকে কোনও দিন দেখবার সৌভাগ্য হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে ব'লে মনে হয় না। কালিকা তাণ্ডব নৃত্যটি আঙুরকে শিখিয়েছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। এই আশ্চর্য নৃত্যটি নাচতে নাচতে সে এমনই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ত যে, নৃত্যশেষে সে নির্জীবের মত পড়ে থাকত অনেকক্ষণ।

এই নাটকের পরে ১৯৩২ এর অক্টোবরে 'রাজ্যশ্রী' অভিনয়ান্তে থিয়েটারটি যখন অচল হয়ে পড়ে, তখন এর পরিচালনাভার গ্রহণ করেন জাস্টিস এস. সি. মল্লিকের সুযোগ্য পুত্র শিশির মল্লিক যামিনী মিত্র ও সতু সেনের সহযোগিতায়।

শ্রী মল্লিক অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' উপন্যাসকে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা নাটকে পরিণত ক'রে ১৯৩৩ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে মঞ্চস্থ করেন। আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই নাটকটি অভূতপূর্ব দর্শক আকর্ষণ করতে থাকে। এই নাটকের বিশেষ আকর্ষণ ছিল অন্ধ ধীরার ভূমিকায় চারুবালার (ডাক নাম চরী) অনবদ্য অভিনয়। এ-ছাডা রাধিকাপ্রসন্ন বেশে যোগেশ চৌধুরীর স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক অভিনয়, বিহারীর ভূমিকায় নরেশচন্দ্র মিত্রের সহানুভূতি আকর্ষক অভিনয় এবং নায়ক নির্মলের চরিত্রে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোভাবব্যঞ্জক অভিনয় দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। তার ওপর এই নাটকেই দর্শকরা প্রথম দেখেন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ বা revolving stage, যা হচ্ছে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে সতু সেনের স্মরণীয় অবদান। এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চ যদিও একটি দৃশ্যের প্রসারতাকে যথেষ্ট কমিয়ে দেয়, তবু নাটকের গতিকে আশ্চর্য-ভাবে ত্বরান্বিত ক'রে ব'লে এর উপকারিতা ও প্রয়োজনীতা যথেষ্ট।

এর পরের নাটক, মন্মথ রায়ের 'অশোক' মঞ্চস্থ হয় ১৯৩৩-এর ২রা ডিসেম্বর তারিখে। এই নাটকটি আর কিছুর জন্যে না হোক, স্মরণীয় হয়ে থাকবে একটি কারণে এবং সেই কারণটি হচ্ছে, এই নাটকেই সৌন্দর্যময়ী শান্তি গুপ্তা প্রথম মঞ্চাবতরণেই দর্শকদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'তিষ্যরক্ষিতা'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ে তিনি একটি ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পেরেছিলেন।

১৯৩৪-এর ৩১এ মার্চ অভিনীত হয় লালগোলার জমিদার কুমার ধীরেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের উপন্যাস 'স্পর্শের প্রভাব' অবলম্বনে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রচিত 'পতিব্রতা' নাটক। এই নাটকেও যোগেশ চৌধুরী (রাজ্যেশ্বর), নরেশ মিত্র (কালীনাথ) ও রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (রণেন্দ্র) সঙ্গে জ্যোৎস্নায় ভূমিকায় অবতরণ করে শান্তি গুপ্তা কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

এর পরবর্তী নাটক, মূলতঃ কবি শৈলেন রায় রচিত 'কাজরী' একটি ভিন্নধর্মী সৃষ্টি। কাজরী উৎসবটি প্রধানত বর্ষাকালে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, বিশেষ করে পূর্ব-বিহারে। উৎসবটি নাচে গানে একেবারে জমজমাট। এই উৎসবটিকেই কবি শৈলেন রায় নাচগানের মাধ্যমে মঞ্চে মূর্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রঙমহলের কর্তৃপক্ষ পাছে মাত্র নাচগানের নাটক দর্শকদের

মনঃপূত না হয়, তাই ওই নাচ-গানের ফাঁকে ফাঁকে একটি নাটক চলাকালীন থিয়েটারের নেপথ্যে কত রকম ঘটনা ঘটে, তারই একটি চিত্র দর্শকদের সামনে তুলে ধরবার জন্যে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে back-stage অর্থাৎ মঞ্চের পিছনের ঘটনার কয়েকটি দৃশ্য লিপিবদ্ধ করান। ফলে মূল নাটকের নাচ-গানের একটি দৃশ্য, তারপরেই মঞ্চের নেপথ্যের একটি দৃশ্য—এই ভাবে সমগ্র নাটকটি অভিনীত হয়। প্রধানত হাসির খোরাক করবার জন্যে এমন সব সংলাপ ও পরিস্থিতি এই নেপথ্য দৃশ্যগুলিতে স্থান পায়, যা অশ্লীলতার পর্যায়ভুক্ত।

আমি 'নাচঘর'-এ 'কাজরী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে এই সব অশ্লীলতা সম্পর্কে বেশ কড়াভাবেই বিরূপ মন্তব্য করি। স্বাভাবিকভাবেই এই মন্তব্যগুলি রঙমহল কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয়নি। এবং তাঁদের সেই মনোভাব প্রকাশ করবার জন্যে একদিন সকালে স্বয়ং শিশির মল্লিক এক বোতল ঝাল আমের আচার আমাকে উপহার দিয়ে যান আমার বাড়ীতে এসে। বোতলের গলায় আঁটা একটি কাগজে ইংরাজীতে লেখা ছিল—For your Comments in Kajari."

ইতিমধ্যে আমার জীবনের চলার পথে নানা কারণে নানা পরিবর্তন এসেছে। ১৯৩০ সালের শেষাশেষি কলকাতায় সবাক চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়ে গেল। এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে (বর্তমানে মিনার্ভা সিনেমা) দেখলুম প্রথমে খণ্ড খণ্ড সবাক চিত্র, যাতে নাচগানই বেশী। তারপরে দেখলুম 'শো-বোট'। এই ছবিতেই নৌকো ক'রে যেতে যেতে, যতদূর মনে পড়ে ছবির নায়িকা একটি বাঙলা গান যার গোড়ার কথা ক'টি ছিল—"কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে" গেয়ে দর্শকদের বিস্ময়াভিভূত করেন।

১৯৩১এ শ্যামবাজারের ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমানে উত্তরা) প্রদর্শিত হ'ল খণ্ড খণ্ড বাঙলা সবাক দৃশ্যাবলী। মনে আছে, এর মধ্যে ছিল গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্রীদের সমবেত কণ্ঠ-সঙ্গীত। এর পরেই ঐ ক্রাউন সিনেমাতেই এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করল অমর চৌধুরি পরিচালিত প্রথম বাঙলা সবাক চিত্র 'জামাইষষ্ঠী'। পর পর এল 'জোরবরাত', 'ঋষির প্রেম' (এই ছবিতেই আমরা প্রথম দেখি বালিকা কাননকে), 'তৃতীয় পক্ষ' ও 'প্রহ্লাদ'। সব কটিই হচ্ছে ম্যাডান থিয়েটারের ছবি।

ইতিমধ্যে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের দ্বিতীয় পুত্র বীরেন্দ্রনাথ, যাঁর ডাক নাম হচ্ছে বুড়ি সরকার—নিজের কন্ট্রাক্টরী ব্যবসা ছেড়ে অমর মল্লিক ও হাফেসজীর (মেট্রো সিনেমার ম্যানেজার) সহায়তায় টালিগঞ্জের চণ্ডী ঘোষ রোডের ওপর গড়ে তুললেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও।

১৯৩১ সালেরই প্রায় বছর শেষে, ৩০এ ডিসেম্বর তারিখে বাঙলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাক চিত্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত 'দেনাপাওনা' (শরৎচন্দ্র লিখিত ঐ নামের উপন্যাস অবলম্বনে) মুক্তি পেল শ্রীসরকার প্রতিষ্ঠিত চিত্রা

চিত্রগৃহে। কিন্তু ঐ বলতেই সবাক ছবি। ছবির পাত্রপাত্রী কথা কইছে, চলছে ফিরছে, ছবিতে কিছু কিছু নাচ গানও আছে ; তবু ছবি শুধু ছবিই, যেন কয়েকটি কাটা কাটা দৃশ্য পর পর জোড়া। না আছে তাতে সাবলীলতা, না আছে গতি, না আছে প্রাণ। এই ধরণের মৃত ছবি দেখতে দেখতে শরীর মন যখন ক্লান্ত, তখন ১৯৩২ এর ২৪এ সেপ্টেম্বর 'চিত্রা' তে মুক্তিলাভ করল দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'চণ্ডীদাস'।

দর্শকরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল গতিশীল, প্রাণচঞ্চল একখানি সত্যিকারের সবাক ছবি দেখে। দেবকী বসু যে চলচ্চিত্র ব্যাপারটা বোঝেন, এর প্রমাণ তিনি আগেই দিয়েছিলেন, যখন বড়ুয়া ফিল্ম ইউনিটের হয়ে তিনি নির্বাক 'অপরাধী' ছবিটি পরিচালনা করেন। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য এই 'অপরাধী' ছবিতেই প্রথম ইলেকট্রিক আলোর সাহায্যে চিত্রগ্রহণ করা হয়। 'চণ্ডীদাস' ছবি দর্শকদের মাতিয়ে তুলল। পথেঘাটে শোনা যেতে লাগল রামী ধোবানীর মুখনিঃসৃত সংলাপ—"চণ্ডীঠাকুর, একি সত্যি ?"

১৯৩৩ সালের নভেম্বরে দেবকীবাবুর দ্বিতীয় বাঙলা সবাক চিত্র 'মীরাবাই' যখন মুক্তিলাভ করল, তখন ওঁর সঙ্গে আমার আলাপটি জ'মে ওঠে। উনি তখন থাকতেন বাগবাজার অঞ্চলের লেবুবাগান লেনে। একদিন কথায় কথায় উনি বললেন, "ছবির প্রতি দেখছি আপনার অসীম আগ্রহ। তা' কি এত লেখাপড়া করছেন ? একটা এম. এ. তো পাশ করেছেন ; আর কেন ? এই বেলা চলে আসুন ফিল্মে, অযথা দেরী করবেন না।" দু'বছরে ঠিকমত তৈরী না হওয়ায় আমি তখন তৃতীয় বছর ইংরাজীতে এম. এ. পড়ছি। পাশটা না দিয়ে ফিল্মে যোগদান করা কি ঠিক হবে, এই প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে আলোড়িত হ'তে থাকল।

এরই মধ্যে একদিন দেবকীবাবু আমাকে শোনালেন, তিনি শীঘ্রই নিউ থিয়েটার্সের হয়ে 'আফ্‌টার দি আর্থকোয়েক' (After the Earthquake) নামে হিন্দী ছবি তৈরী করতে চলেছেন। এর চিত্রনাট্য তৈরী হওয়ার শুরু থেকেই আমি তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে পারি। তবে কাজটা হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক।

মনটা আমার আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে লাগল। চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করা কি উচিত হবে ? তিন চার দিন ধ'রে অনবরত মনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার পরে যোগ দেওয়াই স্থির করলুম এবং সেই কথা দেবকীবাবুকে জানিয়েও দিলুম। ইংরাজীতে এম. এ. পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত দেওয়া হ'ল না।

তখনকার ৭ নম্বর প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের বাড়ীটি 'আফটার দি আর্থকোয়েক'-এর প্রস্তুতিপর্বের জন্যে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। দেবকীবাবু যেদিন যে সময়ে আমাকে সেখানে হাজির হ'তে বলেছিলেন, আমি ঠিক সেই সময়ে হাজির হয়ে দেবকীবাবুর সঙ্গে দেখা করি। কথায় কথায় তিনি আমার কাছ থেকে জেনে নেন যে, আমার একটি পোর্টেবল রেমিংটন টাইপ-

রাইটার আছে। তিনি কথার শেষে আমাকে আদেশ করলেন, আপনি মেশিনটিকে কাল এখানে নিয়ে আসবেন। আমি কাল থেকেই চিত্রনাট্য লেখা শুরু করব। যতটা ক'রে আমি লিখব আপনি ততটা রোজ টাইপ ক'রে ফেলবেন।"

যে-কথা সেই কাজ। পর দিন প্রায় দ্বিপ্রহরে আমি আমার টাইপরাইটারটা নিয়ে গেলুম বাগবাজার অঞ্চলে অবস্থিত আমাদের রামচন্দ্র মিত্র লেনের বাড়ী থেকে টালিগঞ্জের আনওয়ার শাহ্ রোডে ট্রামে চেপে। দেবকীবাবু প্রত্যহ দু'তিন-চার-পাঁচ পাতা ক'রে চিত্রনাট্য লিখে আমার হাতে দেন. আমি সেগুলি দেখে টাইপ করি সযত্নে এবং মূল লেখা সমেত টাইপ-করা কাগজগুলি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি। এই টাইপ করার ফাঁকেই আমি তাঁর চিত্রনাট্য লেখার পদ্ধতিটি বুঝে নিতে চেষ্টা করি।

একদিন হয়েছে কি, একটি শটে তিনি লিখেছেন, ডবল ক্যামেরা অর্থাৎ শট্‌টি দুটি ক্যামেরা দু'টি ভিন্ন অবস্থান বা জায়গা থেকে গ্রহণ করবে। অথচ দু'টি নেগেটিভ তো একসঙ্গে ব্যবহার করা যায় না! কোনও সময় প্রথম ক্যামেরায় গৃহীত নেগেটিভ ব্যবহৃত হবে, কোনও সময়ে দ্বিতীয়টির। ঐ শটে দু'টি চরিত্র ছিল। তার মধ্যে একজন উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে অপর জনের মুখোমুখি দাঁড়াবে। আমি মনে মনে বিবেচনা করলুম, শট্‌টিকে একটি ক্যামেরার সাহায্যেই গ্রহণ করা যায়, দ্বিতীয় ক্যামেরার কোনও প্রয়োজন নেই।

আমি দেবকীবাবুর কাছে জানতে গেলুম, উনি 'ডবল ক্যামেরা ওয়ার্ক" লিখেছেন কেন? উনি ঝটিতি উত্তর দিলেন, "ওসব এখন বুঝবেন না। টাইপ করছেন, টাইপ করুন।"

মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে চ'লে এলুম। বিহারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরেই এই ছবিটির পরিকল্পনা করা হয়; কিন্তু ভূমিকম্পের দৃশ্যাবলী এতে খুব বেশী ছিল না। ভূমিকম্পের ফলশ্রুতি হিসেবে একটি কাহিনী রচনা করেন দেবকীবাবু নিজেই। যাই হোক, হপ্তা তিনেকের মধ্যেই চিত্রনাট্য রচনা শেষ হয়ে গেল। ওরই সঙ্গে শিল্পীদের মহলাও সমানে চলেছিল। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দুর্গাবাঈ খোটে ও পৃথ্বীরাজ। শ্যুটিং যখন শুরু হ'ল, তখন আমার ওপর আদেশ হ'ল—নিয়মিত ভাবে শ্যুটিংয়ে উপস্থিত থাকার।

আমার নিষ্ঠার অভাব ছিল না। স্টুডিওর ভিতরে এবং বাহিরে—সব শ্যুটিংয়েই আমি নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকতুম। শ্যুটিং চলতে চলতে একদিন সেই বিশেষ দৃশ্যটি গৃহীত হ'তে থাকল, যার একটি শট্‌-এ একসঙ্গে দু'টি ক্যামেরায় চিত্রগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া আছে। আমি ঐ শট্‌টি দেখবার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। ক্রমে সেই শট্‌টি নেওয়ার সময় এল।

ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণগোপাল দেবকীবাবুর কাছ থেকে শট্‌টিতে শিল্পী দু'জনের মধ্যে কে কি করবে, তা ধীর ভাবে বুঝে নিলেন। পরে একটি

ক্যামেরাকে ট্রলির ওপর চাপিয়ে আগ্-পিছ্ করে তার কোন্ সময়ে কি অবস্থান হবে, তাই ঠিক ক'রে নিলেন। কিন্তু, কৈ দ্বিতীয় কোনও ক্যামেরাকে তিনি ফ্লোরে আনলেন না। শট্‌টিকে ঠিকমত আলোকিত করবার ব্যবস্থা ক'রে তিনি শ্রীবস্কে বললেন, তিনি তৈরি। দেবকীবাব্ তখন দ্ই শিল্পীকে ঐ শটে তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলেন। তিনি ফিরে দেখে ব'লে উঠলেন, **"But where is the second camera K. G."**

কৃষ্ণগোপাল তখন দেবকীবাব্কে তিনি কি ভাবে শট্‌টি গ্রহণ করতে চান, তা ব্ঝিয়ে ব'লে মতপ্রকাশ করলেন—কাজেই এ শটে দ্বিতীয় ক্যামেরা ব্যবহারের কোনই প্রয়োজন নেই। দেবকীবাব্ কৃষ্ণগোপালের য্ক্তিকে মেনে নিলেন। আমি ভাবল্ম, এ আমারও জয়, কারণ আমিও এই চিন্তাই করেছিল্ম টাইপ করার সময়ে।

'আফটার দি আর্থকোয়েক'-এর কাজ শেষ ক'রেই দেবকীবাব্ পাড়ি দিলেন বোম্বাই 'লাইফ ইজ এ স্টেজ' ছবি করবার জন্যে। আমাকে ব'লে গেলেন, প্রমথেশবাব্কে বলেছিল্ম আপনাকে নেবার জন্যে। কিন্তু উনি বললেন, ওঁর মাইনে-করা অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে এবং উনি বিনা পারিশ্রমিকে কাউকে খাটাতে নারাজ। কাজেই আমি তো কিছ্ করতে পারল্ম না; আপনি নিজের চেষ্টায় দেখ্ন, কত দ্র কি করতে পারেন।

মনটা দ'মে গেল; কিন্তু তাই ব'লে হাল ছাড়ল্ম না। নিউ থিয়েটার্সের অনেকের সঙ্গেই তখন আলাপ হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে দেখল্ম, ঐ প্রতিষ্ঠানে ঢোকানোর ব্যাপারে অমর মল্লিক মশাইয়ের বেশ কিছ্টা হাত আছে। তাই তাঁকেই ধ'রে বসল্ম। তিনি বললেন, এখ্নি কিছ্ হবে না, অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা? সেই অপেক্ষা কত দিনের, কে জানে?

তারিখটা এখনও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে—২৬শে জান্য়ারী, ১৯৩৫। হরেন ঘোষের সঙ্গে কথা কইতে কইতে ভাবছি, পকেট তো গড়ের মাঠ, হরেনদার কাছ থেকে গণ্ডা চারেক পয়সা চেয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরব—ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজার। কিন্তু ম্খ ফ্টে কিছ্তেই ঐ কটা পয়সা চাইতে পারছিল্ম না। তিনি তাঁর ১৪০, কর্পোরেশন স্ট্রীট (বর্তমানে স্রেন বন্দ্যোপাধ্যায় রোড)-এর আস্তানাটি তালাচাবি বন্ধ ক'রে আমাকে নিয়ে ম্যাডান স্ট্রীট ধ'রে ধর্মতলা স্ট্রীটের দিকে এগোতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মতলা স্ট্রীট ও ম্যাডান স্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে ঠেক খেলেন। দ্'চারটে ফালতু কথার পরে হরেনদা সহসা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন, "পশ্পতিবাব্, নিউ সিনেমার দিকে চেয়ে দেখ্ন, ফ্টপাথের ওপর একজন চেস্টারফিল্ড্ পরে, মাথায় বেরে ক্যাপ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি, মনে হচ্ছে, আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান এবং ভদ্রলোক সম্ভবত অমর মল্লিক। আমি চলি।"—ব'লেই হরেনদা একটি রিক্‌শা ডেকে চেপে বসলেন।

সত্যিই হরেনদা চ'লে যাবার পরে ঐ চেস্টারফিল্ড্-পরা ভদ্রলোক ত্বরিত গতিতে এগিয়ে এলেন এবং দেখলুম, সত্যিই তিনি মল্লিকমশাই। তিনি আমাকে বললেন, "পশুপতি, নিউ থিয়েটার্সে তোমার চাকরী হয়েছে। তুমি কাল সকাল নটার সময়ে নিউ সিনেমায় এসে মিঃ সরকারের সঙ্গে দেখা করো।"

আমি, যাকে বলে, একেবারে আনন্দে আত্মহারা। এবং তারই অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ সেই শীতের রাত্রি ১০-৩০ মিনিটের সময় ধর্মতলা থেকে হেঁটে শ্যামবাজারে আমাদের বাড়ি পেঁছুতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হ'ল না।

কলেজ স্কোয়ারের অমর মল্লিক কোন্ সূত্রে এলগিন রোডে বসবাসকারী, ভাইসরয়ের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের মধ্যম পুত্র বীরেন্দ্রনাথ সরকার প্রতিষ্ঠিত নিউ থিয়েটার্সের একজন পদস্থ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন, তার জন্যে সকলেরই কৌতূহল থাকতে পারে। তাই একটু গোড়া থেকেই কথাটা বলতে হচ্ছে।

কলেজ স্কোয়ার বা গোলদীঘির দক্ষিণে অবস্থিত মির্জাপুর স্ট্রীটের (বর্তমানে সূর্য সেন স্ট্রীট) ওপর ছিল সিংহদাস মল্লিকের বাড়ী। তিনি ছিলেন একজন নামকরা বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর। পুত্র অমর মল্লিক স্কুলের লেখাপড়া শেষ করবার পরে বাবার ওই ঠিকাদারী কাজের দেখাশোনা করতে থাকেন। কিন্তু ছেলের এদিকে খুব বেশী ঝোঁক নেই দেখে তিনি বেশ কয়েক হাজার টাকা জামিন স্বরূপ রেখে ছেলেকে সে যুগের বিলাতী ওষুধ কোম্পানী ফ্ল্যাঙ্ক রস-এর ক্যাশিয়ার ক'রে দেন।

বেশ কাজ চলছিল। কিন্তু একদিন কথায় কথায় ওখানকার জনৈক ইংরাজ কর্মচারী বাঙালীদের সম্বন্ধে অপমানজনক কোনও কথা বলায় অমরদাস রুষ্ট হয়ে ও'ঠন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে একটি বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুষি মেরে অকুস্থল ত্যাগ ক'রে চলে আসেন। এরই কিছুকাল পরে সিংহদাস মল্লিক মারা যান। তিনি পুত্র অমরদাসের নামে এক লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। এই টাকাকে সম্বল ক'রে অমরদাস ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

মোটর চালনায় অমরদাস খুব পারদর্শী ছিলেন। হঠাৎ ওঁর মাথায় ঢোকে, উনি লণ্ডনে ট্যাক্সি-ড্রাইভার হবেন। নিয়মিত পরীক্ষা দিয়ে অমরদাস ট্যাক্সি-চালনার লাইসেন্স সংগ্রহ করেন এবং নিজের অর্থে একটি ডি-লুক্স ট্যাক্সি কিনে তাই চালাতে থাকেন।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার গ্লাসগোর বি. এস্-সি হবার পরে কিছুদিন লণ্ডনে থাকেন। এই সময়ে একদিন চ্যারিং ক্রশে তিনি হঠাৎ অমরদাসের ট্যাক্সির আরোহী হন। গন্তব্যস্থানে পেঁছে নেমে যাবার সময়ে তিনি পাউণ্ড নোট দিয়ে ফেরত কয়েক শিলিং না নিয়েই চ'লে যাবার উপক্রম করেন। তখন অমরদাস তাঁকে থামিয়ে বলেন, "সার, আপনার চেঞ্জটা নিয়ে যান।"

মিঃ সরকার ট্যাক্সিচালককে বাঙলায় কথা কইতে শুনে হতচকিত হয়ে

যান এবং স্মিতহাস্যে বলেন, "আপনি বাঙালী? আমি ভেবেছিলুম—" তাঁকে কথা শেষ না করতে দিয়েই অমরদাস বলেন, "নিগ্রো? অনেকেই তা' ভাবেন বটে! কিন্তু আমি খাঁটি বাঙালী, কলকাতার বাসিন্দে।"

মিঃ সরকার কিছুটা সময় ব্যয় ক'রে ওঁর পূর্ব ইতিহাসটি শোনেন এবং বলেন, "কোনও দিন কলকাতায় গেলে সাক্ষাৎ হতে পারে।" অমর মল্লিক তখন ওঁকে ওঁর মির্জাপুরের বাড়ীর ঠিকানা দেন এবং পরিবর্তে মিঃ সরকারের এলগিন রোডের বাড়ীর ঠিকানাটি নেন।

এর পরে বহুদিন কেটে গেছে। অমরদাস ইংলণ্ডের লীলাখেলা শেষ ক'রে কলকাতার মির্জাপুরের বাড়ীতে ফিরে এসেছেন এবং তাঁর ঘরে বিছানায় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনতে গুনতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা ক'রে দিন কাটাচ্ছেন। হঠাৎ একদিন সকালে তাঁর খাস-চাকর গঙ্গা এসে তাঁকে জানাল, একজন কোট-প্যাণ্টুলুন-পরা ফর্সা ভদ্দরলোক মোটরে ক'র এসে তাঁকে খুঁজছেন। অমরদাস নীচে গিয়ে দেখে, মোটরের মধ্যে ব'সে রয়েছেন তাঁর সেই লণ্ডনে দেখা ভদ্রলোক— মিঃ সরকার।

মিঃ সরকার হেয়ার স্ট্রীটে আপিস ক'রে একটি বিল্ডিং কন্ট্রাক্টরের ফার্ম খুলেছেন। তিনি মিঃ মল্লিককে অনুরোধ করতে এসেছেন, যদি অন্য কাজে ব্যাপৃত না থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর ফার্মে যোগ দিতে পারেন। মিঃ মল্লিক এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলেন।

এই কন্ট্রাক্টরী কাজে ব্যাপৃত থাকবার সময়েই বীরেন্দ্রনাথ হরেন ঘোষকে (ইম্প্রেসারিও) তাঁর 'বুকের বোঝা' ছবি তোলবার জন্যে কিছু টাকা ধার দেন। এবং এই সূত্রে বীরেন্দ্রনাথ এবং অমরদাস, দু'জনেই সিনেমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ঠিক এই সময়েই ওঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হন কলা ও বিজ্ঞানে সমান পারদর্শী মিঃ পি. এন. রায়। গ'ড়ে ওঠে মিঃ সরকারের মালিকানায় ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম ক্রাফ্টস্ এবং তৈরী হয় 'চোর কাঁটা' ও 'চাষার মেয়ে' নামে দু'টি নির্বাক ছবি।

অমর মল্লিক শুধুই একজন নিরলস সংগঠনকর্মী ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন সার্থক চরিত্রাভিনেতা। এই উভয় বৃত্তিই পূর্ণবিকাশের সুযোগ আসে, যখন মিঃ সরকার চলচ্চিত্রে শব্দ আমদানি হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম স্টুডিও গড়বার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং অমর মল্লিকের সংগঠনী প্রতিভা তাঁকে টালিগঞ্জে 'নিউ থিয়েটার্স' স্টুডিও গড়ে তুলতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করে। অমর মল্লিক যে নিউ থিয়েটার্সের অন্যতম স্তম্ভ ব'লে বিবেচিত হন, সে শুধু এই কারণে।

পরদিন ২৭শে জানুয়ারী বেলা নটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় নিউ সিনেমায় মিঃ সরকারের বসবার ঘরের দরজায় ঠিক পেঁাছে গেলুম এবং কাঁটায় কাঁটায় নটা বাজতে তাঁর খাস-চাকর, উৎকলবাসী ভগবানের হাত দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে দিলুম। এক মিনিটের মধ্যে আমার ডাক এল। ভিতরে ঢুকে মিঃ সরকারকে নমস্কার করতেই তিনি প্রতি-নমস্কার জানিয়ে

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি স্টুডিও যান নি ?"

"কৈ ? মিঃ মল্লিক তো আমাকে সে-কথা—"

আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই তিনি প্রায় অসহিষ্ণু ভাবে ব'লে উঠলেন, "অমরটা যে কি করে ?—আপনি স্টুডিওয় চ'লে যান।"

"আচ্ছা, স্যার !" ব'লেই দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলুম। মিঃ সরকার আমাকে দাঁড়াতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু বলবেন ?"

আমি একটু ইতস্তত ক'রে বললুম, "স্যার, আমার **appointment letter** ?"

মিঃ সরকার সহাস্যে বললেন, "আমরা কাউকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিই না—যতদিন থিয়েটার্স আছে, ততদিন আপনার চাকরী।"

শুনে আমি বললুম, "থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার !" এবং পরক্ষণেই এসপ্লানেড অভিমুখে রওনা হ'য়ে টালিগঞ্জগামী ট্রাম ধরলুম। নিউ থিয়েটার্স ১ নম্বর স্টুডিওতে পৌঁছে সোজা এক নম্বর ফ্লোরের লাগোয়া যে-দোতলা, পূবমুখী ইমারত আছে, তারই একতলার একেবারে শেষের দক্ষিণে অবস্থিত মল্লিক মশায়ের ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি তাঁর ঘরে নেই। বৃথা এদিক ওদিক না ঘুরে ওঁর ঘরেই অপেক্ষা করতে লাগলুম।

পুরো একঘণ্টা বাদে তিনি তাঁর ঘরে ঢুকলেন এবং আমাকে দেখেই ব'লে উঠলেন, " এই যে পশুপতি, সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছ ?" আমার উত্তর, "তিনিই তো আমাকে সোজা স্টুডিওতে পাঠিয়ে দিলেন।"

তখন মিঃ মল্লিক আমাকে এমন কথা শোনালেন, শুনে আমার মনটা কিছু দ'মে গেল। তিনি বললেন, "দেখ, এখন কিন্তু কোনও মাহিনা পাবে না। তোমাকে দেওয়া হবে ট্রামের একখানি অল-সেক্শন মান্হলী টিকিট। তখন এই টিকিটের দাম ছিল মাত্র দশ টাকা।

এই সময়ে আমি তিনটি প্রাইভেট টিউশনী ক'রে পেতুম মাসে দেড়শো টাকা। এই দেড়শো টাকা আয়ের মায়া কাটিয়ে নিউ থিয়েটার্সের চাকরীটেকেই আঁকড়ে ধরলুম দশ টাকা দামের ট্রামের একটি মান্হলী টিকিটের বিনিময়ে।

দিন দুই পরে স্টুডিওতে পৌঁছুনোমাত্র মল্লিকমশাই আমাকে বললেন, "পশুপতি, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। শরৎবাবুর 'দত্তা'র ফিল্মোপযোগী একটা সিনপ্সিস্ (synopsis) করে দিতে হবে তিন চার পাতার মধ্যে। জিনিসটা কালই চাই ; কারণ পরশু মিঃ সরকার দিল্লী যাচ্ছেন। উনি ওটাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে চান। তুমি চাওতো এখনই বাড়ী চলে যেতে পার।" আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্টুডিও থেকে বেরিয়ে পড়লুম বাড়ী ফিরে আসবার উদ্দেশ্যে। এবং পর দিন বিকেলে মল্লিকমশাইয়ের হাতে একটি চার-পাতার সিনপ্সিস্ দিলুম দত্তা উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপের। মিঃ মল্লিক লেখাটাকে উল্টে দেখে বললেন, "ঠিক আছে। আজ তোমার ছুটি।"

এইভাবে গড়াতে গড়াতে যখন এপ্রিল মাস এসে পড়ল, তখন একদিন

মল্লিকমশাইকে বললুম, "মিঃ মল্লিক, এইবার একটা মাইনের বন্দোবস্ত করুন।" তখনকার মতো "আচ্ছা, দেখছি" বলবার পরের দিনই তিনি বললেন, "এই মাস থেকে তোমার মাইনে ৩০ টাকা; কিন্তু আর ট্রামের মান্থলী টিকিট পাবে না।" অর্থাৎ নিজের পয়সায় ঐ মান্থলী কেনবার পরে মাত্র ২০টি টাকার মুখ দেখতে পাব। মনে মনে বললুম 'তথাস্তু'।

মে মাসের ১১ই রূপবাণী চিত্রগৃহে 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'-এর ট্রেড-শোতে আমরা নিউ থিয়েটার্সের একটি বড় দল গিয়ে হাজির হলুম। আমার নিমন্ত্রণ ছিল অবশ্য 'নাচঘর'-এর তরফ থেকে। ছবি দেখবার পরে কি একটা কাজ সেরে স্টুডিও পৌঁছুতে আমার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। মল্লিক-মশাইয়ের ঘরে ঢোকামাত্র মিঃ বড়ুয়া ব'লে উঠলেন, "এইতো পশুপতি এসে গেছে। আচ্ছা পশুপতি, তুমি বল তো, 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'-এ কাননের অভিনয় অপূর্ব কিনা?"

দড়াম করে প্রশ্নটি আমার দিকে ছোঁড়া হ'লেও আমি মিনিটখানেক সময় নিয়ে বললুম, "তেমন কিছু অপূর্ব বলে মনে হ'ল না।" মিঃ বড়ুয়া তৎক্ষণাৎ টেবিল থেকে কালো গোল রুলারটি তুলে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে ধ'রে বললেন, "এই লাঠিটা আমার মাথায় মার।"

আমি বললুম, "আমার সব কথাটি শুনুন; তারপরে মারতে বলবেন। এই ছবি দেখে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, শ্রীমতী কানন একজন প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী। যদি তাঁকে দিয়ে ঠিকভাবে অভিনয় করানো যায়, তাহলে তিনি অনেকেরই মন জয় করতে পারেন। কিন্তু পরিচালক জ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতা কতটুকু? তিনি কাননের ক্ষমতার পুরো সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি।"

মিঃ বড়ুয়া আমার কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন। বললেন, "হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে একমত।"

"তাহলে আর আপনার মাথা ফাটাবার দরকার নেই তো?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম। ঘরের মধ্যে সবাই হাসির রোল তুললেন।

তখন প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' ছবির শ্যুটিং জোরকদমে চলেছে। ঐ ছবিতে অনেকগুলি চলতি ট্রেনের শট্ আছে। ট্রেনের শট্গুলি সুবিধামত কোন্ কোন্ জায়গায় তোলা যেতে পারে, তা নির্ণয় করবার জন্য যে-দলটিকে পাঠানো হয়, তাতে মিঃ বড়ুয়ার ইচ্ছাক্রমে আমিও ছিলুম। আমি এদিকে কোন্নগর এবং ওদিকে শ্রীরামপুর-এর মাঝামাঝি বেশ কয়েকটি জায়গা নির্বাচন করেছিলুম এবং সেই সব জায়গা দিয়ে ঠিক কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ দিক থেকে কোন্ কোন্ গাড়ী যাবে, তারও একটা তালিকা তৈরী করেছিলুম টাইম-টেবলের সাহায্যে।

মিঃ বড়ুয়া আমার কাছ থেকে ঐ তালিকা পেয়ে খুবই খুশী হয়েছিলেন এবং শ্যুটিংয়ের দিন বিশেষ করে আমাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রথমেই যে জায়গায় আমি দলকে থামতে বলেছিলুম সেখানে মিঃ বড়ুয়া নেমে জায়গাটি

দেখে খুশী হন এবং দু' একটি শট্ গ্রহণ করবার পরে নিজে বিশ্রামের জন্যে স্থান পরিত্যাগ করে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের বিশ্রামস্থলে যাবার সময়ে ক্যামেরা-ম্যান ইউসুফ মুলজীকে বলে যান, পশুপতির নির্দেশমতো শট্গুলো নিও।

এর পরে সব শট্ই আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্যামেরার স্থান পরিবর্তন করে নেওয়া হয়। অবশ্য আমার পরামর্শ মতো একটি শট্ বড়ুয়া সাহেব কিছুতেই নিতে দিলেন না। একটি সরু রাস্তার মাথায় আড়াআড়িভাবে ট্রেনের লাইন চলে গেছে, কিন্তু লাইনের মাঝে কোনও আটক ছিল না। তাই একটি উঁচু টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দুই লাইনের মাঝে যদি একটি আইমো (eyemo) ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়ানো যায়, তাহলে ক্যামেরার দিকে সোজা অগ্রগামী ট্রেনের শট্টি নেওয়া সম্ভব হবে; তারপর ট্রেন কাছাকাছি এসে পড়লে চালু ক্যামেরাকে চলমান ট্রেনের নীচে ধরলে শট্টির মাহাত্ম্য খুবই বেড়ে যাবে। আমি নিজে এই ক্যামেরা ধরতে চেয়েছিলুম। কিন্তু মিঃ বড়ুয়া কিছুতেই এই ঝুঁকি নিতে রাজী হলেন না।

এরই কয়েকদিন বাদে মিঃ মল্লিক আমাকে ডেকে বললেন, "পশুপতি, এখনই তুমি ও বাড়ীতে গিয়ে ছোটাইয়ের সঙ্গে দেখা কর। হয়ত তোমাকে কিছুদিন ওখানেই কাজ করতে হবে।" তখনই ছুটলুম ও-বাড়ীর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ১২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড অভিমুখে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে নিউ থিয়েটার্স—নম্বর ২ স্টুডিওটি। পেঁছেই ছোটাইবাবু অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে দেখা করলুম। কথায় কথায় জানলুম, ও-বাড়ীতে দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'পুরণ ভকত'-এর একটি তামিল সংস্করণ তৈরী হবে; পরিচালনা করবেন দীনেশরঞ্জন দাশ, যিনি একদা 'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

দীনেশবাবুর সঙ্গে আমার আগে থাকতেই আলাপ ছিল। তামিল সংস্করণের চিত্রনাট্যটি কে করেছিলেন, তা আজ আর আমার মনে নেই। মদ্র দেশীয়দের নিয়ে শ্যুটিং শুরু হয়ে গেল এবং এই প্রথম আমি হাতেনাতে সহকারী পরিচালকের কাজ করতে লাগলুম। ক্ল্যাপস্টিক দেওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে কন্টিনিউইটি শীট (continuity sheet) লেখা, প্রতিদিনের শিল্পীদের শ্যুটিংয়ে কি সাজ-পোশাক হবে, কোন্ শটে কোন্ শিল্পী কি সংলাপ বলবে প্রভৃতি সব কাজেরই ভার আমার ওপর এসে পড়ল একটু একটু করে।

এই কাজে আমাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন অভিজ্ঞ সহকারী পরিচালক বংশীচন্দ্র আশ। তিনিই আমায় হাতে ধ'রে শেখান ক্ল্যাপ-স্টিক দেওয়া (একটি শট্ আরম্ভ হবার আগে একটি কালো এক হাত পরিমাণ লম্বা এবং ইঞ্চি তিনেক চওড়া কালো রঙের কাঠের ওপর কোন্ দৃশ্য, কত নম্বর শট্, কত নম্বর টেক তা খড়ি দিয়ে লিখে তাকে চালু ক্যামেরার সামনে ঠিক ভাবে ধরা এবং সেই সঙ্গে ঐ দৃশ্য-শট্-টেক ও ছবির নাম মুখে ঘোষণা করার পরে ঐ কাঠের সঙ্গে একদিকে কব্জা দিয়ে জোড়া আর একটি কাঠকে অপর দিকে

কিছুটা তোলা অবস্থা থেকে ঐ প্রথম কাঠটির ওপর সশব্দে ফেলে দেওয়াকেই এক কথায় ক্ল্যাপ-স্টিক দেওয়া বলে)।

অনভ্যস্ত যে-কেউ এই কাজ প্রথম প্রথম করতে গিয়ে অত্যন্ত নার্ভাস অনুভব করবেন অর্থাৎ ঘাবড়ে যাবেন, এ-কথা হলফ ক'রে বলতে পারি। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলুম না। অবশ্য অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে আমার খুব বেশী দেরী হয়নি। কন্‌টিনিউইটি লেখার হাতেখড়ি দিয়েছিলেন ঐ বংশীবাবুই। যেমন আমি কৃতজ্ঞ ছোটাইদার প্রতি, তিনিই আমাকে প্রথম সহকারী পরিচালক হবার সুযোগ দিয়েছিলেন ব'লে, তেমনই আমি সমান কৃতজ্ঞ বংশীচন্দ্র আশের প্রতি, তিনিই আমাকে হাতে ধরে সহকারী পরিচালকের কাজ শিখিয়েছেন ব'লে। নিজেকে যথার্থই কাজের লোক ক'রে তোলবার জন্যে এবং ঐ সঙ্গে পরিচালনার ব্যাপারটি আয়ত্ত করবার জন্যে আমার চেষ্টার অণুমাত্রও ত্রুটি ছিল না।

ঐ তামিল 'ভক্ত পূর্ণচন্দ্র' ছবিতে নায়ক পূর্ণচন্দ্রের ভূমিকায় ছিলেন মণি (বোধ করি, ডাক নাম) নামে এক যুবক এবং নায়িকা ছিলেন লক্ষ্মী নামে একটি সুগঠিত দেহবিশিষ্ট যুবতী। লক্ষ্মীকে স্নাফ-কুইন (Snuff-queen) বলা হত! কারণ, ওঁর বাবা নাকি একজন বিশিষ্ট নস্য-ব্যবসায়ী ছিলেন। এই লক্ষ্মী ছিলেন অত্যন্ত দুঃসাহসিকা। তিনি অনায়াসে অশ্ব-পৃষ্ঠে পরিখা পার হয়ে যেতে পারতেন। নিউ থিয়েটার্স ১ নম্বর স্টুডিওর দক্ষিণে, যেখানে এখন একটি প্রকাণ্ড টেক্‌নিক্যাল ইনস্টিটিউট দাঁড়িয়ে আছে, সেই জায়গাটা তখন প্রকাণ্ড খোলা মাঠ ছিল। ঐ মাঠের ওপরে লক্ষ্মীর ঘোড়ায় চড়ার অনেক শট্ নেওয়া হয়।

'ভক্ত পূর্ণচন্দ্র'-এর শ্যুটিং শেষ করবার পরে আমি আবার ১ নম্বরে ফিরে আসি। ইতিমধ্যে আমার মাস মাহিনা বেড়ে ৫০ টাকা হয়েছে। তখনও 'নাচঘর' চালু আছে আমার শ্রমদানের ফলে। ১৯৩৫ সালের ৩০-এ মার্চ 'দেবদাস' মুক্তি পায় চিত্রায়। ৩টার প্রদর্শনীতে আমি উপস্থিত ছিলুম অপরাপর চিত্র সাংবাদিকদের সঙ্গে। ইন্টারভ্যাল কাল পর্যন্ত দেখার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমাদের মনে 'দেবদাস' সম্বন্ধে একটি ভালো ধারণা গ'ড়ে উঠল ; মনে হ'ল, ছবিটি ক্রমেই জমে উঠছে। অথচ কাণাঘুষায় শুনেছিলুম, মাত্র গেল কাল সকালে ছবিটি দেখে মিঃ সরকার বলেছিলেন, "রীলগুলোকে নিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসুন।" এবং তারপর স্টুডিওতে ফিরে মিঃ বড়ুয়া নীতীন বসুর সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করবার পরে স্থির করেন কিছু শট্ রি-টেক করতে এবং কিছু নতুন শট্ নিতে।

সেই অনুযায়ী টুক্‌রো টুক্‌রো সেট তৈরী হয় স্টুডিওর দুটি ফ্লোর (এতদিন ২নং ফ্লোরটি গড়ে উঠেছিল) জুড়ে। মিঃ সরকারের কাছে দু'টি কাঁচা নেগেটিভ রীল ব্যবহারের অনুমতি চাওয়ায় তিনি নাকি বলেছিলেন, "কিন্তু সারা ছবিটাতো আবার ক'রে তুলতে পারবেন না (But you can't retake the whole film)।"

যাই হোক, সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সারা রাত্রি ধ'রে নাকি অন্তত ৩২টি শট্ গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য এদের মধ্যে ছিল, সেই বিখ্যাত শট্‌টি, যেখানে বাইরে মৃত্যুপথযাত্রী দেবদাস গরুর গাড়ী চেপে এসে হাজির হয়েছে, আর সেই খবর পেয়ে পার্বতী বিরাট দরজার দিকে ছুটে চলেছে চীৎকার করতে করতে—দেবদা, দেবদা ব'লে। কিন্তু কঠিন সমাজের দরজা তাকে বাইরে যেতে দিল না ; দরজার কাছে পৌঁছুবার আগেই সেটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল ; পার্বতী সেখানে পেঁাছে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

মধ্যান্তরের (বিরতির) সময়ে চিত্র সাংবাদিকদের অনুকূলে মনোভাব নীতীন বসু, অমর মল্লিক প্রভৃতির কাছে ব্যক্ত করতে তাঁরা আমাকে বললেন, কথাটা মিঃ সরকারকে শুনিয়ে আসতে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলুম, 'চিত্রা'র দোতলার সামনের দিকের সেই ঘরটির সামনে, যেখানে বসেছিলেন সরকার সাহেব। "আসতে পারি ?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম পর্দার বাইরে থেকে। তিনি সম্মতি জানাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, তাঁর সামনের টেবিলে অর্ধেক-খাওয়া সিগারেট স্তূপীকৃত হয়ে আছে এবং তিনি স্পষ্টই চিন্তান্বিত মুখে ব'সে আছেন।

আমি তাঁকে বললুম, "ছবিটি সকলেরই ভালো লাগছে।" তিনি আমার দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে বললেন, "But you have not seen the whole picture" (কিন্তু আপনারা তো এখনও সমস্তটা ছবি দেখেননি)। তবু আমি বেশ জোরের সঙ্গেই জবাব দিলুম, "কিন্তু ছবিটি ইতিমধ্যেই জমে উঠেছে।" মিঃ সরকার বললেন, "দেখুন।"

আবার ছবি আরম্ভ হ'ল এবং যখন শেষ হ'ল, তখন প্রেক্ষাগৃহে উল্লাস ; সবাই উচ্ছ্বসিত—দর্শক, চিত্র-সমালোচক, নিউ থিয়েটার্সের কর্মীবৃন্দ। এরই মধ্যে দেখা গেল, যিনি এতক্ষণ অনুপস্থিত ছিলেন, ছবির সৃষ্টিকর্তা সেই প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া তাঁর মোটর চালিয়ে হাজির হয়েছেন আনন্দমুখর জনতার সামনে। সাফল্যের কী অপরূপ দৃশ্য !

কয়েকদিন পরে মিঃ মল্লিক আবার আমাকে আদেশ করলেন, ছোটাইদার সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখি, স্টুডিওর পিছনের মাঠে সতরঞ্চি বিছিয়ে ব'সে আছেন ছোটাইদা ও পুতুলদা (নীতীন বসু)—'বিজয়া'র চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছে। আমাকে স্বাগতম জানিয়ে ছোটাইদা আমার দিকে কাগজ পেন্সিল এগিয়ে দিয়ে বললেন—"লিখুন" অর্থাৎ তাঁরা আলোচনার পরে যা লিখতে বলবেন, তাই লিখতে হবে। মনে মনে 'তথাস্তু' বলে তাঁদের হুকুম তামিল করতে শুরু করে দিলুম। এইভাবে দিন দুই যাবার পরে ছোটাইদা হঠাৎ কথার ফাঁকে বললেন, "কৈ পশুপতিবাবু, আপনি তো কিছু বলছেন না ?" উত্তরে আমি বললুম, "আপনারা আলোচনা করছেন, এর মধ্যে আমি কিছু বললে বেয়াদবি হবে।"

এখানেই ব্যাপারটা থেমে গেল এবং তাঁদের আদেশমত লেখার পরে কয়েকদিনের মধ্যেই চিত্রনাট্য রচনা শেষ হয়ে গেল। এর পর একটা দিনস্থির

করা হ'ল, যে-দিন মিঃ সরকার চিত্রনাট্যটি শ্নবেন। সেই দিনটিতে যখন ছোটাইদা চিত্রনাট্য শোনাচ্ছেন, তখন আমি এবং ছবির নির্বাচিত পরিচালক দীনেশ দাশ উপস্থিত ছিলুম। চিত্রনাট্য শোনবার পরে মিঃ সরকার বললেন, চিত্রনাট্য তাঁর পছন্দ হয়নি। ইংরেজীতে বললেন, "I throw a cold blanket on you ; pleace don't mind." ছোটাইদা যখন বললেন, "আর কি ক'রে লিখতে হয়, তা জানি না ; তুমি নিজেই লিখো তাহলে।"

তখন তিনি বললেন, "দরকার হ'লে তাই লিখতে হবে।" এবং বলেই উঠে গেলেন তাঁর মোটরে চেপে এক নম্বর স্টুডিওর দিকে রওনা হওয়ার জন্য। আমি চট্ করে দীনেশবাবুকে বললুম, আপনি মিঃ সরকারকে গিয়ে বলুন, মাত্র পনেরোটি দিন সময় দিতে, তিনি একটি চিত্রনাট্য তাকে শোনাতে চান। দীনেশদার কথা শুনে সরকার সাহেব বললেন, "তিন তিন বার তো শুনলুম, নয় আর একবার শুনব।"

দীনেশদার সঙ্গে পরামর্শ করলুম, তাঁর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে বসেই চিত্রনাট্য লেখা হবে পরদিন সকাল থেকেই। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে দিনে প্রায় বারো-চোদ্দ ঘণ্টা ধরে লিখে দশ দিনে চিত্রনাট্য লেখা শেষ করলুম। বলা-বাহুল্য, এতে দীনেশদার কোনও অংশ ছিল না। মাত্র দু'টি দৃশ্য লেখা হয়নি। এক, বিজয়ার বাবা মেয়ের নামে কোনও উইল ক'রে গিয়েছিলেন, কিংবা মাত্র কোনও পত্রে অভিমত প্রকাশ ক'রেছিলেন, তাঁর মেয়ের যেন নরেনের সঙ্গে বিবাহ হয়, এই প্রসঙ্গে, এবং দুই, শেষের উজ্জ্বল দৃশ্য। চিত্রনাট্য লেখবার পরে তাকে টাইপ ক'রে বাঙলা সংলাপগুলি তাতে লিখতেই সেই পনেরোর দিন এসে পড়ল। সেদিন দীনেশদা মিঃ সরকারকে জানালেন, তিনি চিত্রনাট্য পড়তে প্রস্তুত। অবশ্য যে-দিন চিত্রনাট্য পড়া হ'ল, সেদিন পড়লুম আমিই।

আমার পড়বার মাঝে ছোটাইদা বরে দুয়েক উঠে যেতে মিঃ সরকার মন্তব্য করলেন, "It seems that somehow Chotai does not like it." (মনে হচ্ছে যে-কোনও কারণেই হোক, ছোটাই এটাকে পছন্দ করছে না)। পড়া শেষ হ'তে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তিনি ব'লে উঠলেন, "আমার পছন্দ হয়েছে ; আপনারা casting and costing (ভূমিকালিপি ও খরচের ব্যাপার) ক'রে আমাকে দিন।" এই ব'লে তিনি মোটর যোগে এক নম্বর স্টুডিওর দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

পরদিন বৈকালের দিকে অনেক দিন বাদে এক নম্বর স্টুডিওতে বেড়াতে গেলুম। গেট দিয়ে ঢুকে সবে কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময়ে কোথা থেকে নীতীন বসু এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর এই হঠাৎ উল্লাসের কারণ জিজ্ঞাসা করবার আগেই আমাকে প্রশ্ন করলেন, "হ্যাঁরে পশু (আমাকে তিনি আদর ক'রে ঐ নামেই ডাকতেন) কাল মিঃ সরকারকে তুই কি সিনারিও (চিত্রনাট্য) শুনিয়েছিস যে, তিনি একেবারে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ? কাল যতক্ষণ তিনি এখানে ছিলেন, ততক্ষণ শুধু তোর সিনারিওর প্রশংসা।

ক্রমাগত বলেছেন, যাও, গিয়ে দেখে এস গে, একটা বাচ্চা ছেলে কি আশ্চর্য সিনারিও লেখবার ক্ষমতা ধরে!"

পুতুলদা যতই বলেন, আমি ততই লজ্জায় লাল হয়ে উঠি। মনে মনে ভাবতে থাকি, মিঃ সরকারের আমার লেখা 'বিজয়া'র সিনারিও যে ভালো লেগেছে, তা' কালই বুঝেছিলুম, কিন্তু তাঁর যে এত ভালো লেগেছে, তা' আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

আমি আর দীনেশদা—দু'জনে মিলে যে আনুমানিক চরিত্রলিপি ও ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করলুম, তা দীনেশদাই মিঃ সরকারের কাছে পেঁাছে দিলেন। কিন্তু তারপরে সব চুপচাপ। স্টুডিওতে যাতায়াত ক'রে দিনগত পাপক্ষয় করি। এরই মধ্যে একদিন এক নম্বর স্টুডিওতে পা দেওয়া মাত্র কোথা থেকে পুতুলদা ছুটে এসে আমাকে বললেন, "পশু, শিগ্‌গির তুই আমার ছবির একটা নাম ক'রে দে, আজই মিঃ সরকারকে বলতে হবে।"

"কিন্তু আপনার ছবির গল্পটা জানলুম না, নাম—" বলতেই পুতুলদা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণ-পুবের লনে গিয়ে বসলেন এবং অতি-সংক্ষেপে গল্পটি আমাকে শুনিয়ে দিলেন। আমি বললুম, অন্তত মিনিট পাঁচেক সময় দিন, তার মধ্যে আমি নাম ব'লে দেব। "আচ্ছা, তাই হবে", ব'লে পুতুলদা, চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে আমি বললুম, "আচ্ছা পুতুলদা, আপনার ফিল্মের নাম 'ভাগ্যচক্র' রাখলে কেমন হয়?"

পুতুলদা ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "কি নাম বল্‌লি? ভাগ্যচক্র।"

"হ্যাঁ—ভাগ্যচক্র", জবাবে বললুম আমি।

"Excellent! খুব সুন্দর নাম—ভাগ্যচক্র-ভাগচক্র", বলতে বলতে তিনি প্রায় নাচতে নাচতে চ'লে গেলেন। নীতীন বসুর 'ভাগ্যচক্র' ছবি সে যুগে হয়েছিল [১৯৩৫] একটি super-hit picture (অসাধারণ আর্থিক সাফল্যমণ্ডিত ছবি)।

প্রায় মাসখানেক বাদে দীনেশদাকে মিঃ সরকার বললেন, "দেখুন আপনাদের ছবিটা ছোটায়ের অধীনেই তৈরী হবে; তাই আপনাদের সিনারিওতে যেটুকু পরিবর্তন করতে চায়, সেটাকে মেনে নিতেই হবে। আপনারা ওর সঙ্গে কথা কন।" অগত্যা! ছোটাইদারই গোড়ে গোড় দিতে হ'ল। তাঁর মতানুযায়ী আমরা চলতে বাধ্য। আবার বসলুম তাঁর সঙ্গে কাগজ পেন্সিল নিয়ে এবং মাসখানেক চলল এই কাজ। এ-ব্যাপারে দীনেশদা নিরঙ্কুশ—তিনি অন্যত্র বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছেন। যে চিত্রনাট্য ছোটাইদা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তৈরী করলেন, আজ প্রকাশ্যভাবে বলছি, সেটা হ'ল শিবের জায়গায় বানর। কিন্তু ঐ চিত্রনাট্য ধ'রেই ছবি তৈরী হ'ল।

আমি ছোটাইদার সঙ্গে বসে যখন তাঁর নির্দেশমতো চিত্রনাট্য লিখছি, তখন বাড়ীতে আমি আর একটি গুরুতর কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছিলুম। নাট্যনিকেতনের স্বত্বাধিকারী প্রবোধচন্দ্র গুহের আদেশক্রমে আমি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করবার কাজে হাত দিয়েছিলুম।

রোজ একটি ক'রে দৃশ্য লিখি, আর পরদিন সকালে তা প্রবোধবাবুর হাতে পৌঁছে দিই। এইভাবে উপরিউপরি চোদ্দ দিনে চোদ্দটি দৃশ্যে আমি 'গোরা'র নাটকীকরণ সমাপ্ত করি।

প্রবোধবাবু আমার লেখা ফুল্‌স্‌ক্যাপ কাগজগুলিকে একটি খেরো দিয়ে বাঁধিয়ে লম্বা খাতায় পরিণত করেন। নাট্যরূপটি তাঁকে প্রচুর খুশী করে। দিন দুই বাদে তিনি বলেন, "পশুপতি, তোমাকে শান্তিনিকেতনে যেতে হবে কবিকে নাটকটি প'ড়ে শোনাতে।" আরও দু'দিন পরে বললেন, "কবি বলেছেন, তাঁর ওখানে হয়ত আমাদের কয়েকদিন থাকতে হ'তে পারে ; কারণ তিনি শুনবেন, আলোচনা করবেন বারংবার।" এর পরে স্থির হ'ল একটা শনিবারে সেখানে যাওয়া।

কিন্তু না, আমার যাওয়া হ'ল না। যে শনিবারে যাওয়া স্থির হয়েছিল, তার আগের মঙ্গলবারে দু'নম্বর স্টুডিওর মাঠে ব'সে কিছু লেখার কাজ করতে করতেই আমার তেড়ে জ্বর এল এবং সেই সঙ্গে অণ্ডকোষে দারুণ ব্যথা। সঙ্গীত-পরিচালক তিমিরবরণ যখন তাঁর মোটর চালিয়ে আমাকে বাড়ীতে পৌঁছুলেন, তখন আমি জ্বরে প্রায় অজ্ঞান। প্রথমে আমার বাল্য সহপাঠী, বন্ধু-ডাক্তার ফণীন্দ্রনাথ বসু আমাকে পরীক্ষা করে কিছু ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করলেন।

তারপরে এলেন সে যুগের বিখ্যাত সার্জন, ক্যাপ্টেন সুবোধ দত্ত। তিনি আমাকে পরীক্ষা ক'রেই উপদেশ দিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজে (বর্তমানে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) ভর্তি করার জন্যে। তাঁর কথামতই কাজ হ'ল এবং ভর্তির প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তিনি আমার দেহে অস্ত্রোপচার করলেন। পুরো পঁয়ত্রিশ দিন হাসপাতালে থাকবার পরে আমি সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরি। দেখলুম, ইতিমধ্যেই 'গোরা' নাটক নাট্য-নিকেতনে অভিনীত হবে ব'লে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন প'ড়ে গেছে এবং ঘোষিত হয়েছে তার নাট্যরূপদাতা হচ্ছেন নরেশচন্দ্র মিত্র। আমি বরাবরই জানি এবং আবার ক'রে জানলুম, মানুষের ভাগ্য ছাড়া পথ নেই।

এ-দিকে দু'নম্বর স্টুডিওতে 'বিজয়া'রও শ্যুটিং শুরু হয়ে গেছে। চিত্রনাট্য ও কন্‌টিনিউইটি শীট দেখে বুঝলুম, খুব বেশী অগ্রসর হ'তে পারেনি ছবির শ্যুটিং। আমি পুর্ণোদ্যমে সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিলুম। এই শ্যুটিংয়ের সর্বময় কর্তা হচ্ছেন ছোটাইদা, যাঁর ভালো নাম যতীন্দ্রনাথ মিত্র। দু'চার দিনের মধ্যেই দেখলুম, ছবিতে যাঁর নাম থাকবে পরিচালক ব'লে, সেই দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, যেমন তিনি ছিলেন ছবির চিত্রনাট্য লেখবার সময়েও। ক্রমে এও দেখলুম, ছবির নায়ক, নায়িকা থেকে আরম্ভ ক'রে চরিত্রাভিনেতা পর্যন্ত সবাইকে সংলাপ পড়াবার ভার আমার ওপর এসে পড়ল।

এ-ব্যাপারে ছবির নায়িকা, বিজয়ার ভূমিকায় চন্দ্রাবতী শুরু করলেন এক নতুন খেলা। একটি শট্‌ নেবার জন্যে যখন সকল প্রস্তুতি, সমাপ্ত, ক্যামেরা-

ম্যান আদেশ দিতে যাবেন "all lights" ব'লে সব আলো জ্বালাবার জন্যে, ঠিক তখনি চন্দ্রাবতী ব'লে উঠলেন, "পশুপতিবাবু একবার আমার কাছে আসুন না।" শুনে আমি ক্ল্যাপস্টিক ফেলে তাঁর কাছে গেলেই তিনি বললেন, "ডায়ালোগটা একবার বলুন না।" সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই শটে তাঁর যে ডায়ালোগ, সেটি যথাযথভাবে ব'লে দিলুম।

এই রকম পর পর প্রতি শটেই তিনি একেবারে শেষ মুহূর্তে সংলাপটি আমার মুখ থেকে শুনতে চাইলেন। ফলে, তিন চারটি শটের পরে ছোটাইদার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি চেঁচিয়েই বললেন, "চন্দ্রা, এটা হচ্ছে কি?" সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রাবতী বেশ দৃঢ়ভাবেই বললেন, "একেবারে শেষ মুহূর্তে আমি পশুপতিবাবুর মুখ থেকে আমার ডায়ালোগটা শুনে নিতে চাই। একটু নয় আলো জ্বললই।"

এর পরে আর কথা চলে না। বিজয়া ছবির যতদিন শ্যুটিং চলেছিল, ততদিন শ্রীমতী চন্দ্রা তাঁর এই ধারা বজায় রেখেছিলেন। শ্যুটিং শেষ হয়ে সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হবার পরে দেখা গেল ছবিটি ১১,০০০ ফুটের বেশী দীর্ঘ নয়; কাজেই ওর সঙ্গে একটি দু-রীলার অন্তত সংযুক্ত হওয়া চাই। অথচ ছবির মুক্তিলাভের দিন বিজ্ঞাপিত হয়ে গেছে এবং সেটি আর মাত্র দু'দিন পরেই (২২-এ অক্টোবর, ১৯৩৬)।

ছোটাইদা আর আমি দু'জনে মিলে এক ছোট্ট গল্প খাড়া করলুম এক যুবকের ঘুমের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে নাক ডাকাকে ঘিরে। কেষ্ট দাস নামে এক শিল্পী এই ভূমিকাটি করেছিল। এ-দিকে চিত্রনাট্য লেখা চলছে, ও-দিকে সেট তৈরীর কাজ। দেখতে দেখতে চার-পাঁচজন শিল্পীকেও যথাযোগ্যভাবে সাজানো হ'ল। বেলা ১১টা নাগাদ শ্যুটিং শুরু হ'ল এবং একটানা চব্বিশ ঘণ্টা কাজ ক'রে টাইটেল নেওয়া, সঙ্গীত নেওয়া প্রভৃতি সমাপ্ত করে স্টুডিও ফ্লোর থেকে আমরা বেরুলুম পরদিন ন'টা নাগাদ। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী গিয়ে স্নান এবং আহার সেরে আবার সম্পাদকের টেবিলে হাজির হলুম বেলা তিনটে নাগাদ।

যাদুকর-সম্পাদক সুবোধ মিত্র (কচিবাবু, যিনি 'রাইকমল', 'গৃহদাহ' প্রভৃতি ছবি পরিচালনা ক'রে যশস্বী হয়েছেন) আমারই অপেক্ষায় ছিলেন। দু'জনে মিলে দু'-আড়াই ঘণ্টার মধ্যে সম্পাদনা শেষ ক'রে দেখলুম, ছবিটি প্রায় দু'রীলের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। এই ছবিটি 'মন্দ কি?' (নামটি আমারই দেওয়া) নামে প্রথমে দেখানো হবার পরে আসল ছবি 'বিজয়া' দেখানো হয়। এই 'বিজয়া' ছবি দেখানোর আগে হপ্তা দুই ধ'রে ছবির যে-ট্রেলার দেখানো হয়, তাতে স্বয়ং শরৎচন্দ্রকে দেখা গিয়েছিল। চেয়ারে ব'সে তিনি বলেছিলেন, নিউ থিয়েটার্সের হাতে 'বিজয়া' গল্পটি পূর্ণ মর্যাদা পাবে, এ-বিশ্বাস তাঁর আছে।

ছবিটি দর্শকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। চন্দ্রাবতী (বিজয়া), পাহাড়ী সান্যাল (নরেন), অমর মল্লিক (রাসবিহারী) এবং

শ্যাম লাহা (বিলাস)কে দর্শকরা খুবই পছন্দ করেছিলেন। তবে ছবির কাহিনীর বিস্তার ও পরিস্থিতি রচনা সব জায়গায় তাঁদের মনোমত হয়নি।

'বিজয়া'র যখন শ্যুটিং চলছিল, তখনই কোনও এক মাস থেকে আমার মাস-মাহিনা ৫০ টাকা থেকে হয়ে গেল ১০৫ টাকা। মনে আছে, প্রথম যে মাসে খাম খুলে নোট গুণে দেখলুম মোট টাকা দাঁড়াচ্ছে ১০৫, তখন কিছুতেই স্থির করতে পারি না ঐ টাকা এক মাসের মাইনে, না দেড় মাসের মাইনে? কিছুতেই সাব্যস্ত করতে না পেরে পায়ে পায়ে ছোটাইদার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, কারণ তাঁর হাত থেকেই ঐ খামটি পেয়েছিলুম। তিনি আমার দিকে মুখ তুলতে জিজ্ঞেস করেছিলুম ঐ টাকাটা কি হিসেবে আমাকে দেওয়া হয়েছে। উনি স্মিতহাস্যে যখন জবাব দিলেন, "আপনার এক মাসের মাইনে", তখন তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম; আমার মনে আনন্দ আর ধরে না।

'বিজয়া'র মুক্তির পর এ-বাড়ী, ও-বাড়ী, দু' স্টুডিওতেই যাতায়াত করি; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করি না। দু' স্টুডিওতেই জোর শ্যুটিং চালিয়েছেন প্রমথেশ বড়ুয়া ও নীতীন বসু তাঁদের 'মায়া' ও 'দিদি' ছবির। 'মায়া' একখানি ভালো ছবি হ'লেও খুব বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু নীতীন বসুর 'দিদি' কাহিনীর নূতনত্বে, পরিপাটি দৃশ্যপটে এবং চন্দ্রাবতী, লীলা দেশাই (এই প্রথম তাঁর চিত্রাবতরণ), সাইগল ও দুর্গাদাসের অভিনয়ে দর্শকদের একেবারে সম্মোহিত ক'রে তুলেছিল।

ইতিমধ্যে প্রমথেশ বড়ুয়া শ্রীমতী কাননকে নায়িকা করে তুলতে শুরু করেছেন 'মুক্তি'। স্যাপারের 'এ ম্যান হু কুড নট্ গেট ড্রাঙ্ক' এবং আর একটি গল্পকে মিলিয়ে মিশিয়ে এই 'মুক্তি' ছবির কাহিনী রচিত। আগেই জানিয়েছি, রাধা ফিল্মস্ প্রযোজিত ও জ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'মানময়ী গার্লস স্কুল' দেখে মিঃ বড়ুয়ার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সেই প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি হচ্ছে শ্রীমতী কাননের নিউ থিয়েটার্সে যোগদান এবং প্রথমেই মিঃ বড়ুয়ার 'মুক্তি' ছবির মাধ্যমে তাঁর আত্মপ্রকাশ।

এই 'মুক্তি' ছবিতে পঙ্কজকুমার মল্লিক স্বাধীনভাবে সঙ্গীত পরিচালনা করবার সুযোগ লাভ করেন এবং বিমল রায় স্বাধীন ক্যামেরাম্যান হন। এই ছবিতে পঙ্কজ মল্লিকের একটি ভূমিকাতেও আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৩৭ সালের ৩রা অক্টোবর মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে 'মুক্তি' দর্শক মনকে এর বিভিন্ন গানের দোলায় যেমন দুলিয়ে দিল, তেমনই কাহিনীর বৈচিত্র্য এবং অভিনয়ের নূতন দিগ্‌দর্শন তাঁদের একযোগে বিস্মিত ও মুগ্ধ করল। আসামের বহির্দৃশ্যগুলি দর্শকচক্ষুতে দিল মায়াকাজলের প্রলেপ।

ইতিমধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী হয়ে 'সোনার সংসার' তৈরী ক'রে দর্শকদের হাসি-কান্নার নবতর মিশ্রণে অভিভূত করবার পরে দেবকীকুমার বসু আবার নিউ থিয়েটার্সে ফিরে এসেছেন এবং 'বিদ্যাপতি'র স্বর্গীয় প্রেম-

বিরহ কথা নিয়ে বিরাট ছবি তৈরী করতে শুরু করেছেন। পাইকপাড়া রাজবাড়ীর বিরাট ঝিলে নেওয়া হ'ল 'মধুরং মধুরং' গান প্রকাণ্ড ময়ূরপংখী নৌকা সহযোগে। দু'নম্বর স্টুডিওতে সারা ফ্লোর জুড়ে রাজসভার সেট। শিল্পী সমন্বয়ও বড় কম নয়। 'দিদি', 'ভাগ্যচক্র' প্রভৃতির মত এ ছবিও একই সঙ্গে বাঙলা ও হিন্দীতে তোলা হ'তে থাকল। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃথ্বীরাজ কাপুর), পাহাড়ী সান্যাল (নাম-ভূমিকায়), কানন দেবী, ছায়া দেবী, লীলা দেশাই (মাত্র একটি নাচের দৃশ্যে) এবং অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের সমন্বয়ে গঠিত শিল্পীদের নিয়ে 'বিদ্যাপতি' যখন সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করল ১৯৩৮-এর ২রা এপ্রিল, তখন দর্শকমহল সে কি উত্তেজনা!

শ্রীমতী কাননের মুখের 'তব রথ-চক্রতলে প্রাণ দিব আমি' উক্তিকে দর্শকরা যেমন উপভোগ করেছে তেমনই উপভোগ করেছে একটি পাশ্ব'-চরিত্রে অবতীর্ণ অমর মল্লিকের মুখের "ইচ্ছে করে হারিয়ে গেছে"। "অঙ্গনে আওব যব রসিযা, পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া" গানকে উপযোগী চাহনি এবং অঙ্গভঙ্গী সহকারে গেয়ে শ্রীমতী কানন গানখানিকে কি প্রাণবন্তই না ক'রে তুলেছিলেন! 'বিদ্যাপতি' নিঃসন্দেহে দেবকীকুমার বসুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এদিকে 'গুড আর্থ' দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নীতীন বসু তুলতে শুরু করলেন চাষ-আবাদের পটভূমিকায় একটি ছবি, শেষ পর্যন্ত যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'দেশের মাটি'। এই ছবিতে একই সঙ্গে অবতীর্ণ হন দুর্গাদাস ও সাইগল (এঁরা 'দিদি' ছবিতেও একসঙ্গে নেমেছিলেন) এবং উমাশশী ও চন্দ্রাবতী। উমাশশীর মুখের গান 'নূতনের স্বপন দেখি বারে বারে' আজও কানে লেগে রয়েছে।

ছবিটি সম্বন্ধে একটি কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য। চাষ-আবাদের বিষয়-বস্তু নিয়ে যে-কাহিনী, তাতে বহির্দৃশ্য একটি বিরাট অংশ জুড়ে থাকবে, এ-কথা কাউকে বলে দিতে হবে না। এর জন্য উত্তর ২৪ পরগণার রাজারহাট-বিষ্ণুপুর অঞ্চলে একটি প্রকাণ্ড জমি ইজারা নেওয়া হয়। ছবির একটি প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, ছোট ছোট জমিতে আলাদা আলাদা ভাবে চাষ করার চেয়ে পাশাপাশি সকল জমি একসঙ্গে মিলিয়ে ট্র্যাক্টারের সাহায্যে চাষ করলে ফসলও প্রায় দ্বিগুণ পাওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মেহনত এবং খরচও কম পড়ে।

এরই জন্যে ঐ বিরাট ভূখণ্ডে ট্রাক্টারের সাহায্যে জমিতে চাষও করা হয় এবং বেশ কিছুদিন ধ'রে শ্যুটিংও চলে। কিন্তু পরে দেখা গেল, পুতুলদা ঐ শ্যুটিংয়ের নেগেটিভে আদৌ খুশী নন। তখন 'মাঠ'কে স্টুডিওর মধ্যে নিয়ে আসা হয়, নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরকে ধানক্ষেতে পরিণত করা হয়। ছবিতে ঐ আসল ভূখণ্ডের মাত্র ট্র্যাক্টারের শট্গুলি—সর্বসমেত তিন কি চারটি রাখা হয়েছে। বাকী সবই স্টুডিও অভ্যন্তরে গৃহীত 'বহির্দৃশ্য'। ঐখানেই অমর মল্লিক চেঁচিয়ে বলেছিলেন, "ষষ্ঠে, কত হাওয়া খাবি খা।"

হঠাৎ একদিন নিউ থিয়েটার্সে উদয় হলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি.)। কয়েকদিন বাদেই শুনলুম তিনি একখানি ছোট হাসির ছবি তৈরী করতে চান। গল্প তৈরী হ'ল এবং মূলত আমিই তার চিত্রনাট্য লিখলুম। শুধু তাই নয়, এই একমাত্র ছবিতে নায়কের একজোড়া বন্ধুর মধ্যে একজনের ভূমিকায় আমি অভিনয় করি। ছবির 'অচিন প্রিয়া' নামও আমারই দেওয়া। আজ আর মনে নেই, এই তিন বা চার রীলার ছবিতে দর্শকমনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এক নম্বর স্টুডিওতে তখন ফণী মজুমদার মিঃ বড়ুয়ার একমাত্র বিশ্বস্ত সহকারীর ভূমিকা থেকে স্বাধীনভাবে পরিচালনার কার্যে ব্রতী হন এবং কানন ও সাইগলকে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় একেবারে পথে নামান—পথে পথে ঘুরে গান গেয়ে ভিক্ষে করে, এমন দু'টি ভূমিকায়।

'সাথী' ছবিটি নাচে গানে ভরপুর এবং সেইজন্যে প্রচুর জনপ্রিয়তাও অর্জন করে। মিঃ বড়ুয়া নিজে তৈরী করেন 'অধিকার'—সমাজবৈষম্যকে দূর ক'রে মানুষকে সাম্যের ডাক দেওয়ার প্রথম ছবি। শেষ দৃশ্যে সেখানে নীচু থেকে ক্রমে ওপরে উঠতে উঠতে মেনকা পিছন ফিরে দেখে মিঃ বড়ুয়া অনেক পিছনে প'ড়ে গেছেন এবং তাই দেখে ডাক দেয়—'আয়না' ব'লে, তখন দর্শকের মন সাম্যের জয়গানে অভিভূত। এই ছবিতে আমরা শুনেছি পংকজ মল্লিকের মুখে সেই অবিস্মরণীয় গান—"এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়।"

'অচিন প্রিয়া'র অভিনয় করবার পরেই আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি শরৎচন্দ্র লিখিত 'বড়দিদি' থেকে চিত্রনাট্য তৈরীর কাজে। এর পরিচালক অমর মল্লিক আমার হাতে দেন আর একখানি চিত্রনাট্য এবং বলেন, "এর থেকে দরকার মত তুমি চরিত্র ও দৃশ্য নিতে পার।" ঐ চিত্রনাট্য কার জিজ্ঞেস করতে তিনি কিন্তু সোজা ব'লে দিলেন, "সে খবর তোমার জানবার দরকার নেই।" আমিও আর উচ্চ-বাচ্য না করে নিজের কাজে মন দিলুম এবং মাসখানেকের মধ্যেই লেখাটি সমাপ্ত করলুম ; যে চিত্রনাট্যটি হাতে পেয়েছিলুম, তার থেকে দুই চাকর-ঝির চরিত্র,—নিমু ও বিন্দুকে আমি ব্যবহার করেছিলুম প্রয়োজনমত, কিছুটা হাল্কা হাসির খোরাক হিসাবে।

দিন স্থির হ'লে মিঃ সরকারের চিত্রনাট্যটি শোনবার জন্য। স্থান—অমর মল্লিক মশাইয়ের ঘর (উনি ইতিমধ্যে একতলার ঘরখানি ছেড়ে তারই ঠিক ওপরে দোতলার ঘরে চলে গেছেন)। ভার পড়ল আমারই ওপর পড়বার। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে রয়েছেন মিঃ সরকার ছাড়াও দেবকীকুমার বসু (আমার ঠিক ডান পাশটিতে তিনি বসেছিলেন), পি. এন্. রায় (প্রমোদনাথ রায়, নিউ থিয়েটার্সের তদানীন্তন প্রোডাকসান চীফ) এবং আরও জন দু'তিন। অমর মল্লিক, যতদূর মনে পড়ে, বসেন নি, সারাক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। আলপিন পড়লে আওয়াজ হয়, এমন নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি একটানা চিত্রনাট্যটি পড়ে গেলুম।

আমি থামা মাত্র দেবকীবাবু আমার দিকে ফিরে ব'লে উঠলেন, "পশুপতিবাবু, ওটা করবেন না।" জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি আরও খোলসা ক'রে বললেন, "ঐ যে মাধবীর মৃত স্বামীর ফোটোটা—।" তাঁর কথা শেষ হ'তে না হ'তে মিঃ সরকার ব'লে উঠলেন, "বলেন কী দেবকী-বাবু ? ঐটে তো brightest point in the scenaries (চিত্রনাট্যের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ)—আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে ঐ জায়গাটা।"

ব্যাপারটা খুলে বলি। শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'র প্রধানা চরিত্র মাধবী হচ্ছে একজন বালবিধবা। তাদের বাড়ীতে হঠাৎ এসে হাজির হ'ল সুরেন্দ্রনাথ নামে একটি যুবক, যে অত্যন্ত সাদাসিধে এবং আনমনা। তাকে মাধবীর ছোট বোন প্রমীলার শিক্ষক হিসেবে বাড়ীতে ঠাঁই দেওয়া হ'ল। সে নিজেও পড়াশুনা করে, এমনকি অধিক রাত্রি পর্যন্ত আলো জেলে। অপচয় বন্ধ করবার জন্যে মাধবী চাকরদের আদেশ দিল, রাত্রি দশটার মধ্যে আলো নিভিয়ে দিতে। সুরেনের কিন্তু পড়া চাই। সে বাড়ীর সামনে রাস্তার আলোর সাহায্যে পড়া শুরু ক'রে দিল !

একদিন এটা মাধবীর নজরে পড়ল। অমনি তার মন ব'লে উঠল, "আহা বেচারী !" সে চাকরকে আদেশ করল, "মাস্টারমশাইকে ভিতরে আসতে বলো, আর আলো জেলে দাও।" বলার পরই মাধবীর মনটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল : সুরেনের প্রতি তার মনের এই সহানুভূতি ?— মাধবীর মনে দ্বন্দ্ব জাগল—মর্মের সত্য সত্য, না সামাজিক সংস্কারের সত্য সত্য ?—সে ছুটল তার মৃত স্বামীর ফোটোর কাছে ; আবেগভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—বলো, তুমি বলো, আমি কি অন্যায় করেছি ? সে সান্ত্বনা পেতে তার পরলোকগত স্বামীর কাছ থেকে আশ্বস্ত হতে চাইল, তার মৃত স্বামী তার কাজকে সমর্থন করেছেন জেনে।

মিঃ সরকার চিত্রনাট্য সম্বন্ধে কোনও রকম আলোচনাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "কাস্টিং (ভূমিকালিপি) কি হবে ?" এইবার মল্লিকমশাই মুখ খুললেন। তিনি বললেন, "মাধবীর ভূমিকার জন্যে মলিনাকে নেব।" সরকার সাহেব মল্লিকমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "অ্যাঁ, মলিনা ? আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর সুরেন ? এ রোল (ভূমিকা) করবার জন্যে দুর্গাদাস ছাড়া লোক নেই ?" আমি ব'লে উঠলুম, "না, স্যার, দুর্গাদাস নয়, পাহাড়ী।"

সাহেব স্মিত হাস্যে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, "পাহাড়ী ? পাহাড়ী এই অ্যাক্টিং পারবে ? এ রীতিমত অ্যাক্টিং। এ আর 'ভাগ্যচক্র'-এর টাই দুলিয়ে গান নয়, এ দুর্গা ছাড়া আর কেউ পারবে না।"

আমি প্রতিবাদ ক'রে বললুম, "না, স্যার, দুর্গাবাবু একেবারে মেলো-ড্রামাটিক অ্যাক্টিং ক'রে ফেলবেন, চরিত্রটিই মাটি হয়ে যাবে। এটাতে অ্যাক্টিং চলবে না, এখানে চাই to be the role, ভূমিকার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ী যে-ভাবে কথাবার্তা কয়, সেইভাবেই বলবে। ওকে দু'চারটে mannerism, বলতে পারেন মুদ্রাদোষ, শিখিয়ে দিলেই ও জ্যান্ত সুরেন্দ্রনাথ

হয়ে পড়বে। দুর্গাদাসকে যদি এই ভূমিকায় নেওয়া হয় তাহলে আমি এতে নেই—I wash off my hanqs।"

মিঃ সরকার স্থির হয়ে আমার কথাগুলি শুনলেন; তারপর মল্লিক-মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই কি বলিস্, অমূরা?" মল্লিকমশাই বললেন, "পশু গোড়া থেকেই ধ'রে আছে পাহাড়ীকে; ওর কথাগুলোও যুক্তিপূর্ণ।"

"তাহলে তাই হোক" বলে সরকার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। সে-রাত্রের মত ঐখানেই যবনিকা পড়ল।

এর পরে শুনলুম, যে-চিত্রনাট্যটি মল্লিকমশাই আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সেটি স্বয়ং দেবকীবাবুর রচনা এবং মিঃ সরকার সেটিকে শোনার পরে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন। আরে বাপ্রে! ওটা দেবকীবাবুর লেখা জানতে পারলে কে 'বড়দিদি'র চিত্রনাট্য লেখবার জন্যে কলম ধরত? সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি, যে-টুকু চিত্রনাট্য লিখতে শিখেছি, তা ঐ দেবকীবাবুর কাছ থেকেই, After the Earthquake-এর চিত্রনাট্যটি টাইপ করার সময়ে। চিত্রজগতে উনিই আমার একমাত্র গুরু।

আমার অন্তরে খুবই বাসনা ছিল, মাধবীর ভূমিকাটি উমাশশীকে দেওয়া হোক। নিষিদ্ধ প্রেমের ভূমিকাভিনয়ে তিনি আশ্চর্যভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। তাঁর কণ্ঠ এই ধরণের ভূমিকায় যেমন উপযুক্ত, তেমনই তাঁর চোখ দু'টি যেন কথা কয়। অলস দ্বিপ্রহর কাটাবার জন্যে তিনি দু'চার দিন মাধবীর ভূমিকাটিতে মহলাও দেন। কিন্তু মল্লিকমশাইয়ের অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী ছিলেন মলিনা। তিনি মলিনাকে ভূমিকাটি দেওয়ার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁকে টলাতে পারলুম না। মলিনা ঐকান্তিকতার সঙ্গে আমার কাছ থেকে পাঠ নিতে থাকলেন। তাঁর একাগ্রতা ও নিষ্ঠা দেখবার মত।

শিগ্গিরই 'বড়দিদি'র শ্যুটিং শুরু হয়ে গেল। ছবিটি বাঙলা ও হিন্দীতে একই সঙ্গে হ'তে লাগল। দিন সাত-আট শ্যুটিং হবার পরে সেই সেটটি পড়ল, যেখানে একটি ঘরে সুরেন প্রমীলাকে পড়ায়, আর পাশের ঘরে দরজার কাছে, পর্দার পিছনে দাঁড়িয়ে মাধবী তার পড়ানো শোনে; শুধু তাই নয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে সুরেন্দ্রনাথের আর্জি'ও শোনে। একদিন প্রমীলা সম্বন্ধে মাধবী সুরেনকে কিছু বলেছে, কিছুটা রুষ্টভাবে, অমনই পাগল সুরেন্দ্রনাথ তার নিজের সম্বন্ধে আর্জি পেশ করতে শুরু করল।

সংলাপটি কিছু দীর্ঘায়ত এবং সুরেন-বেশী পাহাড়ীকে সমস্ত সংলাপটি একসঙ্গে বলতে হবে। কিন্তু সে কিছুতেই সমস্ত সংলাপটিকে একসঙ্গে বলতে পারছে না, ভুল হয়ে যাচ্ছে। সে জানে, তার মুখের সংলাপের মাঝের কিছুটা অংশ উৎকর্ণ মাধবীর ছবির ওপরে যাবে। তাই সে আমাকে ধ'রে বসল, সংলাপটিকে তিনটি টুক্রো ক'রে তিনটি বারে গ্রহণ করতে। আমার কথা, তা'হলে ভাবালুতা নষ্ট হয়ে যাবে; সংলাপটি একসঙ্গেই সমস্তটা বলতে হবে।

পাহাড়ী রীতিমত ক্ষেপে গেল। সে বললে, "আমি পারব না ; অন্য কোনও লোককে দিয়ে সুরেনের ভূমিকা করাও" এবং ব'লেই ফ্লোর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমি ওর একটু পরেই বাইরে বেরিয়ে দেখি, ও ফ্লোরের সামনে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে। আমি ফ্লোরের কাছাকাছি ছায়াতে একটি চেয়ার পেতে দিয়ে বললুম, "এইখানে বস।" আমার মুখের পানে প্রায় রাগত ভাবে তাকিয়েও চেয়ারে বসল। আমি একটা ডাব আনিয়ে ওকে খেতে দিলুম। ও তাও খেল। তারপরে ওকে আমি খানিকটা একা থাকতে দিয়ে চ'লে গেলুম। খানিকবাদে ঘুরে গিয়ে বললুম, "আমি সংলাপটা বলছি, তুমি মন দিয়ে শোন।"

পাহাড়ী একটু প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করল, কিন্তু আমি তা গ্রাহ্য না ক'রে সংলাপ বলতে লাগলুম—একবার, দু'বার, তিনবার। পাহাড়ী মন দিয়ে শুনল। জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি বলবে ?"

"আর একবার বল।" আর একবার বলার পরে পাহাড়ী সংলাপটি বলতে লাগল ; একটা জায়গায় আটকে গেল। আবার আমি সংলাপটি বললুম। তারপরে পাহাড়ী নির্ভুলভাবে সংলাপটি বলতে সমর্থ হ'ল। আর একবার তাকে দিয়ে ঐখানেই সংলাপটিকে বলালুম। তারপরে বললুম, "এস।" ও ফ্লোরে ঢুকে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। অল্প একটু monitor (খানিকটা সংলাপ সাউন্ড-রেকর্ডিস্টকে শুনিয়ে দেওয়া) দেবার পরেই শটটি একবারের প্রয়াসেই নির্ভুলভাবে নেওয়া হ'ল। আমি পাহাড়ীকে জড়িয়ে ধরলুম।

এর পরে নিরুপদ্রবে সমস্ত ছবিটা শেষ হ'ল। এবং ছবিটি যখন ১৯৩৯ ৭ই এপ্রিলে রূপবাণী চিত্রগৃহে মুক্তি পেল, তখন তা দর্শক সংবর্ধনা পেতে কসুর করল না। ছবির হিন্দী সংস্করণটি দেখে ফিল্ম-ইণ্ডিয়ার সম্পাদক বাবুরাও প্যাটেল লিখেছিলেন, "If you want to see picture, go and see Barididi."

'বড়দিদি' মুক্তি পাবার কিছুদিন বাদেই অমর মল্লিকমশাই আমাকে ডেকে বললেন, "তুমি ও-বাড়ীতে যাও, ছোটাই তোমাকে খুঁজছিল।" ও-বাড়ীতে গিয়ে দেখি, পিছনের মাঠে ছোটাইদা একতাড়া কাগজপত্র নিয়ে কিছু লেখা-লেখির কাজ করছেন। আমাকে দেখে তিনি ডেকে বসালেন। তাঁর সঙ্গে কথায়বার্তায় জানতে পারলুম, তিনি শিগ্‌গিরই একটি ছবি আরম্ভ করতে চলেছেন, তারই চিত্রনাট্য রচনার কাজে তিনি ব্যাপৃত। আমি বললুম, "বেশ তো।" তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "বেশ তো বললেই চলবে না, আপনাকে চিত্রনাট্যটি তৈরী করতে হবে।"

বেশ খানিকটা কৌতুক-বিস্ময়ে তাঁর পানে তাকাতেই তিনি স্বচ্ছন্দে বললেন, "হ্যাঁ, আপনি সম্পূর্ণ একা চিত্রনাট্য রচনা করবেন, আপনার কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপনি কাজ করবেন—

আপনি যে-চিত্রনাট্য রচনা করবেন, তাই ধ'রেই ছবি হবে—nobody is going to disturb ypu." বলে তিনি সমস্ত কাগজপত্র আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। মনে মনে বুঝলুম, 'বড়দিদি' ছবির অসাধারণ সাফল্যই আমাকে ছোটাইদার চোখে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমি বিনয় সহকারে বললুম, "আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে কাগজপত্রগুলি এখানেই থাক, আমি কাল দুপুর থেকে এখানেই ব'সে লেখার কাজ করব।" "তাহলে এই কথা রইল" ব'লে ছোটাইদা আমাকে ছুটি দিলেন। আমি মনের আনন্দে প্রায় ছুটতে ছুটতে এক নম্বরে এসে মল্লিক-মশাইকে সব কথা বললুম। তিনি তখন বৈকালিক বেশ পরিবর্তন ক'রে সাহেবের কাছে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। আমাকে বললেন, "তুই বোস।" ব'লেই চ'লে গেলেন গোলঘর পানে সাহেবের কাছে।

এই গোলঘর হচ্ছে সম্পূর্ণ গোলাকার একটি লাল সিমেণ্ট করা জায়গার চারপাশে খাড়া-করা বাঁশের খুঁটির ওপরে গোলপাতার ছাউনি। সিমেণ্টের জায়গার ওপর মাঝখানে একটি টেবিল, তার চারপাশে তিনখানি ঠেসান-দেওয়া যায়, এমনই হাল্কা বেঞ্চি। এই গোলঘর এক নম্বর স্টুডিওর ফটক থেকে পশ্চিমমুখে কিছুদূর এগিয়ে ১নং ফ্লোর ছাড়িয়েই বাঁ দিকে পাথর নুড়ি-বিছানা পথের বাঁ ধারেই নজরে পড়ে; তার থেকে পথ ধ'রে এগোলেই বামে যে পুকুরটি দেখা যায়, তার উত্তর-পূর্ব কোণের থেকে কিছুটা পূর্বে এই গোলঘর।

এই বিখ্যাত গোলঘরে প্রতিটি বিকালে ধুতি ও ঢিলে-হাতা, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি পরে নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বি. এন. সরকার (বীরেন্দ্রনাথ সরকার) এসে বসতেন এবং পাইপ খেতে খেতে স্টুডিও এবং ছবি তৈরী সম্পর্কে কত যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার সীমা নেই।

ব'সে আছি তো ব'সেই আছি। মল্লিকমশাই ওপরে তাঁর ঘরে ফিরলেন প্রায় নটা নাগাদ। এসেই বললেন, "সব ঠিক হয়ে গেল। আমাদের immediately ছবি আরম্ভ করতে হবে। কাজেই তোমার আর ও বাড়ীতে গিয়ে দরকার নেই। আমাদের সিনারিও নিয়ে বসতে হবে।"

আমার মনের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। মুখে বললুম, "কিন্তু আমি যে ছোটাইদাকে কথা দিয়ে এসেছি।" তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "সে আমি ছোটাইকে ব'লে দেব, তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি কাল বেলা ১১টার মধ্যে চ'লে আসবে।" ব্যস, হয়ে গেল। ছোটাইদার ছবির চিত্রনাট্য যে-হয় করুক, আমার তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

পরদিন মল্লিকমশাইয়ের আদেশমত ঠিক ১১টাতেই গিয়ে পৌঁছলুম। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! মিঃ মল্লিক এসে হাজির হলেন বেলা দেড়টা নাগাদ। এসেই তাঁর খাস বেহারা বাচ্চুকে হেঁকে বললেন, "খানা লাগাও।" খাবার পরে নীচে নেমে গেলেন আমাকে বসতে ব'লে।

এইভাবেই দিনগত পাপক্ষয় চলতে লাগল দিনের পর দিন। মনে মনে

ভাবি, একবার ছোটাইদার সঙ্গে দেখা করলে কি হয়। কিন্তু তখনই মনটা পিছিয়ে আসে, না বাবা, দরকার নেই। গেলেই ছোটাইদা নিশ্চয়ই মল্লিক-মশাইকে বলবেন এবং তিনি আমার ওপর বিলক্ষণ রেগে যাবেন। কাজেই যা চলছে, তাই চলুক।

বেশ কিছুদিন এইভাবে যাবার পরে একদিন রাত্রে অমর মল্লিকমশাই বালিগঞ্জে আমার বাসস্থানে এসে হাজির হলেন। বলতে ভুলে গেছি, গোঁড়া, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও আমি ১৯৩৭ সালের ১লা জুলাই কালীঘাট হিন্দু মিশনে নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রকুমার রায়, দীনেশরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রনাথ মিত্র (ছোটাইদা), সুধীশচন্দ্র ঘটক (মণীশ ঘটক ও ঋত্বিক ঘটকের ক্যামেরাম্যান ও বিদগ্ধ ভ্রাতা), নীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (পরিচালক বেণু লাহিড়ী) প্রভৃতির উপস্থিতিতে একটি অসবর্ণ বিবাহে আবদ্ধ হই প্রসিদ্ধ বিস্কুট-বার্লি প্রস্তুত-কারক কে. সি. বসুর বড়ছেলের একমাত্র কন্যা রোমেনার সঙ্গে। বিবাহ দেন নাটোরের রাজার পুরোহিত। এবং সেই কারণেই রামচন্দ্র মৈত্র লেনের বাড়ী ছেড়ে বালিগঞ্জে বাসা নিই।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউস্থ এই বাসা-বাড়ীতে থাকতে থাকতেই এক বছরের মধ্যে আমি বালীগঞ্জ স্টেশনের নিকটবর্তী জামির লেনে একটি ছোট বাড়ী তৈরী করিয়ে সেখানে চ'লে যাই। মল্লিকমশাই এই বাড়ীতেই উপস্থিত হয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত একটি ছোট গল্পের বই হাতে ক'রে। তিনি এ-কথা সে-কথার পরে ওই বইখানি আমার হাতে দিয়ে বলেন, "এর ভিতরে শুভরাত্রি ব'লে যে-গল্পটি আছে, সেইটি প'ড়ে রাখিস। আমি আবার কাল আসব।"

পরদিন রাত্রে যথাসময়ে উনি এসে পৌঁছুলে আমি বললুম, "গল্পটি মোটামুটি মন্দ নয়। তবে এতে এমনকিছু পরিস্থিতি নেই, যা দর্শকদের মনকে নাড়া দিতে পারে। দুই মঞ্চশিল্পীর প্রেম ও ভুল বোঝাবুঝির জন্যে ক্ষণিক বিচ্ছেদ এবং পুনর্মিলনের মধ্যে এমন কিছু নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, যা দর্শকচিত্তকে মথিত ক'রে তার মধ্যে হাহাকারের প্লাবন বহাতে পারে। না. মল্লিকমশাই, এ গল্প চলবে না। আমাদের এমন গল্প নিতে হবে, যাতে এমন মাল-মশলা আছে, যা দর্শকদের মনকে সজোরে নাড়া দিতে পারে।"

কিন্তু মল্লিকমশাই নাছোড়বান্দা; তিনি বললেন, "মিঃ সরকার এই গল্পটা (কাহিনীর সিনেমা স্বত্ব) কিনেছেন, আমাকে বললেন ছবি হয় কিনা দেখতে। যদি এই গল্প থেকে আমরা ছবি করতে পারি, তাহলে 'কুটিলার মুখে পড়িবে ছাই'। পশু, তুই অমত করিসনে, এই গল্প থেকেই আমরা ছবি করব।"

অগত্যা ঐ 'শুভরাত্রি' কাহিনী অবলম্বনেই চিত্রনাট্য রচনা করতে হ'ল এবং যথাসময়ে তা কানন ও পাহাড়ীকে নায়ক-নায়িকা ক'রে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হ'ল দুই ভাষায়—বাঙলা ও হিন্দীতে। বাঙলার নাম দেওয়া

হ'ল 'অভিনেত্রী' এবং হিন্দীর নামকরণ হ'ল 'হারজিৎ'। ১৯৪০ সালের ৩০শে নভেম্বরে রূপবাণী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ ক'রে ছবিখানি কিন্তু দর্শকচিত্তকে জয় করতে পারল না ; আমার কথাই ফলল।

এরই ঠিক পনেরো দিন পরে নিউ থিয়েটার্স কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একখানি খাম পেলুম, যার ভিতরের চিঠিতে লেখা ছিল—"Your service is no longer required." অর্থাৎ চাকরী থেকে বরখাস্ত হলুম। শুধু আমি নয়, একসঙ্গে ৮০ জন কর্মী ঐ চিঠি পাই। কিন্তু আমি চিন্তা করলুম, সেই সময়ে সর্বসম্মতিক্রমে আমি ছিলুম সবচেয়ে ভালো সহকারী পরিচালক, এবং সে-কথা মিঃ সরকারও জানতেন ; তবু আমার চাকরী গেল কেন ?

এ-ছাড়া আর এক কথা। সেই প্রথম দিন, যে-দিন মিঃ সরকার আমাকে চাকরী দিয়েছিলেন, সেদিন তিনি নিজ মুখে বলেছিলেন, যতদিন নিউ থিয়েটার্স, ততদিন আপনার চাকরী। এখন তাঁর কথার কি দাম রইল ? মাস মাহিনা মাত্র ৯০ টাকা—মাস দু'তিন আগে মাহিনাটি কমে ১০৫ থেকে ৯০ টাকা হয়েছিল—, কিন্তু ১৯৪০ সালের শেষে তাই বা দেয় কে ? সেই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে ধীরে ধীরে। কলকাতায় সৈন্যবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ী টহল দিচ্ছে। তার ওপর বিবাহিত জীবনে এই কর্মচ্যুতি আমাকে বিহ্বল ক'রে তুলল। কি করি ? কোথা যাই ? কণ্ট্রাক্টরের কাছে কিছু দেনার দায়ে জামির লেনের বাড়িটি বিক্রি ক'রে দিয়ে আমি আবার তখন ভাড়াটিয়া প্রতাপাদিত্য প্লেসে।

মাস তিন চার কেটেছে, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন পরিচালকবন্ধু কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় যখন তিনি শুনলেন, আমি তখনও কর্মহীন অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছি, তিনি তখনই আমাকে পরামর্শ দিলেন, সোজা মিঃ পি. এন. রায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে। যে কথা, সেই কাজ। আমি কার্তিকবাবুর কাছ থেকেই সোজা চলে গেলুম মিঃ রায়ের রিজেণ্ট পার্কের বাড়ীতে। তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে কাজ চাইতেই তিনি হেসে বললেন, "একজন বেকার আর একজন বেকারের হাত ধরতে চাইছে। আচ্ছা, তাই হোক। আপনি খেয়ে এসেছেন ?" ঘাড় নেড়ে না বলতে তিনি বেরোবার জন্যে চটপট তৈরী হয়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে নিলেন এবং সোজা আমাকে আমার টালিগঞ্জের বাসাবাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, আমার গাড়ী এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।"

আমি যথাসম্ভব শীঘ্র খেয়ে তৈরী হয়ে নিলুম ও মিঃ রায়ের গাড়ী আসতেই তাতে চ'ড়ে বসলুম। গাড়ী আমাকে নিয়ে গেল কালী ফিল্মস্ স্টুডিওতে (বর্তমানে টেক্‌নিশিয়ান্স স্টুডিও)। সেখানে গিয়ে ড্রাইভার নির্দেশিত ফ্লোরে ঢুকে দেখি, সেখানে একটি ছোট্ট সেটাকে আলোকিত করছেন পরবর্তীকালের চিত্রপরিচালক ক্যামেরাম্যান নির্মল দে। একটি অবাঙালী মেয়ে মেক্-আপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ আমার দৃষ্টির বাইরে থেকে পরিচালক ফণী মজুমদার আমার সামনে এসে বললেন, "বাঁচালেন মশাই, এই নিন ধরুন স্ক্রীপ্ট (সিনারিওর অপর নাম), দেখুন কি করতে হবে।" ব'লেই আমার হাতে কাগজপত্তর গুঁজে দিয়ে এবং আমাকে কোনও কিছু বলবার অবসর না দিয়েই তিনি মিঃ রায়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ত্বরিৎপদে বিদায় নিলেন। আমি মিঃ রায়ের দিকে চাইতেই তিনি মৃদু হাসলেন।

আমি হাতের কাগজ উল্টে পাল্টে দেখলুম, এনোজ্ ফ্রুট সল্ট-এর ওপর একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপনচিত্র তৈরী করবার জন্যে ঐ স্ক্রিপ্ট। তথাস্তু। আমি ছোট্ট একটি পরিস্থিতির ওপর ঐ স্ক্রিপ্টটিকে বার দু'তিন প'ড়ে দেখলুম এবং ঠিক করে নিলুম, আগে কোন্ শট্ নিতে হবে এবং তারপরে কোন্ শট এবং তারপরে—। ক্যামেরাম্যান মিঃ দে আমাকে জানালেন, তিনি সমস্ত সেটটিকেই আলোকিত ক'রে নিয়েছেন; এর পরে আর্টিস্টের দাঁড়াবার জায়গা অনুযায়ী আলো ক'রে নিলেই চল'বে।

আমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ ক'রে কাজ আরম্ভ করলুম। মেয়েটিকে মোটা-মুটি কি করতে হবে, কোন্ সময়ে কাতরোক্তি প্রকাশ করতে হবে, সব ব'লে দিলুম। মোট ৮টি কি ১০টি শট্। শ্যুটিং শেষ করতে কোনই অসুবিধে হ'ল না। সবাই খুশী। মিঃ রায় আমার হাতে ১০০ টাকার একটি বেয়ারার চেক তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্ট আছে কিনা। আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে বললেন, "আপনি আপাতত মাসে ১০০ টাকা করে পাবেন। কাল এসে এডিটিংয়ে বসবেন। যান, আমার গাড়ী আপনাকে বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে আসছে।"

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী চ'লে এলুম। কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমি আজও কৃতজ্ঞ এই অভাবনীয় ঘটনার জন্যে।

পরদিন সকাল সকাল খেয়েদেয়ে কালী ফিল্মসের এডিটিং রুমে (সম্পাদনা-কক্ষে) প্রবেশ করতে দেখি, সম্পাদক বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সবে মাত্র এসে পৌঁছেছেন এবং তার শার্টটিকে খুলে রেখে কাজ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। নেগেটিভ ডেভেলপ্‌ড্ হয়ে তখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। বৈদ্যনাথবাবু নিজেই নেগেটিভ নিয়ে এলেন পাশের ল্যাবরেটারী থেকে।

কাজ শুরু হয়ে গেল। আমার নির্দেশক্রমে কাজ করে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই বৈদ্যনাথবাবু চূড়ান্ত নেগেটিভ তৈরী ক'রে ফেললেন, যার দৈর্ঘ্য হ'ল মাত্র ৯০ ফুট, একটি বিজ্ঞাপনচিত্র সাধারণত যতখানি লম্বা হয়ে থাকে ঠিক ততখানি। পরদিনই ঐ এক মিনিট স্থায়ী ছবিখানি দেখা হল লাইট হাউসে।

মিঃ রায় আমাকে বললেন, ছবিটিকে ফেনায়মান গেলাসের ওপর শেষ করতে। তাঁর উপদেশ আমার মনে ধরল। আমি তখনই কালী ফিল্মসে পৌঁছে মুভীওলার সাহায্যে নিজেই ঐ পরিবর্তনটুকু করবার পরে বৈদ্যনাথবাবু এসে হাজির হলেন এবং তিনি আমার কাজ দেখে খুশীই হলেন। বোধকরি

অর্ডারটি ছিল ওয়াল্টার টমসনের। তাঁরা ছবিটি দেখে, যার নাম দেওয়া হয়েছিল Inner Cleanliness, দারুণ খুশী হয়ে ছবিটির একটি বাঙলা সংস্করণ করতে বললেন।

মিঃ রায় আমাকে সে-কথা বলতে আমি তাঁকে পরামর্শ দিলুম, আবার নতুন শ্যুটিংয়ের মধ্যে না গিয়ে commentary বা নেপথ্য ধারাভাষ্য যোগ ক'রে বাঙলা সংস্করণটি প্রস্তুত করতে। তিনি আমার কথায় সম্মত হওয়ায় আমি এমন সুকৌশলে ধারাভাষ্যটি প্রস্তুত করলুম যে, তাকে ছবির সঙ্গে জুড়ে যখন দেখা হ'ল তখন মনে হ'ল, সেটি যেন সম্পূর্ণ সবাকচিত্র।

টমসন কোম্পানীও এতে প্রচুর খুশী হয়ে ভারতের অন্যান্য প্রায় সাত-আটটি ভাষায় ছবিটি তৈরী করবার অর্ডার দিলেন। আমরাও উপযোগী কামেণ্টারী লেখক ও কমেণ্টাচারী বক্তা খুঁজে খুঁজে এনে আমাদের কর্ম সমাধা করলুম। এর পরে শুরু হ'ল যুদ্ধ-বিষয়ক সংবাদ-চিত্রের বহু ভাষায় নেপথ্যভাষ্য যোজনার কাজ। প্রতি সপ্তাহে একটি করে নতুন সংবাদচিত্র আসে, আর আমরাও তাতে ধারাভাষ্য যোজনা করি ভারতের বিভিন্ন অন্তত ৮।১০টি ভাষায়। এইভাবে বছর খানেক কাজ করবার পরে একদিন রাত্রে আমি মিঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে কিছুটা অপেক্ষা করতে বললেন। দেখলুম, তিনি হিসেবপত্তর নিয়ে খুবই ব্যস্ত রয়েছেন।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে তিনি তাঁর কাজ শেষ ক'রে আমাকে নিয়ে তাঁর বাড়ীর লনে পায়চারি করতে করতে যে-কথা জানালেন, তা হচ্ছে এই যে-দিন আমি তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা করি, সেদিন তাঁর পকেটে ছিল নগদ ১৮০ টাকা। আর আজ এক বছরের আয়ব্যয়ের হিসাব শেষ করবার পরে তিনি দেখছেন, তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স দাঁড়িয়েছে ৩৭,০০০ টাকা। তিনি বললেন, আপনি আমার পাশে এসে না দাঁড়ালে এ-জিনিস সম্ভব হত না।

মিঃ পি. এন. রায় (প্রমোদনাথ রায়) ছিলেন ব্রাহ্মসন্তান। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং মূলতঃ একজন ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু তাঁর মধ্যে আমি চারুকলা ও বিজ্ঞানের যে আশ্চর্য সম্মেলন দেখেছিলুম, তা কচিৎই দেখা যায়। বাল্য কেটেছে তাঁর শান্তিনিকেতনে। তিনি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীতে বহুদিন কাটিয়েছেন। বহু নাম করা সেতুর নক্সা রচনায় তিনি সাহায্য করেছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের নামী অফিসার বি. এন. দে তাঁর বন্ধুত্বের ফলে বহুভাবে উপকৃত।

মিঃ রায়ের ছিল একটি অসামান্য দরদী মন। পরের দুঃখে তাঁর চোখ থেকে আমি ধারাবর্ষণ হতে দেখেছি। তিনি ছিলেন অকৃতদার। শুনেছি, একদা তাঁর সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের প্রথমা মহিলা দেবিকারাণীর ছিল ঘনিষ্ঠ প্রণয়। কিন্তু মিঃ রায়েরই খুড়তুতো বা জ্যাঠতুতো ভাই হিমাংশু রায়কে (ডাকনাম গোলাপ রায়) যখন দেবিকারাণী বিবাহ করে বসেন, তখন থেকেই মিঃ রায় একটি নোঙরহীন নৌকা। স্বভাবে তিনি ছিলেন খাঁটি

ইংরেজ। খানসামার হাতে তৈরী সিদ্ধ বস্তু দিয়েই তিনি উদরপূর্তি করতেন। তাই একদিন দুপুরে আমার বাসায় এসে আমি খাচ্ছি শুনে তিনিও যখন খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি স্বাভাবিক ভাবেই বিব্রত বোধ করেছিলুম। কিন্তু খেতে ব'সে তিনি যখন সুক্তো, লাউয়ের ঘণ্ট, মুগের ডাল, মাছের তরকারী এবং অম্বল মুখে দিয়ে বলতে লাগলেন, "এ যে কোনও দিন খেতে পাব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি; আমার ছেলেবেলার দিনগুলি মনে পড়ে যাচ্ছে।" তখন তাঁর প্রতি মনে মনে সমবেদনা প্রকাশ না ক'রে পারিনি। লক্ষ্য করেছিলুম, কথাগুলি বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটি কেমন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল।

হেনরী বোর্ন ছিলেন বার্মা-শেল কোম্পানীর প্রচারসচিব। মিঃ পি. এন. রায়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। মিঃ রায় তাঁকে প্রচারকার্যে নানাভাবে সাহায্য করতেন। এরই সূত্র ধরে বার্মা-শেল নির্মিত কেরোসিন-এর ওপর ঐ নামে একটি তথ্যচিত্রের ভারতীয় সংস্করণ তৈরীর কাজ আমার ওপর অর্পিত হয়। আমি মিঃ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে এতে বহু স্থানীয় শট্ সংযোজন করবার কথা স্থির করি এবং সেই অনুসারে শ্যুটিংও করি।

শট্গুলি তুলে সেগুলিকে আমাদের বুদ্ধিমত স্থানে স্থানে সংযোজন করে মিঃ বোর্নকে দেখালে তিনি কিছুটা অদল-বদল করবার পরামর্শ দেন। তা ক'রে নিয়ে উপযোগী নেপথ্যভাষ্য যোগ করবার পরে ফিল্মটি তথ্যচিত্র হিসেবে সাধারণ্যে প্রদর্শিত হলে খুবই প্রশংসিত হয়। আর একটি ছোট বিজ্ঞাপন চিত্রও আমি তুলি। কলিকাতা টাউন হলে একটি অগ্নিনির্বাপক মোটরগাড়ী (fire engine) কেনবার অর্থসংগ্রহের জন্যে 'আমেরিকান পাক্কা তামাশা" (American Pacca Tamasha) নামে একটি কার্নিভ্যালের (আমোদ-প্রমোদের) ব্যবস্থা করা হয়। পুরোনো যুগের ফায়ার এঞ্জিনের শট্ তুলতে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের অনেকখানি অংশ যান-চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়, এ-কথা আমার আজও মনে আছে।

৮০ ফুটের ঐ ছবিটি লাইট হাউস এবং কলকাতার অন্যান্য বড় বড় চিত্রগৃহে দেখানো হয়। এরই মধ্যে মিঃ রায় নিজের ল্যাবরেটারী এবং সম্পাদনা বিভাগ খোলবার সংকল্প নিয়ে টালিগঞ্জ পাড়ায় একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজতে লাগলেন। অল্প ঘোরাঘুরির পরে গল্‌ফ ক্লাব রোডে একটি মনের মত জায়গা পাওয়া গেল। মাগনিরাম বাঙ্গুরের জমিবিভাগীয় কর্তা চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এটিকে কিনে নিয়ে মিঃ রায় গড়ে তুললেন তাঁর ফিল্ম সার্ভিসেস। এক সময়ে ওরই দোতলায় নতুন ঘর তৈরী করিয়ে তিনি সেখানে নিজে বাস করতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

এদিকে মিঃ রায়ের অধীনস্থ আমার সহকর্মীরা আমাকে উস্কোতে লাগলেন একটি বড় ছবি আরম্ভ করবার জন্যে। সুযোগ বুঝে আমি কথাটা মিঃ রায়ের কাছে পাড়তে তিনি বললেন, "কি ছবি করবেন? কিছু ভেবেছেন?" আমি সত্যিই কিছু ভাবিনি; কারণ, মিঃ রায় আমার কথাকে

কিভাবে নেবেন, তা আমার জানা ছিল না। তাই তাঁর অমত নেই জেনে তৎক্ষণাৎ ভেবে নিয়ে বললুম, 'শরৎচন্দ্রের 'স্বামী'।" রায়সাহেব বললেন, "ওটা পরে করবেন ; কারণ ও কাহিনীটা একটু মনস্তাত্ত্বিক। একটা হাল্কা কিছু, সোজা রোমান্সের কাহিনী ভাবুন।"

আমি বুঝে নিয়ে এবং তাঁর যুক্তির সারবত্তাকে মেনে নিয়ে বললুম, " 'পরিণীতা' কেমন হয়" ? তিনি যেন আমার কথাটাকে লুফে নিয়ে বললেন, "খুব ভালো। আপনি 'পরিণীতা' এবং ঐ সঙ্গে 'অরক্ষণীয়া'র বাঙলা ও হিন্দী, উভয় সংস্করণের জন্যে শরৎবাবুর ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলুন।"

আমি সঙ্গে সঙ্গেই কালবিলম্ব না করে শরৎচন্দ্রের ভাই প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ফেললুম। প্রথমে 'পরিণীতা'র বাঙলা সংস্করণ এবং 'অরক্ষণীয়া'র হিন্দী সংস্করণ কেনা হ'ল। 'পরিণীতা'র চিত্রনাট্য লেখা আরম্ভ ক'রে দিলুম এবং প্রায় হপ্তা তিন-চারের মধ্যেই তা শেষও করলুম। মিঃ রায় এরই মধ্যে আমাকে একান্তে খুব কোমল ভাবে বললেন, "আপনার চিত্রনাট্যটি যদি দেবকীবাবুকে দেখিয়ে নিই, তাতে আপনার আপত্তি হবে না তো ?"

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলুম, "আপত্তি ? তিনি যদি দেখেন, আমি কৃতার্থ হয়ে যাব।"

এই সময়ে মিঃ রায় লেক টেম্পল রোডে লীলা দেশাইয়ের বাড়ীর এক তলাতে থাকতেন ; তাঁর গল্‌ফ্ ক্লাব রোডের দোতলা এখনও তৈরী হয়নি। যেদিন পড়া হ'ল সিনারিওটা এইখানে, সেদিন মিঃ রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্তত পাঁচ-ছ'জন। তাঁদের মধ্যে মনে পড়ছে সুবোধ মিত্র (কচিদা), কল্যাণ গুপ্ত ও সুহৃদ ঘোষ (ক্যামেরাম্যান)-এর নাম। সকলেই একমনে আমার চিত্রনাট্য পাঠ শুনলেন এবং যতদূর মনে হ'ল প্রত্যেকেই প্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন।

প্রথমেই মিঃ রায় আমার কাছে এসে কানে কানে যে-কথা বললেন, সেটি হচ্ছে, "আমি সিনারিওটা দেবকীবাবুকে দেখাবার যে-প্রস্তাব করেছিলুম, তা withdraw করে নিচ্ছি।"

ভূমিকালিপি বণ্টনের কথা উঠতেই কল্যাণ গুপ্ত বললেন, "ললিতার ভূমিকার জন্যে প্রমীলা ত্রিবেদীকে নির্বাচন করা যাক।" আমি বললুম, "আপত্তি নেই ; তবে পুরোপুরি নির্বাচন করার আগে আমি তাঁকে কিছুটা মহলা দিয়ে দেখব।"

যে-কথা, সেই কাজ। পরের দিনই মিঃ রায়েরই একটি ঘরে প্রমীলা ত্রিবেদীকে গোটা কয়েক দৃশ্য মহলা দেওয়ালুম এবং দেখলুম, তিনি কিছুতেই আমার চাহিদামত রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারছেন না—না সংলাপ-কথনে, না ভাবে ভঙ্গীতে। মিঃ রায়কে কথাটা জানালুম। তিনি বললেন, আরও দু'একদিন চেষ্টা ক'রে দেখতে। পরপর পাঁচদিন ধরে তাঁকে আমি সাহায্য করলুম নির্ভুলভাবে ভূমিকাটির রূপ দিতে ; কিন্তু হা হতোস্মি, তিনি প্রথম

দিনে যা করেছিলেন পঞ্চম দিনেও তাই করলেন, একটু এদিক-ওদিক নয়। আমি মিঃ রায়কে বললুম, "ওঁকে খারিজ করুন।" "কিন্তু ওঁর সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হয়েছি যে!" বললেন মিঃ রায়।

আমি বললুম, "ললিতার ভূমিকাটিই যদি ঠিক ঠিক না হয়, ছবি দাঁড়াবে কিসের জোরে?" তখন নিরুপায় হয়ে তিনি বললেন, "দেখুন তা হলে অন্য আর্টিস্ট।"

ইতিমধ্যে ভুবনমোহন লাহিড়ী ও দুর্গাদাস মল্লিকের যুগ্ম মালিকানায় নব প্রতিষ্ঠিত 'কোয়ালিটি ফিল্মস্' ছবিটির পরিবেশন স্বত্ব ক্রয় করেছেন। আমার সঙ্গে এঁদের দুজনেরই আলাপ ছিল আগে হতেই। প্রথম জন ছিলেন প্রাইমা ফিল্মের ম্যানেজার এবং দ্বিতীয় জন ছিলেন রিয়ার্ডেনের অধীনে ব্রিটিশ ডিস্ট্রিবিউটার্সের চীফ বুকার। এঁদের 'কোয়ালিটি ফিল্মস্'-এর ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীটের আফিসে আমার যাতায়াত শুরু হয়ে গিয়েছিল।

একদিন বিকেলে সেখানে গিয়ে যখন আমি বলছি, "ললিতার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে মনের মত একটি আর্টিস্ট পাচ্ছি না; ছিল একটি মেয়ে, সে 'অভিনেত্রী' ছবিতে পাতকুয়া থেকে জল তুলতে তুলতে চার লাইন গানের সঙ্গে ঠোঁট নেড়েছিল ঃ

"মাটির মাগো, দে গো জল।
আসবে যখন মেঘরাজা,
ফিরিয়ে দেব মুক্তাফল।" ইত্যাদি।

তার নাম ছিল, যতদূর মনে হয়, সন্ধ্যা। তা শুনছি, সে নাকি কলেরায় মারা গেছে।"

ভুবনবাবু বললেন, "কে বললে মারা গেছে? সে জলজ্যান্ত বেঁচে আছে। কাল বিকেলে এই সময়ে আসবেন; সে এইখানে হাজির থাকবে।"

পরের দিন বিকেলে গিয়ে সত্যিই দেখলুম, রীমলেস চশমা প'রে মেয়েটি একটি চেয়ারে আসীন। আমাকে দেখে সে ফিক্‌ফিক্ ক'রে হাসতে লাগল। অবাক কাণ্ড! এই মেয়ে নাকি কলেরায় মারা গেছে! তাকে বললুম, "চশমা প'রে বেশ বাহার খুলেছে। দাও দেখি চশমাটি।" সে কিছু না বুঝেই তার চোখ থেকে চশমাটি খুলে আমার হাতে দিল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে মট্ ক'রে চশমাটি ভেঙে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বললুম, "আর্টিস্ট হবার সাধ, অথচ চশমা পরা চাই। কখ্‌খনো চশমা পরবে না।" সে এ কাণ্ড যে হবে, তা আগে বুঝতে পারেনি। অন্যমনস্কভাবে দু'টুক্‌রো চশমা হাতে নিয়ে ধ'রে রইল। ভুবনবাবুকে বললুম, "কাল দুপুরের পরে ওকে রায়সাহেবের লেক টেম্পল রোডের বাড়ীতে পেঁছুতে হবে মহলা দেবার জন্যে।"

প্রথম পরীক্ষাতেই অপূর্বভাবে কৃতকার্য। একবার মহলা দিয়েই বুঝলুম, এই ভূমিকাটির জন্যেই যেন মেয়েটি তৈরী। তবু তিন চারদিন ধ'রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যগুলির মহলা দিলুম। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে গেল; সমগ্র

ভূমিকাটি অভিনয়ের জন্যে মাত্র ৫০০ টাকা পারিশ্রমিক। শেখরের ভূমিকাটিতে অবতীর্ণ হবার জন্যে জনকয়েক উমেদারের মধ্যে নির্বাচিত হলেন প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়।

ছবির সঙ্গীত-পরিচালনার ভার দিলুম একটি নতুন ছেলেকে; নাম—রবীন চট্টোপাধ্যায়। ছেলেটির সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় ছিল না। শুধু শুনেছিলুম, সে শচীন দেববর্মন এবং অনুপম ঘটকের সহকারী রূপে কয়েকটি ছবিতে কাজ করছে। আরও শুনেছিলুম, মিঃ বড়ুয়ার 'শাপমুক্তি' ছবিতে বালক-জুতাপালিশওয়ালার মুখের জনপ্রিয় গান "একটি পয়সা দাও বাবুজী-র" সুরটি ওরই করা।

যাই হোক, তাকে খবর পাঠাতে সে এক সকালে আমার অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ীতে এসে হাজির হয় এবং কলিংবেলটি টেপে। আমি নীচে নেমে গিয়ে সদর দরজা খুলে দেখি, সে দরজার সামনে যে তিন ধাপ সিঁড়ি আছে, তারই ওপর ধাপটিতে বসে আছে। আমি তাকে ও-ভাবে ওখানে ব'সে কেন জিজ্ঞেস করতে সে বলে, "তাতে কি হয়েছে?" পরে আমার আহ্বানে সে ভেতরে এসে বেতের চেয়ারে বসতে আমি তাকে বললুম, "আপনি আমার ছবির মিউজিক ডাইরেকশন দেবেন?" সে জবাবে বলল, "আপনি আমাকে জানেন না, শোনেন না। হঠাৎ আমাকে ডেকে মিউজিক ডাইরেকশন দিতে বলছেন কি ভরসায়? বিশেষ আপনি নিজেই এই প্রথম একটা বড়ো ছবিতে ডাইরেকশন দিতে চলেছেন।"

আমি বললুম, "আমার নিজের ওপর পুরোপুরি আস্থা আছে ব'লেই আমি এ-পথে পা বাড়িয়েছি। এখন আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী আছেন কি না, তাই বলুন।"

রবীন বললে, "এ তো মেঘ না চাইতেই জল। এ প্রস্তাবে কে রাজী না হবে, বলুন?"

ব্যস, তার সঙ্গে মিঃ পি. এন্ রায় চুক্তিবদ্ধ হলেন। রবীন 'পরিণীতা' ছবিতে সুর দিয়ে প্রযোজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পরে সে বহুদিন এম, পি. প্রোডাকসন্সের বাঁধা মিউজিক ডাইরেক্টার ছিল। তার বহু গানই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বেচারা আজ আর বেঁচে নেই, বছর কয়েক আগে সে সংসারের মায়া ত্যাগ করেছে।

বেশ মনে আছে, ১৯এ সেপ্টেম্বর মহরৎ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই শ্যুটিং আরম্ভ হয়ে গেল। মহরৎ উপলক্ষ্যে সেটের মধ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করলেন আমার দাদা-স্থানীয় বন্ধু, পণ্ডিত অশোক শাস্ত্রী এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে। ছবি যখন অর্ধপথে, তখন একদিন মিঃ রায় আমাকে জানালেন, ছবির মুক্তিদিবস স্থির হয়ে গেছে ১৯এ ডিসেম্বর। আমি তাঁকে বললুম, ঠিক আছে, ঐদিনই মুক্তি পাবে পরিণীতা। তখন শ্যুটিং চলছিল 'রামানুজ' ছবির, যার দেখাশুনার ভার ছিল মিঃ পি. এন. রায়ের ওপর এবং যার পরিচালক ছিলেন দেবকীকুমার বসু।

একদিন একই মোটরে চেপে বাড়ী ফেরবার সময়ে দেবকীবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "পশুপতিবাবু, আপনি নাকি ছবি আরম্ভ করবার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তার release দিতে রাজী হয়েছেন?" উত্তরে আমি বললুম, "হ্যাঁ স্যার, আমি রাজী হয়েছি, আমি এটাকে একটা challenge স্বরূপ গ্রহণ করেছি।" দেবকীবাবু আমার শুভার্থী, তিনি এ-পথে আমার একমাত্র গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি আবার বললেন, "না পশুপতিবাবু, কাজটা ভালো করছেন না। এটা আপনার প্রথম ছবি; খুব দেখেশুনে, কোনও দৃশ্য আপনার মনোমত না হলে retake ক'রে, ভালো ভাবে edit ক'রে তবে মুক্তি দিতে রাজী হবেন, তার আগে নয়।"

কিন্তু তীর ছোঁড়া হয়ে গেছে, আর ফেরাবার উপায় নেই। আজ ভাবি, সেদিন দেবকীবাবুর কথা শুনে মিঃ রায়কে বললেই হ'ত, "আমি স্যার, কথা ফেরত নিচ্ছি। আমি সমস্ত ছবিটাকে ভালো ক'রে না দেখে, প্রয়োজন হলে retake না ক'রে ছবির মুক্তি-তারিখ ঘোষণা করতে দেব না। কিন্তু জিদের বশে তা করিনি, মিঃ রায়ের সিদ্ধান্তেই অটল ছিলুম। এবং তার ফলে আমার প্রথম ছবি, 'পরিণীতা' খুবই জনপ্রিয় হ'লেও আমার ততটা মনোমত হয়নি। এবং এর কারণটা আমার কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত।

আমি আদৌ জানতুম না যে, 'রামানুজ' ছবির জন্যে কেনা যে-সব picture negative খারাপ ব'লে বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছে, সেইগুলিকে আমার ছবির শ্যুটিং করবার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা আমার ছবির ক্যামেরাম্যান বিভূতি লাহা আমার কাছে সম্পূর্ণ চেপে গেছেন। এখানে বলা দরকার, তখন যুদ্ধের বাজার—কাঁচা ফিল্ম প্রায় দুষ্প্রাপ্য।

এ সম্পর্কে আমি প্রথম জানতে পারলুম, যে-দিন ছবির সমস্ত শ্যুটিং এমন কি পরিচয়-লিপিরও চিত্রগ্রহণ করবার পরে সম্পাদক বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি বসলুম সারা ছবিটার সম্পাদনা করতে। বহু নেগেটিভই দেখলুম, ঝুলকালি বর্ণের। যা থাকে কপালে ব'লে আমরা দু'জনে নাওয়া-খাওয়া, ঘুম পরিত্যাগ ক'রে টানা বাহাত্তর ঘণ্টা ধ'রে সারা ছবিটার সম্পাদনা শেষ করলুম ১৮ই ডিসেম্বর সকাল ১০টা নাগাদ। দুজনেই যে যার বাড়ী চলে গেলুম স্নানাহার ক'রে একটু সহজ স্বচ্ছন্দ হবার জন্যে। আবার বিকেল বেলা একটু ভদ্র চেহারা নিয়ে মিঃ রায়ের ফিল্ম সার্ভিসে পৌঁছলুম, যেখানে ছবির সম্পাদনা করেছি এবং যেখানে ছবির প্রিণ্ট হচ্ছে।

ছবির সম্পূর্ণ প্রিন্ট বেরোতে রাত্রি ১২টা বেজে গেল। সব তোড়জোড় ক'রে নিয়ে উত্তরা সিনেমায় পৌঁছে যখন ছবির প্রদর্শনী শুরু হ'ল, তখন রাত একটা। ছবি দেখতে দেখতে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লুম; ক্রমাগত মনে হ'তে লাগল, আমি তো এ-ছবি করতে চাইনি। আমার মনের মাঝে 'পরিণীতা'র যে ছবি জ্বলজ্বল করছে, সে কৈ, কোথায়? ছবি শেষ হবার পরে

প্রেক্ষাগৃহে যে কুড়ি-পঁচিশ জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হাততালি দিয়ে উঠলেন। আমার মনে হ'ল, তাঁরা ঠাট্টা করছেন। আমার কান্না আর থামে না।

মিঃ রায় আমার কাছে দ্রুত পথে এসে বললেন, "আপনার ছবি খুব ভালো হয়েছে, শুধু শুধু চোখের জল ফেলে কষ্ট পাচ্ছেন কেন ?" জবাবে আমি কান্নার মধ্যেই কোনও ক্রমে বললুম, "স্যার, ছবিটাকে পুড়িয়ে দিতে পারেন ?" মিঃ রায় আমাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, "ছি ছি, এ কি কথা বলছেন ? চলুন, বেলা ১০টায় শ্রী সিনেমাতে সেন্সর।"

বাড়ী ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু ঘুম আর আসে না ; মনটা ক্রমাগত ডুকরে ডুকরে উঠছে। শেষে কখন জানি না, ঘুমিয়ে পড়লুম। নটায় ঘুম ভাঙতে তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে কিছু জলখাবার খেয়ে তৈরী হয়ে নিলুম। যথাসময়ে রায়সাহেবের গাড়ী আসতে তাতে চেপে বসলুম।

আমি পৌঁছুবার কিছু পরেই সেন্সার অফিসার মিঃ ব্যানার্জি এলেন। উনি আমার বাঁ পাশে ব'সে ছবি দেখতে লাগলেন। ছবির একেবারে শেষ শট্‌টিতে তাঁর পক্ষে কিছু আপত্তিকর ব্যাপার ছিল। মুহূর্তের জন্যে একটি কথা ব'লে তাঁর দৃষ্টিটিকে একবার ছবি থেকে সরিয়ে আনতেই সেই আপত্তি-কর অংশটি পার হয়ে গেল। উনি ছবি দেখে খুব খুশী। আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন, সেন্সার সার্টিফিকেটটি তাঁর হাত থেকে নিয়ে আসবার জন্যে। সেটি নিয়েই ছুটলুম ফিল্ম সার্ভিসে। সার্টিফিকেটটির চিত্রগ্রহণ করাবার পরে ল্যাবরেটরীতে তা ডেভেলপড্ ও প্রিন্ট হবার জন্যে দিয়ে আমি ছুটি নিলুম। এখানে বলা দরকার, তখনকার দিনে ছবির সেন্সারিং ব্যবস্থাটি ছিল সম্পূর্ণরূপে কলিকাতা পুলিশের অধীনে এবং আপিস ছিল লালবাজারে।

এখন 'পরিণীতা'র ঐ আপত্তিকর অংশটির কথা খুলে বলি। ছবির একেবারে শেষ শট্‌টি ছিল সদ্যবিবাহিত শেখর ললিতার একান্ত মিলন দৃশ্য। ললিতা ছাদে এসে ছুটে পালাচ্ছে নিজেদের বাড়ীর দিকে, শেখর তার পিছু নিয়েছে। পিছন থেকে সে বলছে, এই, শোন, শোন। ললিতা 'কি' ব'লে যেমনই পিছু ফিরেছে, অমনই শেখর ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল এবং তার পরে সে তার ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে খেল একটি চুমু। 'এই, কেউ দেখতে পাবে,' ব'লে ললিতা শেখর সমেত পাঁচিলের গায়ে সদ্য-ফোটানো দরজা দিয়ে নিজেদের বাড়ীর ছাদে গিয়ে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিল, যার গায়ে লেখা আছে "সমাপ্ত"।

এই চুমু খাওয়ার ব্যাপারটা সন্ধ্যারানীর ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমি গোপনে প্রমোদবাবুকে এইটি অকস্মাৎ করতে বলেছিলুম। প্রমোদবাবু বলেছিলেন, "তারপরে ও যদি ক্ষেপে যায় ?" আমি বলেছিলুম, "কিচ্ছু ক্ষেপবে না ; আর যদিই ক্ষ্যাপে। আমি সামলে নেব।"

সন্ধ্যারাণী ক্ষেপলেন না। কিন্তু ক্ষেপলেন পি. এন. রায় স্বয়ং, যিনি,

হঠাৎ কোথা থেকে ঐ শট্‌টি নেবার সময়েই সেটে হাজির হ'লেন। শট্‌টি নেওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার কাছে দ্রুতপদে এসে বললেন, "এটা কি হ'ল, পশুপতিবাবু? না, না, এ চলবে না—ওটা বাদ দিয়ে শট্‌টিকে আবার নিন।"

খুবই অনিচ্ছার সঙ্গে চুমু খাওয়ার ব্যাপার বাদ দিয়ে শট্‌টি আবার নেওয়া হ'ল। কিন্তু সম্পাদনার সময়ে আমরা প্রথম টেকটিকেই ছবির শেষ শট্ হিসেবে ব্যবহার করেছিলুম। এবং তার ফলে দর্শক-মহলে রীতিমত হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। কিন্তু এই শট্‌টি ছবিতে থাকতে পেরেছিল মাত্র তিন দিন। মিঃ বায়ের কানে আসে, আমরা প্রথম টেক্‌টিকেই ছবিতে জুড়েছি। অমনই তিনি আমাকে আদেশ করলেন, প্রথম টেক্‌টিকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় টেক্‌টি জুড়ে দিতে। আমরা রবিবারে সম্পূর্ণ ছবিটাকে কিছু কিছু re-edit বা পুনঃসম্পাদনা করবার জন্যে বসেছিলুম।

রাত্রি আটটার সময়ে শ্রী সিনেমা থেকে হারুদার (রীতেন কোম্পানীর মালিক মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) কাছ থেকে টেলিফোন এল, "আরে মশাই, কি করছেন? শিগ্‌গির চ'লে আসুন। দর্শকরা আপনাকে দেখতে চাইছে, বলছে—এ-ছবির পরিচালককে আমরা একটু চোখের দেখা দেখতে চাই। সন্ধ্যের প্রদর্শনীতে যা বিক্রি হয়েছে, শ্রীতে এত বিক্রি আর কখনও হয়নি। আমাদের রেকর্ড ছিল 'শেষ উত্তর'-এ ৪১০ টাকা; আজ আমরা বিক্রি করেছি ৪১৮ টাকা। আমরা এক হাঁড়ি রসগোল্লা আনিয়েছি, চট্‌পট্ চ'লে আসুন।" কিন্তু আমি কাল যাব ব'লে কাটিয়ে দিয়ে বাকী এডিটিংয়ে মনোনিবেশ করলুম।

কিছুক্ষণ বাদেই শুনতে পেলুম গুম্‌গুম্ শব্দ, অ্যাণ্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট্ তোপধ্বনি। ছুটে বাইরে এসে আকাশপানে তাকিয়ে দেখলুম, দূরে আকাশে এরোপ্লেনের ক্ষিপ্রগতিতে এদিক ওদিক ভ্রমণ এবং তার থেকে বোমাবর্ষণ। বুঝলুম, জাপানীরা বোমা ফেলছে—সম্ভবত খিদিরপুর ডকে। তখন পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। জাপানীরা পার্ল হারবারে বোমা ফেলছে ইংরেজের জাহাজ ধ্বংস করবার জন্যে। বর্মার রেঙ্গুন অধিকার করবার পরে তারা পদব্রজে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে। এতদূর পর্যন্ত তখনও অবধি জানা ছিল। আজ এই প্রথম কলকাতা আক্রান্ত হ'ল।

পরেব দিন শুনলুম। হাতীবাগান বাজারে বোমা পড়েছে এবং তারই সংঘাতে ক্রাউন সিনেমার কিছুটা প্যারাপেড ভেঙে পড়েছে। সারা কলকাতায় সেদিন থেকেই সিনেমার রাত্রি ৯টার প্রদর্শনী বন্ধ। লোকের ভীড় হ'তে শুরু করল মাত্র ম্যাটিনীতে। সন্ধ্যা ৬টার প্রদর্শনীতেও লোকে যেতে ভয় পাচ্ছে। অতএব শুধু 'পরিণীতা' কেন, সব ছবিরই দারুণ ব্যবসায়িক ক্ষতি হ'তে লাগল। কিন্তু ব্যবসায়ের ব্যাপারটা আমার দ্রষ্টব্য নয়; সে বুঝবেন ছবির ব্যবসায়ীরা।

দু'-পাঁচটা ছবিতে ছোটখাট পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করলেও আমার

'পরিণীতা' ছবিতেই সন্ধ্যারাণী প্রথম নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এবং এই এক অভিনয়েই তিনি চলচ্চিত্রাভিনেত্রীদের মধ্যে প্রথম সারিতে নিজের স্থান ক'রে নেন। বাস্তবিক গৃহস্থ ঘরের অনূঢ়া কন্যা কিংবা সদ্যবিবাহিত নববধূ রূপে সন্ধ্যারাণীকে যেমন মানাত, তেমন আর কাউকেই নয়। অমন গেরস্তালি চেহারা, চলচ্চিত্রোপযোগী অমন মুখমণ্ডল, অমন মিষ্টি তাৎপর্যপূর্ণ চাউনিবিশিষ্ট আর কোনও বাঙালী চলচ্চিত্রাভিনেত্রীকে আমরা আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। ১৯৪২ থেকে শুরু ক'রে ১৯৫৬-১৯৫৭ পর্যন্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি মিষ্টভাষিণী, স্নেহবৎসলা, কোমলপ্রাণা এবং কখনও কখনও নির্যাতিতা গৃহস্থ বধূর ভূমিকায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি চরিত্রাভিনয়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং সাধারণতঃ মলিনা দেবী যে-ধরনের ভূমিকাভিনয় করতেন, সেই ধরনের অভিনয় শুরু করেন। বর্তমানে তিনি প্রৌঢ়া মা, মাসিমা, পিসিমার দরদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সন্ধ্যারাণী সম্বন্ধে একটি কথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে, তাঁর অভিনয় খারাপ হয়েছে, এমন কথা অতি-বড় দুর্মুখেও বলতে পারবেন না, যেমন বলা যায়, তিনি কখনও দজ্জালের ভূমিকাতে অভিনয় করেননি।

'পরিণীতা' মুক্তি পাবার কিছুদিন পরেই আমার ২২সি., অশ্বিনী দত্ত রোডের বাসা বাড়ীতে—যে-বাড়ীতে আমি ১৯৪২ সালের ১লা আগষ্ট থেকে ভাড়াটিয়া হিসাবে বাস করছিলুম—এসে হাজির হলেন একজন যুবক; নাম—অমরেন্দ্রনাথ দাস। তিনি বললেন, তাঁর মাসিমা আমাকে দিয়ে ছবি করাতে চান। জানলুম, তাঁর মাসিমা হচ্ছেন প্রতিভা শাসমল, যাঁর স্বামীর নাম নটেন শাসমল। এই নটেন শাসমল হচ্ছেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বংশের ছেলে এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র।

আমি বললুম, "বেশ ভালো কথা। তা কি ছবি তিনি করতে চান?"

শ্রীদাস বললেন, "সে কথা আপনি মাসিমার সঙ্গেই কইবেন।"

এর পরে শ্রীমতী শাসমল নিজেই এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আশ্চর্য সামান্য হলদেটে ফর্সা চেহারা, কিছুটা খর্বাকৃতি। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও গম্ভীর ধরনের মানুষটি আমাকে বললেন, "ছবির কাহিনী আপনিই নির্বাচন করবেন এবং আমার নেহাৎ অপছন্দ না হ'লে তাই অবলম্বনেই ছবি হবে। শুধু আপনি আমার হয়ে ছবি করবেন, এই পাকা কথাটি দিন।" হেসে বললুম, "পাকা কথাই দিলুম।" উনিও খুশী হয়ে চ'লে গেলেন। ভাবতে লাগলুম, কি ছবি করা যায়! একটা হাসির ছবি করলে কেমন হয়? যেমন 'শেষরক্ষা'? করতে পারলে বেশ ভালোই হবে, এটা মনে মনে সাব্যস্ত ক'রে গেলুম রসা রোড ও লেক অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত শ্রীমতী শাসমলের সেই প্রকাণ্ড সাদা রঙের বাড়ীতে। শ্রীমতী শাসমল এলেন, আমার প্রস্তাব শুনলেন এবং সম্মতি দিলেন।

চুক্তিপত্র সই হয়ে গেল এবং প্রথামত কিছু টাকা অগ্রিম পেলুম। তখনও

পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ কিন্তু পুরো দমেই চলেছে। কলকাতা শহরে আমেরিকান—শাদা ও কালো, দু' রঙেরই সৈন্য গিজ্‌গিজ্‌ করছে।

আমি ছুটলুম গড়পারে বিপ্রদাস স্ট্রীটে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য-মশাইয়ের কাছে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গান ও রচনার স্বত্ব সম্বন্ধে যে অছি-পরিষদ আছে, তিনি তার একজন কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি আমার উদ্দেশ্যের কথা শুনে বললেন, "বইখানির চিত্রস্বত্ব তোমাকে দিতে একটুও আপত্তি নেই; তবে একটা প্রতিবন্ধক আছে। নিউ থিয়েটার্স এক সময়ে এই শেষরক্ষারই চিত্রস্বত্ব কিনতে চেয়েছিল। তুমি জেনে নাও, তাঁরা ছবিটি করতে চান কিনা।"

"ঠিক আছে" ব'লে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেইদিন বিকালেই হাজির হলুম ১ নম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে মিঃ সরকারের সঙ্গে দেখা করতে। দেখলুম, সাহেব (যদিও তখন ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা অবস্থায়) ইতিমধ্যেই এসে গেছেন এবং তিনি একাই ব'সে আছেন। তাঁর সমীপবর্তী হয়ে তাঁকে নমস্কার করলুম এবং তিনি বসতে বলতে আসন পরিগ্রহ ক'রে আমার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলুম। তিনি বললেন, "ভুল লোকের কাছে এসেছেন।"

"ভুল লোক! নিউ থিয়েটার্স-সংক্রান্ত কোনও কিছু জানবার জন্যে—", আমার কথাকে সমাপ্ত করতে না দিয়েই তিনি বললেন, "এটা কিন্তু ছোটাইয়ের ব্যাপার, আপনি তার সঙ্গে দেখা করুন। হ্যাঁ, আপনার 'পরিণীতা' তো খুব ভালোই হয়েছে, শুনেছি।"

"আজ্ঞে", বলে আমতা আমতা ক'রে আমি উঠলুম। কিন্তু আমি পা বাড়াবার আগেই তিনি জিজ্ঞাসাচ্ছলে বললেন, "আচ্ছা, একটা কথা! আমি ৮০ জনকে dismissal letter দিয়েছিলুম, চিঠি পাবার পরে এর মধ্যে ৭৯ জন আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, এক আপনি ছাড়া। আপনি আসেননি কেন?"

আমি মুখ নীচু করেই জবাব দিলুম, "বিদায়পত্র পাবার পরে আপনাকে বিরক্ত করতে আসা উচিত মনে করিনি।" তখন মিঃ সরকার বললেন, "আপনার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার প্রচুর আস্থা আছে। আপনার যদি কোনও স্ক্রিপ্ট (চিত্রনাট্য) তৈরী থাকে কিংবা কোনও স্ক্রিপ্ট তৈরী ক'রে আমার কাছে আসেন, আমি আপনাকে chance দেব—নিউ থিয়েটার্সের দরজা আপনার জন্যে খোলা।"

আমি এর একটি ছোট্ট উত্তর দিলুম—"ধন্যবাদ।" তারপরেই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে এলুম।

"যতদিন নিউ থিয়েটার্স, ততদিন আপনার চাকরী", প্রথম দিনের এই আশ্বাসবাণীর কথাটা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু এতখানি রূঢ় হ'তে আমি পারিনি মিঃ সরকারের ওপর।

পরদিন সকালে বকুলবাগান রোড ও পদ্মপুকুর রোডের সংযোগস্থলে,

ছোটাইদার (কোন্নগরের বিখ্যাত মিত্র পরিবারের সন্তান) বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কইবার পরে জানলুম, 'শেষরক্ষা' ছবি করার সম্বন্ধে তাঁদের কোনও আগ্রহ নেই। চারুবাবুকে সে-কথা জানাতে তিনি আমাকে বিশ্বভারতীর পুলিনবিহারী সেনের সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

শ্রীসেন তখন হিন্দুস্থান পার্কের বাসিন্দা ছিলেন। অমায়িক ভদ্রলোক। তিনি তৎপরতার সঙ্গে 'শেষরক্ষা'র চিত্রস্বত্ব সম্পর্কিত চুক্তিটি সম্পন্ন করলেন। তখন একদিকে শুরু হ'ল চিত্রনাট্য লেখা এবং অপর দিকে শিল্পী নির্বাচন। রবীন্দ্রনাথের গানের জন্যে স্বাভাবিকভাবেই অনাদি ঘোষ দস্তিদারকে সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে নেওয়া হ'ল; অবশ্য তিনি একা নন। তাঁর সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের সমন্বয় সাধনের জন্যে এলেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর।

অনাদিবাবু আমাকে বললেন, "ইন্দুমতীর ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য মংকুকে নিন না; মংকুর ভালো নাম হচ্ছে বিজয়া দাশ।" দিনস্থির ক'রে একদিন বিকেলের দিকে অনাদিবাবু শ্রীমতী দাশকে নিয়ে এলেন আমার অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ীতে। আমি আমার ক্যামেরাম্যান বিভূতি লাহাকে (বিভূতি লাহা, শব্দযন্ত্রী যতীন দত্ত, ব্যবস্থাপক বিমল ঘোষ এবং রসায়ন-গারিক শৈলেন ঘোষাল—এই চারজনের সমন্বয়ে একদা গ'ড়ে উঠেছিল 'অগ্রদূত' পরিচালক-গোষ্ঠী। বর্তমানে এঁদের মধ্যে মাঝের দু'জন পরলোক-গমন করায় এবং শেষেরজন নিজেকে সরিয়ে নেওয়ায় মাত্র একক বিভূতি লাহাই 'অগ্রদূত' হিসাবে চিত্র-পরিচালনায় ব্যাপৃত) আগে থাকতে আনিয়ে রেখেছিলুম শিল্পীর চেহারার চলচ্চিত্রোপযোগিতা সম্বন্ধে বিশেষ নিরীক্ষণ ক'রে দেখবার জন্যে।

আমি দেখলুম, মিস্ দাশের মুখ আদৌ চলচ্চিত্রোপযোগী নয়। কিন্তু সর্বনাশ করলেন বিভূতি লাহা। তিনি একটুক্‌রো কাগজে লিখলেন— Take her. You can't get better (এঁকে নিন, এঁর থেকে ভালো আশা করবেন না)। তিনি এই কাগজের টুক্‌রোটা যেমনই আমার হাতে দিতে যাবেন, অমনই অনাদিদা মাঝখান থেকে ছোঁ মেরে সেটিকে হস্তগত করলেন এবং খুলে প'ড়ে আবার সেটিকে মিস্ দাশের অবগতির জন্য চেঁচিয়ে পড়লেন আর সঙ্গে সঙ্গেই ব'লে উঠলেন—"ব্যস্, হয়ে গেল, নিন ছবি শুরু করুন।"

আমি তবু আমতা আমতা করে বললুম, "কয়েকটি মেক্-আপ টেস্টের পরে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বিজয়া দাশ তখন সিভিল সাপ্লাইয়ে চাকরী করেন। আমি তাঁকে সহসা কাজ থেকে ইস্তফা দিতে বারণ ক'রে মেক্ আপ টেস্টের দিনস্থির করলুম কালী ফিল্মস্ স্টুডিওতে। কিন্তু কোনও প্রসাধনেই মিস্ দাশের মুখমণ্ডল চলচ্চিত্রের উপযোগী মনে হ'ল না অন্তত আমার কাছে। "আর গোলমাল করবেন না, মশাই, নিয়ে নিন", এই কথায় কিন্তু অটল রইলেন আমার ক্যামেরাম্যান বিভূতি লাহা।

অতএব শেষ পর্যন্ত বজায় রইলেন মিস্ দাশ ইন্দুমতী চরিত্রে। গদাইয়ের ভূমিকার জন্যেও কোনও মনোমত শিল্পীকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করলুম জীবেন বসুকে। আমি চন্দরদা' ও ক্ষান্তমণি চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে ছবি বিশ্বাস ও শ্রীমতী মলিনাকে নির্বাচন করেছিলুম। কিন্তু শ্রীমতী শাসমল তাঁদের আর্থিক চাহিদাকে মেটাতে কোনওরকমে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ঐ ভূমিকা দুটিতে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেবা দেবীকে নিতে বাধ্য হই। প্রোডাক্শান ম্যানেজার হিসেবে বহাল হলেন অমরেন্দ্রনাথ দাশ। ভদ্রলোক অত্যন্ত ভালো মানুষ; কিন্তু প্রোডাক্শান সম্বন্ধে কোনও রকম অভিজ্ঞতা নেই।

দেখা গেল, আসলে মিসেস শাসমলই ও ব্যাপারটার দেখাশুনো করছেন। ভদ্রমহিলার প্রচুর উৎসাহ। কিন্তু শ্যুটিং শুরু করে আমাকে প্রতিপদে ঠেক খেতে হ'ল। একদিন দিনের প্রথম শট্ নেবার জন্যে লাইটিং, শিল্পীদের সংলাপ বলানো প্রভৃতি সব শেষ করেও শট্‌টি নিতে পারিনি ইন্দুমতীর পরণের ব্লাউজটি তখনও পর্যন্ত এসে পোঁছোয়নি ব'লে। ঝাড়া দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরে দেখি, শ্রীমতী শাসমল ব্লাউজটি সদ্য তৈরী করিয়ে নিয়ে আসছেন সেটে।

শ্যুটিং করছি, কিন্তু আমার মন উঠছে না। শিল্পীদের ভাবভঙ্গী, চলাফেরা, সংলাপ বলার ধরন, সবই দেখিয়ে দিচ্ছি আমার বিদ্যে, বুদ্ধি, বিবেচনা মত। কিন্তু অধিকাংশ শিল্পীই আমার আশানুরূপ স্তরে পৌঁছুতে পারছেন না। বিশেষ করে রতীনবাবু, সংলাপ বলতে গেলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যেতে লাগলেন। তিনি কিছুতেই স্বচ্ছন্দ হতে পারলেন না। রেবা দেবী তাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী অভিনয় করতে লাগলেন। কিন্তু একটি ভূমিকাকে আপন ক'রে নেওয়া, যা হচ্ছে চরিত্রাভিনয়ের মূল কথা, সে ক্ষমতা তাঁর কোথায়? আর সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক মনে হতে লাগল বিজয়া দাশকে ইন্দুমতীর ভূমিকায়।

ইন্দুমতী এমনই একটি চরিত্র, যাকে দেখে প্রতিটি দর্শক নিজের প্রিয়তমা ব'লে মনে করবে। এ ইন্দুমতীকে দেখলে তো মানুষ মুখ ঘুরিয়ে নেবে। কথায়ই আছে, পহলে দর্শনডারি (দর্শনডালি), পিছে গুণবিচারি। সেই দর্শনডালি, যার ৯০ ভাগই আছে নারীর মুখাবয়ব ও চোখে, তা এখানে যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শিক্ষিতা, তরুণী, মৃদু মিষ্টভাষিণী মিস্ দাশ আমাকে ক্ষমা করবেন, তাঁর মুখাবয়ব কোনও দিনই সাধারণের দৃষ্টিলোভী নয়। তার ওপর তাঁকে কেমন যেন নিরুত্তাপ ব'লে মনে হত; মনে হত, ওঁর আকর্ষণী ক্ষমতা একেবারেই নেই!

একদিন শ্যুটিং চলা কালে তিনি আমাকে স্পষ্ট জিজ্ঞেসই করেছিলেন, "আচ্ছা পশুপতিবাবু, শটের শেষে আপনি বলেন ঠিক আছে; কিন্তু মনে হয়, ওটা আপনি মুখে বলেন, মন থেকে বলেন না। ঠিক ব্যাপারটা কি, বলুন তো?"

প্রথমটা আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলুম। কিন্তু উনি পীড়াপীড়ি করায় শেষ পর্যন্ত আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলুম, "দেখুন মিস্ দাশ, আপনাকে আমার কেমন cold লাগে, আপনার মধ্যে সেক্স বস্তুটি নেই, যার দ্বারা আপনি পুরুষকে সম্মোহিত করতে পারেন।" "কিন্তু কত পুরুষ যে আমার পিছনে ঘুরঘুর করছে?" জবাবে তিনি এ-কথা বলতে আমি বলেছিলুম, "কি জানি? বিচিত্র এ জগৎ!"

'শেষরক্ষা'র চিত্রগ্রহণ পর্ব শেষ হ'ল এবং তারপরে তার সম্পাদনাও। একদিন 'রূপবাণী' চিত্রগৃহে তার একটি পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী করা হ'ল। ছবি দেখে আমার বদ্ধমূল ধারণা হ'ল, এ-ছবি খুব বেশী দিন চলবে না। তখন 'রূপবাণী'তে জোর কদমে চলেছে শৈলজানন্দের 'শহর থেকে দূরে'। ঐ ছবির পরেই মুক্তি পাবে 'শেষরক্ষা'। সে কবে, কে জানে? কিন্তু দেখলুম শ্রীমতী শাসমলের অদম্য উৎসাহ। তিনি ছবির মুক্তির জন্যে অপেক্ষা না করেই আমার সঙ্গে নতুন চুক্তি করলেন একেবারে টানা তিন বছরের জন্য। যতদূর মনে আছে, শর্ত হয়েছিল উনি মাসে আমাকে ৫০০ টাকা করে দেবেন এবং প্রতিটি ছবির জন্যে একটা মোটা অঙ্ক। আমাকে বললেন, খান দুই পছন্দমত কাহিনীর চিত্রস্বত্ব কিনতে। তাঁর মত নিয়ে আমি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' এবং রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' সম্পর্কে চুক্তি সাধন করি।

শ্রীমতী শাসমলের লেক অ্যাভিনিউয়ের বাড়ীটিকে সেনাবিভাগ ভাড়া নেওয়ায় তিনি তখন ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীটের ত্রিতলের কয়েকখানি ঘরভাড়া নিয়ে বসবাস করছিলেন। নিরিবিলিতে আমার চিত্রনাট্য লেখবার সুবিধার জন্যে তিনি ঐ লেক অ্যাভিনিউয়েরই অপর একখানি বাড়ীর একতলায় একখানি বড়ঘর বারান্দা সমেত ভাড়া নিয়ে সেইখানে ব'সে লেখবার সকল রকম সুবিধা করে দিলেন। এমন কি, ঐ ঘরে বিশ্রাম করবার জন্যে শয্যা-সমেত একখানি বড় খাটও পাতিয়ে দিলেন।

আমি শুরু করলুম, 'কবি'র চিত্রনাট্য লিখতে। কিন্তু কেন জানি না, কাজে উৎসাহ পাই না, ফলে চিত্রনাট্য মোটেই এগোয় না। এমন সময়ে আগস্ট মাসে (১৯৪৪) মাদ্রাজ থেকে এস. আর. হেমাদের এক টেলিগ্রাম এসে হাজির —"আমার আপিস থেকে রাহা খরচ নিয়ে শিগ্‌গির চ'লে আসুন, ওরাই আপনার টিকিটের বন্দোবস্ত করে দেবে।" এম্পায়ার টকী ডিস্ট্রিবিউটার্সে'র (মিঃ হেমাদের প্রতিষ্ঠান) আপিস থেকে টিকিট ও রাহা খরচ নিয়ে মাদ্রাজ মেলে চেপে বসলুম ৺মায়ের নাম স্মরণ ক'রে। হেমাদ সাহেবের লোক আমাকে স্টেশন থেকে সোজা নিয়ে গিয়ে তুললেন উডল্যাণ্ডস্ হোটেলের একটি কক্ষে। কানে এল, তার পাশের ঘরেই আছেন উদয়শঙ্কর। দিনটা শুয়ে বসেই কেটে গেল।

পরদিন প্রাতরাশ খাবার পরেই মিঃ হেমাদ আমাকে নিয়ে গেলেন উদয়-শঙ্করের কাছে। উদয়শঙ্কর বললেন, তিনি একটি নৃত্যপ্রধান ছবি করতে

চলেছেন, আমাকে তার চিত্রনাট্য লিখতে হবে এবং পরিচালনায় তাঁর সহকারী হ'তে হবে। এর বিনিময়ে তিনি আমাকে পারিশ্রমিক দেবেন মাসে করমুক্ত ২,৫০০ টাকা ক'রে। আমি বললুম, "কিন্তু আমি একজন চিত্রপরিচালক, আপনার সহকারী হই কি ক'রে? বিশেষ যখন, পরিচালনা সম্বন্ধে আপনার কোনই অভিজ্ঞতা নেই।"

"কিন্তু তা'ছাড়া তো হয় না, ব্যারনেট চিনুলাল, যিনি ছবিতে অর্থলগ্নী করছেন, তিনি আমারই নাম পরিচালক হিসেবে দেখতে চান", বললেন মিঃ শঙ্কর। আমার জবাবঃ "আপনি নৃত্যপরিচালক, কাহিনী-রচয়িতা, প্রযোজক ইত্যাদি যত খুশীভাবে আপনার নাম দিন, কিন্তু পরিচালক হিসেবে নাম থাকবে আমার।" কেউই কারুর কাছে ঘাড় নত করতে রাজী হলুম না। অতএব তৃতীয় দিনেই আমি মাদ্রাজ থেকে কলকাতা রওনা দিলুম। এটা ভালো করেছি, কি মন্দ করেছি, তা আজও আমি বুঝতে পারি না।

কলকাতায় ফিরে আবার সেই আমার জন্যে ভাড়া-করা লেক-অ্যাভিনিউয়ের বাড়ীতে যাতায়াত করি। ব'সে ব'সে পড়ি 'কবি' বইটি চারবার, পাঁচবার। কিন্তু কাগজে কলম ঠেকাই না। মিসেস শাসমলের কাছ থেকে কোনও রকম তাড়া নেই। লেখবার টেবিলের সামনে চেয়ারে ব'সে চেয়ে চেয়ে দেখি, সামনেই বড়ো খাটে পরিপাটি বিছানা পাতা। কিসের জন্যে, কার জন্যে, কে জানে?

নভেম্বর মাসে আচম্বিতে একটি ঘটনা ঘটল। সেদিনের বিখ্যাত প্রচারবিদ্, আমার বন্ধু সুধীরেন্দ্র সান্যাল আমাকে নিয়ে গেলেন মিঃ বি. এল. খেমকার কাছে। তিনি লাহোরের পাঞ্চোলী আর্ট্‌স্-এর হয়ে একখানি হিন্দী ছবি করবার জন্যে আমার সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হলেন এবং একটি দিন স্থির ক'রে লাহোর রওনা হ'তে বললেন। কি কাহিনী, তা নাকি সেখানে গিয়ে স্থির হবে। 'যা থাকে কুল কপালে' ব'লে নভেম্বরের একেবারে শেষের দিনটিতে পাঞ্জাব মেলে চেপে বসলুম এবং তৃতীয় দিন বেলা ১০টা নাগাদ লাহোর স্টেশনে পেঁছে মিঃ পাঞ্চোলীর লোকের সঙ্গে এলফিন্‌স্টোন হোটেলে গিয়ে উঠলুম।

বলতে ভুলে গেছি, আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন আমার সহকারী রূপে কাজ করবার জন্যে সুধীরেন্দ্র সান্যালের বড়ছেলে সৌম্যেন্দ্রনাথ সান্যাল। বলা বাহুল্য, সহকারী পরিচালক হিসেবে তার কোনই পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। তবু তাকে নিতে হ'ল সুধীরেন্দ্রে উপরোধে, অনেকটা ঢেঁকি গেলার মত।

দ্বিপ্রহরের আহারাদির পরে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লুম এবং একটি টঙ্গা ভাড়া ক'রে মুসলিম টাউন পাঞ্চালী স্টুডিও অভিমুখে রওনা হলুম! পেঁছেই পাঞ্চোলী সাহেবের কামরার অভিমুখে নীত হবার পথে নজরে পড়ল, একটি কক্ষের বাইরে আঁটা পালিশকরা বোর্ডের ওপর লেখা রয়েছে ইংরেজী TAJ (তাজ)। তার নীচে লেখা গোটা নামটা

হচ্ছে—ইম্‌তিয়াজ আলি তাজ। মিঃ পাঞ্চোলীর ঘরে ঢুকতে তিনি আমার কুশলাদি এবং পথে কোনও রকম অসুবিধা হয়েছে কিনা ইত্যাদি সৌজন্য-মূলক প্রশ্ন করবার পরে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার হাতে কোনও কাহিনী আছে কিনা।

আমি যখন নেতিসূচক উত্তর দিলুম, তখন তিনি আমার হাতে Little Lord fauntleroy এবং Eastdyne বই দু'খানি তুলে দিয়ে বললেন, ঐ দু'খানি বইয়ের কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে একটি দর্শক চিত্তজয়ী কাহিনী রচনা করতে। আমি বই দুখানি হাতে নিয়ে তথাস্তু ব'লে বেরিয়ে এলুম বটে, কিন্তু টঙ্গা ক'রে হোটেলে ফিরে যাবার পথে—পথটি অন্তত দু'তিন মাইল হবে—মনে মনে ভাবতে লাগলুম, আমি আদৌ গল্পলেখক নই, একজন চিত্রনাট্যকার। আমাকে কাহিনী দাও, আমি তার থেকে যথাসম্ভব ভালো চিত্রনাট্য লিখে দেব। কিন্তু একি দুর্দৈব! আমাকে কাহিনীও তৈরী করতে হবে? পারব তো? হবে তো?

পরদিন সকালবেলা আমার হোটেল-কক্ষে এসে হাজির হলেন বিজয়া দাশের বড়দিদি মিসেস গৌরী লাল, এডভোকেট মদনলালের স্ত্রী। তিনি এসেই বললেন, "চলুন আমার বাঙলোয়; আমি থাকতে আপনি হোটেলে থাকবেন কোন্ দুঃখে?" একেবারে নাছোড়বান্দা।

অগত্যা আমি তাঁকে বললুম, "কাল সকালে আপনার ওখানে যাব।" কাল সকালে এসে নিয়ে যাবেন ব'লে তিনি তখনকার মত বিদায় নিলেন। আমি Little Lord Fauntleroy বইখানা দ্রুত পড়ে ফেললুম। তারপরে খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে পাড়ি দিলুম স্টুডিওতে। সেখানে পরিচিত হলুম রামনারায়ণ দাবে, তাঁর ভাই রবীন্দ্র দাবে, বিখ্যাত শব্দযন্ত্রী ঈশান ঘোষ প্রমুখ ওখানকার বহু কর্মীর সঙ্গে। ঈশান ঘোষ কলিকাতার অরোরা স্টুডিওর শম্ভু সিংয়ের ছাত্র। শম্ভু সিং শুধু সাউণ্ড রেকর্ডিস্টই নন, তিনি হচ্ছেন রীতিমত সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার; তাছাড়াও বহু যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। ঈশান ঘোষও গুরুর সুযোগ্য চেলা। যন্ত্রপাতি নিয়েই তিনি মেতে আছেন রাতদিন। কত রকম গ্যাজেট যে মাথা খাটিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছেন, তার হিসাব দিতে পারব না।

Little Lord Fauntleroy শেষ ক'রে সবে Eastdyne পড়তে আরম্ভ করেছি, এমন সময়ে পাঞ্চোলী সাহেব জানালেন, তিনি বোম্বে টকীজের সুখ্যাত সংলাপ-লেখক জে. এস. কাশ্যপকে আনিয়েছেন ছবির সংলাপ লেখবার জন্যে। কাশ্যপসাহেব অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ; বিড়ি সিগারেট, এমন কি চা পর্যন্ত ছোঁন না; চায়ের বদলে পান করেন ফলের রস। লাহোরে প্রচুর কমলালেবু পাওয়া যায়, তারই এক গেলাস রস ওঁর সকালের পানীয়। উনি এক একটি দৃশ্য আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তৈরী করেন এবং তার বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সংলাপ লেখেন।

এদিকে মাস ডিসেম্বর কেটে জানুয়ারী পড়েছে, কলকাতা থেকে চিঠি

গেল আমার স্ত্রী আমার শিশুপুত্র এবং আমার শাশুড়ী ঠাকরুণকে নিয়ে লাহোরে আসতে চান। কাজেই কিছু খোঁজাখুঁজির পরে নবগঠিত এলাকা কিষাণনগরে একটি নতুন বাড়ীর একতলায় আমাদের ভালোভাবে সঙ্কুলান হতে পারে, এমন একটি অংশ ভাড়া নিলুম। নির্দিষ্ট দিনে ওঁরা এসে হাজির হলে আমিও শ্রীমতী গৌরী লালের আতিথ্য ত্যাগ ক'রে কিষাণনগরের বাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। শ্রীমান্ সৌম্যেন মিসেস লালের বাঙলোতেই থেকে গেল।

কর্মক্ষেত্রে আবার বিপাক। হঠাৎ জে. এস. কাশ্যপকে বিদায় দিলেন পাঞ্চোলী সাহেব এবং আমার ওপর আদেশ হ'ল তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে চিত্রনাট্য লেখবার জন্যে। সেইমতই কাজ চলতে থাকল। মিঃ পাঞ্চোলীর বাড়ীতে রোজ সকালে যাই, তাঁর ভাবনাচিন্তা অনুসারে লিখি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, মন আদৌ বসছে না, মনে হচ্ছে, এ নিছক পণ্ডশ্রম।

একদিন হঠাৎ মিঃ হেমাদ গিয়ে হাজির। তিনি আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, ভগবান চেয়েছিলেন, আপনি উত্তরে আসবেন, আমি আপনাকে দক্ষিণে পাঠাতে চাইলে হবে কেন? (তিনি কিছুদিন আগে আমায় মাদ্রাজ যাবার কথা ইঙ্গিতে বলেছিলেন)। এর কয়েকদিন পরে স্টুডিওয় গিয়ে দেখলুম, খানকয়েক গানের রেকর্ডিং হচ্ছে। শুনলাম, আমারই ছবির গান।

গান ক'খানি লিখেছেন হিন্দী ছবির জগতে বিখ্যাত গীতিকার ডি. এন. মধোক এবং সঙ্গীত-পরিচালক হচ্ছেন এক মুসলমান ভদ্রলোক—নামটা তাঁর আজ আর মনে নেই—হাল্কা, জনপ্রিয় সুর রচনায় তাঁর বেশ দখল ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! গল্প কোথায়, গানের জন্যে বিশেষ পরিস্থিতি কোথায়, কিছুই জানা নেই—সঙ্গীত-গ্রহণ হচ্ছে! শব্দযন্ত্রী ঈশান ঘোষ আমার মনোভাব বুঝে আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, "এদের কাণ্ডই এই। এরা গান তোলবার পরে তার জন্যে কাহিনীর মধ্যে পরিস্থিতি রচনা করে।"

মিঃ মধোকের কি জানি কেন, আমাকে খুব ভালো লেগে গেল। তিনি বললেন, আমি আপনাকে কাহিনী রচনায় সাহায্য করব। শুধু তাই নয়, আপনি আমার কথা মেনে চললে আপনি দেখবেন, আপনি হিন্দী ছবির জগতে একজন নাম-করা পরিচালক হয়ে গেছেন, প্রযোজকরা আপনার পিছনে দৌড়ুচ্ছে। তাঁর কথা মানার অর্থ হচ্ছে, আমাকে রেস ও জুয়া খেলতে হবে। স্ত্রীলোকের বাড়ী যেতে হবে এবং অল্পবিস্তর মদ্যপান করতে হবে।

বলা বাহুল্য, আমি তাঁর কথা মানতে পারিনি। তিনি কিন্তু সহজে হার মানবার পাত্র নন। তিনি ধাওয়া ক'রে এলেন আমাদের কিষণনগরের বাড়ীতে এবং আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে অনুরোধ করলেন, আমি যাতে তাঁর কথা মেনে চলি, সে-বিষয়ে আমাকে বলবার জন্যে। আমি ইতিমধ্যেই আমার সহধর্মিণীকে মিঃ মধোকের কথা বলেছিলুম। তাই তিনি মৃদু হেসে তাঁকে সবিনয়ে বললেন, "ওঁর ভালোমন্দ উনিই বোঝেন; এ-বিষয়ে আমার কথা

কওয়া উচিত হবে না।" আমার স্ত্রীর এ-হেন উত্তর শুনে মিঃ মধোক ভগ্নোদ্যম হয়ে চলে গেলেন। এর পরে আর কোনও দিন তিনি এ কথা উত্থাপন করেন নি।

একদিন বিকেলে মিঃ পাঞ্জালী আমাকে হঠাৎ জানালেন, পরদিন বেলা ১১টায় আমার ছবির মহরৎ, আর্টিস্ট হচ্ছেন পদ্মা দেবী। হ্যাঁ, আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্র-জগতের পদ্মা দেবী। আমার জানা ছিল, উনি ঐ সময়ে লাহোরের বিডন রোডের উপর একখানি বাড়ীতে থাকতেন। আমি কয়েকদিন তাঁর বাড়ীতেও গেছি। নারকেল ফাটিয়ে মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েও গেল। উনি ছবির প্রধান চরিত্র, একটি বাচ্চা ছেলের স্নেহপরায়ণা মায়ের ভূমিকাতে অভিনয় করবেন। ছবির নাম দেওয়া হয়েছে 'পাকদণ্ডী' (পায়ে হাঁটা পথ)।

তখন মে মাস। লাহোরে অসম্ভব গরম। এই গরমে আমার তিন বছরের ছেলে জ্বরে পড়ল—জ্বর ১০৩°-১০৪°র কমে নামছে না। পাড়ার পাঞ্জাবী ডাক্তার এর জন্যে আদৌ চিন্তান্বিত নয়; তিনি শিশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবস্থা দিয়েছেন—বার্লি'র জল, আর সোডা ওয়াটার। তিন দিন চার দিনেও কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না দেখে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লুম; স্থির করলুম, ওকে কলকাতা নিয়ে যাব সপরিবারে।

আমার পারিবারিক বন্ধু অভয় মজুমদার কিছুদিন হ'ল কলকাতা থেকে আমার ওখানে এসে উঠেছে। তার হেফাজত সমস্ত রেখে আমরা রওনা দিলুম। লাহোর স্টেশনে আমার সহকারী সৌমেন জানাল, কলকাতা থেকে মিঃ বি. এল. খেম্‌কা এসেছেন। তাই তাঁর অনুরোধ, সম্ভব হ'লে আমি যেন দু'তিনটে দিন লাহোরে থেকে যাই। গাড়ীতে চেপে বসেছি, এই অবস্থায় এই খবর শুনেও আমি মত পরিবর্তন করতে পারলুম না; কলকাতায় চলে এলুম। এবং আশ্চর্য! কলকাতায় এসে শিশু-চিকিৎসক ডঃ ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরীর ওষুধ পেটে পড়তেই আমার ছেলে দু' দিনের মধ্যে ভালো হয়ে গেল।

সাত দিন কেটেছে কিনা সন্দেহ, লাহোর থেকে মিঃ খেম্‌কার চিঠি পেলুম, আমার আর লাহোরে ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। ব্যস খতম, লাহোরের লীলা খেলা খতম; বন্ধুকে চিঠি লিখে দিলুম, সমস্ত বিলি-ব্যবস্থা ক'রে ওখানকার পাট চুকিয়ে কলকাতায় চলে আসতে।

অতএব আমি মিসেস শাসমলের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে জানালাম, তাঁর কাছ থেকে ছ'মাসের ছুটি নিয়ে লাহোরে গিয়েছিলুম; তা শেষ হয়েছে। আমি আবার তাঁর চাকরীতে যোগ দিলুম। কিন্তু শ্রীমতী শাসমলকে তেমন খুশী দেখলুম না, মুখে চোখে যেন কেমন অন্যভাব ফুটে উঠছে। আমতা আমতা ক'রে ঠিক কি বললেন, তা বুঝতে পারলুম না। তবে দু'দিন পরে বুঝলুম, যে-দিন তাঁর অ্যাটর্নী তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এক লম্বা

চিঠি পেলুম নানা রকম খেসারৎ দাবি ক'রে। চিঠিটি নিয়ে গেলুম আমার শুভানুধ্যায়ী মিঃ পি. এন. রায়ের কাছে। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন অ্যাটর্নী সুধীর রায়চৌধুরীর কাছে। তিনি সমস্ত জেনে নিয়ে ঐ চিঠির জবাব দিলেন এবং এর পরে মিসেস শাসমল আমার নামে মামলা দায়ের করলেন হাইকোর্টে। আমাদের তরফে ব্যারিস্টার নিযুক্ত হলেন প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়।

হঠাৎ উড়ো খবর শুনলুম, দুই অ্যাটর্নীতে নাক শোঁকাশুঁকি হয়ে গেছে; স্থির হয়েছে, সুধীরবাবু এই মামলাটিতে হারবেন এবং আর একটি কোন মামলায় জিতবেন। আপোসের ব্যাপার, এতে মক্কেলের কিছু করণীয় নেই। হ'লও তাই। সুধীরবাবু আমাকে কোনও কিছু উপদেশ না দিয়েই সওয়ালের সম্মুখে উপস্থিত করলেন জজ সুধীরঞ্জন দাশের এজলাসে এবং যদিও মিসেস শাসমল তাঁর চাহিদা মত খেসারৎ পেলেন না, কিন্তু আমিও আমার ক্ষতি-পূরণের দাবিটি মিটিয়ে পেলুম না। মাঝখান থেকে ব্যারিস্টার এবং অ্যাটর্নীর খরচা বাবদ বেশ কয়েক হাজার টাকা আমাকে অর্থদণ্ড দিতে হ'ল। দেখলুম বটে, অ্যাটর্নীর খেয়াল খুশীর খেলা।

এই সব ঝামেলা মিটতে ১৯৪৬ সালেরও দু'একটা মাস কেটে গেল। শ্রীমতী শাসমল আমার সঙ্গে তাঁর তিন বছরের চুক্তি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আমি বেকার। মিঃ পি. এন. রায়ের কাছে প্রস্তাব দিলুম, 'অরক্ষণীয়া'র বাঙলা সংস্করণটা করলে কেমন হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, ঠিক আছে, করুন। আগে নীতীন বসুর ভূতপূর্ব সহকারী সুধীর সেন ওর যে হিন্দী সংস্করণ তৈরী করেছিলেন, সেটি আমাকে দেখানো হ'ল। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, ছবিটি আমার জঘন্য লেগেছিল। সাধারণেও ছবিটিকে নেয়নি।

আমি আমার মনের মত করে ওর চিত্রনাট্য লিখলুম। মিঃ রায়কে প'ড়ে শোনালুম; ওঁর খুবই ভালো লাগল। ছবিটির শ্যুটিং শুরু হয়ে গেল রবীন মজুমদার ও সন্ধ্যারাণীকে নায়ক-নায়িকা হিসেবে নিয়ে। আমি চেয়েছিলুম সন্ধ্যারাণীকে ছবিতে কালো দেখাবে। রূপসজ্জাকর রমেশ বসুকে দিয়ে বিশেষ মেক-আপ করিয়ে আমি মহরত-শট্‌টি নিতেও গিয়েছিলুম। কিন্তু অবুঝ সন্ধ্যারাণী নিজের মেক-আপ আয়নায় দেখে এমন কেঁদে কেটে অস্থির হ'য়ে উঠল যে, আমি তার সেই মেক-আপ বর্জন করে তার সাধারণ মেক-আপেই সম্মত হলুম ঘোরতর অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

শুটিং কয়েকদিন হ'তে না হ'তেই জিন্না সাহেবের সেই বহু ঘোষিত Direct Action Day, ১৬ই আগস্ট এসে পড়ল। সেদিন সন্ধ্যার দিকে অসম্ভব বৃষ্টি পড়েছিল। ফলে বৃষ্টির আওয়াজের জন্যে শুটিংয়ে বাধা পড়ায় শ্যুটিং চলেছিল প্রায় রাত্রি দশটা পর্যন্ত। কিছু কর্মীকে হরিনাভি ও প্রায় বারুইপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আমাদের মোটর যখন বৌবাজারের কিছুটা উত্তর পর্যন্ত গেল, তখন এস্‌প্ল্যানেডের পাঁচ রাস্তার সংযোগস্থল

থেকে শুরু ক'রে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের ওপর স্থানে স্থানে দেখলুম, মুসলমানরা খোলা তরোয়াল নাচাতে নাচাতে নেচে বেড়াচ্ছে।

সন্ধ্যারাণীকে তাঁর কলেজ স্ট্রীটের বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যখন আমাদের ঢাকা গাড়ী ওয়েলেসলী স্ট্রীট অভিমুখে ফিরে চলেছে, তখন গাড়ীর ড্রাইভার শ্যামবাবু আমার হাতে স্টার্টিং হ্যান্ডেলটি দিয়ে বললেন, গাড়ীর কাছাকাছি কেউ এলেই ওইটা জোর নেড়ে নেবেন, আমি এদিকে গাড়ীকে জোরসে বেঁকিয়ে আবার সোজা ক'রে নিয়ে ছুটব। ওয়েলিংটন-ওয়েলেসলীর মোড় পেরুতেই নজরে পড়ল ছোট ছোট জটলা।

গাড়ী যখন ম্যাজেস্টিক সিনেমা ছাড়িয়েছে, তখন দু'একজন জটলা ছেড়ে গাড়ীর দিকে ঝুঁকে এল; কিন্তু শ্যামবাবুও গিয়ার বদলে গাড়ীকে জোরে চালিয়ে দিলেন, আমাকে আর স্টার্টিং হ্যান্ডেলের কসরত করতে হ'ল না। এরপরে ফাঁকা রাস্তা ধ'রে গাড়ী চালিয়ে শ্যামবাবু আমাকে আমার অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ীতে পোঁছে দিয়ে চ'লে গেলেন গাড়ী নিয়ে।

শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী নিদারুণ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। তিন চার দিন সারা কলকাতা জুড়ে সে কি বিধ্বংসী তাণ্ডব! সুরাবর্দী সাহেব তখন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী। মনে হ'ল, তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। মুসলমানদের হত্যালীলার বদলা নিতে কলকাতা শহরের হিন্দুরাও কোমর বেঁধে লাগল। পার্ক-সার্কাস, রাজাবাজার, বেকবাগান প্রভৃতি মুসলমান প্রধান অঞ্চল ছেড়ে হিন্দুরা চ'লে আসতে লাগল হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে। মুসলমানরা শুধু হত্যাই করল না, আমাদের মা-বোনদের চরম বেইজ্জত করতে লাগল। হিন্দুরা ওটা করেনি।

আমার বাড়ীর তেতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদিন দেখলুম একজন মুসলমান ফেরিওলাকে আধমরা ক'রে রাস্তার পিটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল; আবার দেখলুম, একজন মুসলমান কনেস্টবেল দৌড়োচ্ছে, আর তার পিছনে দৌড়ে এসে পাড়ার জোয়ান গয়লাপো পাকা বাঁশের বাড়ি তার মাথায় এমন সজোরে ঘা দিলে যে, তার মাথাটা প্রায় দু'ফাঁক হয়ে অঝোরে রক্ত ঝরতে লাগল। সেই অবস্থায় কনেস্টবেলটি দৌড়ে চলল। পরে শুনলুম, সে কাছের দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত গিয়ে তার মধ্যেই পড়ে মারা গেছে।

শুধু শহর-কলকাতাই নয়, এই দাঙ্গা সারা বাঙলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল—কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে আরম্ভ ক'রে সুদূর নোয়াখালী, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, কোথায় দাঙ্গা হয়নি? এই দাঙ্গার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান এবং (পূর্ব ও পশ্চিম) পাকিস্তানে বিভক্ত হয়ে দু' টুকরো হ'ল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ পৃথিবীতে বোধ হয় এই প্রথম ও শেষ। গান্ধীজীর প্রচুর আপত্তিকে অগ্রাহ্য ক'রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সমেত সমগ্র কংগ্রেস হাই-কম্যান্ড যখন এই বিভক্তিকরণকে মেনে নিল, তখন প্রতিবাদস্বরূপ গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ পর্যন্ত ত্যাগ ক'রে বসলেন এবং নিজেকে হরিজন সেবায় নিযুক্ত

করলেন। এবং এরই জন্যে তিনি দিল্লীর ডাঙ্গি-কলোনীতে বাস করতে লাগলেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির মোহে সেদিন কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ড যে পাপ করে গেছেন, আজও অবধি আমরা তারই প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি। ভাগ্য ভালো যে, সুচতুরা ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানকে বাঙলা দেশে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছেন; নইলে দু'দিকে দুটি রণাঙ্গন সৃষ্টি করে পাকিস্তান আমাদের তুর্কীনাচন নাচাত।

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করলেন। কিন্তু কি শর্তে, তা আমরা আজও জানি না। শোনা যায়, ব্রিটিশ সরকার যে-শর্তাবলী স্থির করেছিলেন এবং যাতে সম্মতিসূচক সই দিয়েছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল ও জিন্না সাহেব, তা নাকি নয়া দিল্লীর কোনও এক সুরক্ষিত স্থানে মাটির গর্তে লুক্কায়িত আছে এবং ৯৯ বছর বাদে অর্থাৎ ২০৪৬ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে তাকে ভূগর্ভ থেকে তুলে সকলের গোচর করা হবে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে মাস ছ'য়েকের মধ্যেই একটি দিন করা হ'ল, যার মধ্যে পাঞ্জাবের হিন্দুদের পূর্ব পাঞ্জাব (যা পাকিস্তানী এলাকায় অবস্থিত) ছেড়ে ভারতে চ'লে আসতে হবে এবং যার পরে আর আসা চলবে না। সকল হিন্দু পাঞ্জাবীই এই ঘোষিত দিনটির মধ্যে তাদের সম্পত্তি বিনিময় বা বিক্রয় করে ভারতে চিরতরে চ'লে এল। কিন্তু কি আশ্চর্য! কেন জানিনা, পূর্ব-পাকিস্তানে অর্থাৎ সাবেক পূর্ব বাঙলায় বসবাসকারী হিন্দুদের সম্বন্ধে এমন কোনও আদেশ জারি করা হল না। যাঁদের খুশী হ'ল, তাঁরা চ'লে এলেন এবং এদের মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছেন নিম্নমধ্যবিত্ত। তাঁদের সাময়িক বাসের জন্যে সরকার কোথাও কোথাও ছাউনির ব্যবস্থা করলেন; কিন্তু দেখা গেল, কিছু কিছু কলকাতার ফুটপাতে আশ্রয় নিয়েছেন।

পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের নিয়ে ভারত সরকার যে-ছিনিমিনি খেলা খেলেছেন, তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। স্বাধীনতালাভের পরে ৩৫ বছর কেটে গেছে, আজও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। মানুষের শুভবুদ্ধি যে কবে জাগ্রত হবে। তা ঈশ্বরই জানেন।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের তাদের সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে আসা বা না-আসা সম্বন্ধে তাদের অভিরুচির ওপরে নির্ভর করার ফলে স্বাধীনতালাভের পরেও অন্তত তিন তিন বার সেখানে বিশেষ বিশেষ জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাধে, যার মধ্যে নোয়াখালির দাঙ্গা বিশেষ-ভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই দাঙ্গাবিধ্বস্ত জায়গাটি পরিদর্শন করতে স্বয়ং গান্ধীজী সেখানে গিয়েছিলেন। এরই কিছু কাল বাদে ১৯৪৮ সালের ৩০এ জানুয়ারী গান্ধীজী বিড়লা হাউসের সংলগ্ন উদ্যানে তাঁর নিত্যকারের প্রার্থনা সভায় নাথুরাম গডসে দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল হা, রাম। তাঁর গাওয়া রামধুন—"জয়, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম" তাঁরই মত অমর হয়ে থাকবে।

যদিও কলকাতায় দাঙ্গা প্রচণ্ডরূপে চলেছিল মাত্র তিন চার দিন, কিন্তু মুসলমানদের অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ হারাবার ভয় বেশ কয়েক মাস ধ'রেই ছিল। সরকার সান্ধ্য আইন জারি করবার ফলে সন্ধ্যার পরে শহরের পথ ঘাট একেবারে ফাঁকা হয়ে যেত। এ অবস্থায় 'অরক্ষণীয়া'র শ্যুটিং ঢিমেতালে চলতে থাকল; কোনও দিন দু'ঘণ্টা, কোনও দিন তিন ঘণ্টা শ্যুটিং হয়ত যথেষ্ট। মোট কথা, সকলকেই সন্ধ্যের আগে বাড়ী পৌঁছুতে হ'ত।

এইভাবে শ্যুটিং চ'লে 'অরক্ষণীয়া'র শ্যুটিং পর্ব শেষ হ'ল, বোধ করি, ১৯৪৭-এর মার্চ মাস নাগাদ। ফলে এ অবস্থায় সচরাচর যা হয়, তাই হ'ল। ছবিটি প্রথম সম্পাদনার পরে দাঁড়াল ২২ রীলে। ইস্ট ইন্ডিয়া স্টুডিওর প্রোজেকসন থিয়েটারে ছবিটি দেখবার পরে মিঃ রায় আমাকে বললেন, "ছবির প্রতিটি দৃশ্য আমার ভালো লেগেছে, কিন্তু প্রথমে কি দেখেছি, তা আমি এখনই ভুলে গেছি। বুঝতেই পারছেন, ছবিটিকে বেশ খানিকটা ছোট করতে হবে।"

সেটা অবশ্য প্রাথমিক সম্পাদনা করবার পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম। তাই সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলুম। দিন দুই ভেবে নিয়ে সম্পাদক সন্তোষ গাঙ্গুলীর সঙ্গে ছবি কাটতে বসলুম। আমার সম্পূর্ণ নির্দেশক্রমে তিনি কাঁচি চালাতে লাগলেন—কোথাও ছবির মাত্র ৮টি ফ্রেম বাদ গেল, কোথাও ১৬টি, আবার কোথাও দেড়ফুট; আবার এমনও হোল, একটি দৃশ্যের তৃতীয় শটের সঙ্গে পরের চার-পাঁচটি দৃশ্যকে বাদ দিয়ে তার-পরের দৃশ্যের দ্বিতীয় শট্‌কে সোজা জুড়ে দেওয়া হ'ল।

সন্তোষ গাঙ্গুলীর চোখ ট্যারা হতে থাকল। তিনি কথাটাকে মিঃ রায়ের কানে তুলে নাকি মন্তব্য করেছিলেন, "পশুপতিবাবু কি যে করছেন, তা বুঝতে পারছি না।" মিঃ রায় শুনে মৃদু হেসে বলেছিলেন, "উনি যা করছেন তা ওঁকে করতে দিন; একটিও কথা কইবেন না, মুখ বুজে ওঁর কথামত কাজ করুন।"

কথাটা মিঃ রায়ই আমাকে জানিয়েছিলেন। ২২ রীলকে কেটে ১৫ রীলে আনলুম; আসলে ছবির দৈর্ঘ্য দাঁড়াল প্রায় ১৪ হাজার ফুট। 'অরক্ষণীয়া' ছবিতে গীতিকার হিসেবে একটি নতুন ছেলেকে সুযোগ দিলুম। আমার শুভানুধ্যায়ী, ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষ ছেলেটি সম্বন্ধে সুপারিশ ক'রে বললেন, ছেলেটির নাম হচ্ছে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ছেলেটিকে সুযোগ দিলে আপনি ঠকবেন না।"

ছেলেটির সাদাসিধে, মুখচোরা ভাব আমার খুব ভালো লাগল। আমি আমার কবিবন্ধু অজয় ভট্টাচার্যের অভাব খুবই অনুভব করছিলুম। একজন গীতিকারের প্রয়োজন আমার ছিলই। গৌরীপ্রসন্ন সেই শূন্যস্থান পূর্ণ

করল এবং 'অরক্ষণীয়া' থেকে শুরু ক'রে 'স্বামী', 'নিষ্কৃতি', 'মামলার ফল' প্রভৃতি কয়েকটি ছবিতেই গান রচনা করল। গৌরীপ্রসন্ন নিজের ক্ষমতা গুণে আজ চলচ্চিত্রজগতে শ্রেষ্ঠ গীতিকারের আসনে অধিষ্ঠিত। আমি তার সাফল্যে নিশ্চয়ই গর্বিত।

'অরক্ষণীয়া' ছবিটির সকল কাজ সমাপ্ত হ'ল; কিন্তু ছবির পরিবেশক সংস্থা, পরেশমল দীপচাঁদ প্রতিষ্ঠিত ডি-লুক্স পিকচার্স ডিষ্ট্রিবিউটার ছবিটির তখনই মুক্তি দিতে পারলেন না; কারণ তাঁদের অধীনস্থ শ্রী, উত্তরা, পূরবী এবং উজ্জ্বলা চিত্রগৃহে তখন চলছিল দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'চন্দ্রশেখর'।

যখন 'অরক্ষণীয়া'র পুনঃসম্পাদনা কাজে আমি ব্যস্ত, সেই সময়ে আমার অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ীতে আসেন সুখেন্দু বসু নামে এক যুবক। আমার সঙ্গে দেখা ক'রে তিনি বলেন, তিনি আমাকে দিয়ে একটি ছবি করতে চান। আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাবেন কে, তখন তিনি তাঁর বাবার নাম করেন। যথাসময়ে শ্রীবসুর পিতৃদেব সত্যপ্রসন্ন বসু আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং লক্ষাবধি অর্থ ব্যয় করতে পারবেন ব'লে আশ্বাস দেন।

আমি প্রথমে শরৎচন্দ্রের 'নববিধান' থেকে ছবি তৈরী করবার অভিপ্রায়ে শরৎচন্দ্রের ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের কাছে যাই বইখানির চিত্রস্বত্ব কেনবার জন্যে। এখানে বলা ভালো যে, আমার অশ্বিনী দত্ত রোডের বাসস্থানের একখানি বাড়ীর পরেই শরৎচন্দ্রের বাড়ী। কিন্তু প্রকাশচন্দ্র এই চিত্রস্বত্ব বিক্রয়ের ব্যাপারে এমন টালাবাহানা করতে লাগলেন যে, আমি বিরক্ত হয়ে আমার বন্ধু মণীন্দ্র-নাথ দত্তের সাহায্যে 'নববিধান' এবং 'অনুরাধা' বই দু'খানির কাহিনীর চতুর সংমিশ্রণে 'প্রিয়তমা' নামে একটি চিত্তগ্রাহী গল্প খাড়া করি এবং এই গল্পের ভিত্তিতে আমার দ্বারা লিখিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবি তৈরী করতে শুরু ক'রে দিই পাহাড়ী সান্যাল ও মলিনা দেবীকে নায়ক-নায়িকারূপে নিয়ে।

শ্রীমতী মলিনা তাঁর গৃহীত ভূমিকাতে একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন একটি দৃশ্যের একেবারে শেষ শটটিতে আমি তাঁকে আবেগের উচ্চ-গ্রামে পৌঁছে দিয়ে শট্ নিয়ে ফ্লোরের বাইরে এসে পরবর্তী গ্রহণযোগ্য দৃশ্যের কথা ভাবছিলুম। কিছু পরে ফ্লোর বয় এসে আমাকে বলে মলিনা দেবী আপনাকে ডাকছেন। তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করতে সে জানাল, তিনি এখনও ফ্লোরেই আছেন।

ফ্লোরে ঢুকে দেখি, যে-কুলুঙ্গির ধারে দাঁড় করিয়ে তাঁর শট্‌টি নিয়েছিলুম, সেই কুলুঙ্গিটি ধরেই তিনি তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। ক্ষিপ্রপদে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি, তিনি থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছেন এবং চোখের জলে ভেসে যাচ্ছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর পিঠে হাত দিয়ে 'একি! কি ব্যাপার!' বলতেই তিনি

ঘুরে আমার ওপর আছড়ে পড়লেন ; তাঁর কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল। অনেক কষ্টে, অনেকক্ষণ ধ'রে সান্ত্বনা দেবার পরে তিনি কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রথম যে-কথা বললেন, সেটি হচ্ছে—মানুষকে এমন ক'রে কাঁদায় ? এটি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ৭নং ফ্লোরের ঘটনা।

আর একটি ঘটনা ঘটেছিল ইন্দ্রলোক (পূর্ববর্তী ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া) স্টুডিওতে এই ছবিরই শ্যুটিং করতে করতে। শট্‌টিতে দু'জন শিল্পী—এক, মলিনা এবং দুই, বালক শিল্পী, নবাগত দিলীপ সমাদ্দার ; ছেলেটি আমাদেরই পাড়ার বাসিন্দা এবং সেন্ট লরেন্স স্কুলের ছাত্র।

মলিনা হচ্ছেন পাহাড়ী সান্যালের পরিত্যক্তা প্রথমা স্ত্রী এবং ছেলেটি হচ্ছে ওঁর দ্বিতীয়া মৃতা স্ত্রীর সন্তান। যথারীতি বরপণ দিতে না পারায় প্রথমা স্ত্রী যখন স্বামীঘর করতে বঞ্চিতা হয়, তখন স্বামী স্ত্রী দু'জনেই ছিল নিতান্ত বালক ও বালিকা। বহু বৎসর পরে নিতান্ত আচম্বিতে এবং নিজের অজ্ঞাতসারেই স্বামী প্রথমা স্ত্রীর বর্তমান আশ্রয়স্থলে উপস্থিত, সঙ্গে একটি বালক। কথায় কথায় ঐ বালকের কাছ থেকেই মহিলাটি জানতে পারেন, ছেলেটি তাঁরই স্বামীর মৃতা দ্বিতীয়া স্ত্রীর একমাত্র সন্তান।

মাতৃহৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ছেলেটিকে সে বারংবার অনুরোধ করছে, তাকে একবার মা ব'লে ডাকতে। শেষ পর্যন্ত নারীর আকুল আহ্বানে স্থির থাকতে না পেরে ছেলেটি ঝাঁপিয়ে পড়ে নারীর কোলে এবং দু'বাহু দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলতে থাকে—মা, মা, মা।

দু'জনেরই সংলাপকে রীতিমত আয়ত্ত করিয়ে নিয়ে যখন চূড়ান্ত বার মহলা দিই, তখনই দু'জনের চোখ দিয়ে ধারা বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। মহলা শেষে মিঃ পি. এন. রায় দ্রুতপদে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "শট্‌টি নিয়ে নিলেন তো ?" আমি যখন বললুম, "না, এ তো ফাইন্যাল রিহার্সাল হ'ল, এইবারে টেক।" তখন তিনি বললেন, "এ কি আর পাবেন ?" আমি হেসে বললুম, "দাঁড়িয়ে দেখুনই না।"

তারপরে দুই শিল্পীকে শেষ বারের মত সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়ে কাল-বিলম্ব না করে যখন সত্যিই টেক্ করলুম, তখন দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদেই চলেছে, আর ছেলেটি মলিনার কোলে মুখ গুঁজড়ে বলেই চলেছে—মা, মা, মা ! মিঃ রায় আবার আমার কাছে এলেন এবং অশ্রুসজল চোখে প্রসন্ন হাসি হাসলেন, মুখ দিয়ে কোনও কথা ফুটল না।

'প্রিয়তমা'র সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। এই হেমন্তকুমারকে আমিই প্রথম সঙ্গীত-পরিচালনার কাজে ব্রতী করি এই সময় (১৯৪৭) থেকে বছর দুয়েক আগে। তখন সবে লাহোর থেকে ফিরেছি। হঠাৎ হাওড়ার একটি সিনেমা হাউসের অধিকারী এবং চিত্রপরিবেশক লাহোরী-রাম পরাশরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। তিনি তাঁর হাওড়ার হাউসে একখানি হিন্দী ছবি আমাকে দেখিয়ে তারই কাহিনী অবলম্বনে 'সুখদুঃখ'

নামে একটি ছবি তৈরী করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাঁর সঙ্গে কথামত চিত্রনাট্য তৈরী করেছি, এই সময়ে তিনি ছবিতে প্রধান চরিত্র মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে সুনন্দা দেবীকে ২,০০০ টাকা অগ্রিম দিয়ে চুক্তিবদ্ধ করেন এবং ছবির একটি বেশ্যাবাড়ীর দৃশ্যের দু'খানি গান রেকর্ডিং করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এই সময়ে একদিন শ্রী সিনেমায় সারা রাত্রি ধরে মিউজিক কনফারেন্স-এ বড়ে গোলাম আলি, হীরাবাঈ বরোদকার ও কাশীর সিদ্ধেশ্বরী বাঈয়ের গান শোনবার পরে ট্রামে ক'রে বাড়ী ফিরছি এবং মনে মনে শেষোক্ত জনের মুখ থেকে শোনা 'অবহু তো গৈলা আ মেরী রাজা" লাইনটিকে বারংবার আওড়াতে আওড়াতে এসপ্ল্যানেডে এসে বালিগঞ্জের ট্রামে চেপেই দেখি: হেমন্ত একটি বেঞ্চের ধার ঘেঁষে ব'সে আছে। প্রথম সম্ভাষণের পরে জানলুম, ও ব্রডকাস্টিং সেণ্টার থেকে গান গেয়ে ফিরছে। আমি কোথা থেকে আসছি, তা ও জানবার পরে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, ও মিউজিক ডাইরেক্টার হতে চায় কিনা। ও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "পশুপতিদা, আর দুঃখু দেবেন না।" কারণ জিজ্ঞাসা করতে বলল, "একজন ছ'মাস ধরে হাঁটিয়েছেন, জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে গিয়েছে। আবার ?"

আমি জবাবে বললুম, "এবার একবারই হাঁটবে। কাল সকাল ৯টায় লাইট হাউসের একেবারে উপরতলায় চ'লে এস, কালই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবে।" কথামতই কাজ হ'ল। লাহোরিরাম পরাশরের সঙ্গে চুক্তিপত্রে সই করে একখানি ৫০০ টাকার চেক নিয়ে হেমন্তকুমার যখন বেরিয়ে গেলেন, তখন বেলা ১১টা। তাকে বললুম। "কাল সকালেই আমার বাড়ীতে এস, দু'খানা গান তৈরী করতে হবে।"

যথাসময়ে হেমন্ত আমার বাড়ীতে যেতে তার হাতে গান দুটি তুলে দিলুম—বললুম, খুব হৈ-হুল্লোড়ের গান হবে। গানের সুর তৈরী হ'ল এবং তা আমার ও লাহোরিরামের পছন্দ হ'ল। ইন্দ্রপুরীতে একটি দিন নিয়ে বাঁশরী লাহিড়ীকে দিয়ে গাইয়ে গান দু'খানি রেকর্ডিং করা হ'ল চারিদিকে বাহবা ধ্বনির মধ্যে। কিন্তু তারপরেই সব ভেস্তে গেল, ছবি আর তৈরী হ'ল না।

এর দু'বছর পরে হেমন্তকে নিয়োগ করলুম 'প্রিয়তমা' ছবিতে। 'প্রিয়-তমা'র একখানি গান অমর হয়ে আছেঃ "স্মরণের এই বালুকাবেলায় চরণ-চিহ্ন আঁকি, তুমি চ'লে গেছ দূরে। বহু দূরে শুধু পরিচয়টুকু রাখি।" হাস্য-রসিক অজিত চট্টোপাধ্যায়ের মুখের "Good evening !" ইংরেজী গানটিও কম জনপ্রিয় হয়নি।

এই ছবিরই নায়কের অতি-আধুনিকা, উগ্রস্বভাবা তৃতীয়া স্ত্রীর ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেন যশস্বী সুশীল মজুমদারের স্ত্রী আরতি মজুমদার। বলতে পারি, তিনি চরিত্রটিকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালের ২১এ মে তারিখে 'প্রিয়তমা' মুক্তি পায় বসুশ্রী ও বীণা চিত্রগৃহে। নতুন বসুশ্রী চিত্রগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত এটিই প্রথম বাঙলা ছবি এবং হিন্দী বাঙলা মিলিয়ে দ্বিতীয় ছবি। চিত্রগৃহটির দ্বারোদ্ঘাটন হয় শুভলক্ষ্মী অভিনীত "রাজরানী মীরা' ছবি দিয়ে।

জনসাধারণ লুফে নেয় 'প্রিয়তমা'কে। ছবিটি এমনই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, বসুশ্রীর কর্তৃপক্ষ ছবির প্রযোজককে প্রস্তাব দেন যে, তাঁদের যদি ছবির চল্‌তি দু'টি প্রিণ্ট বিক্রি করা হয়, তাহলে তাঁরা ১ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। এর পরে তাঁরা যতদিন খুশী ছবিটিকে চালাবেন। কিন্তু সুখেন্দু বসু ও তাঁর পিতা সত্যপ্রসন্ন বসু এঁদের এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। জানি না, ওঁরা বসুশ্রী ও বীণাতে ছবিটি চালিয়ে শেষ পর্যন্ত কত টাকা পেয়েছিলেন, তবে আমার আজও মনে হয়, ওঁরা বসুশ্রীর বসুদের প্রস্তাবে রাজী হলে ভালো করতেন।

'প্রিয়তমা'র স্মরণীয় গান "স্মরণের এই বালুকাবেলা" সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র, দেশপ্রেমিক জননেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় আশুতোষ কলেজের একতলার বিরাট হলঘরটিতে। এই শ্রাদ্ধবাসরে সারা দিন ধ'রে বারংবার ক'রে বাজানো হয়—"স্মরণের এই বালুকাবেলায় চরণচিহ্ন আঁকি" গানখানি। লাউডস্পীকার মারফত প্রচারিত এই গানখানি বহু পথচারী দাঁড়িয়ে নিমগ্নচিত্তে শুনেছিলেন এ-সংবাদও আমি পেয়েছিলুম।

'প্রিয়তমা'র জনপ্রিয়তায় যখন অপরাপর চিত্রগৃহের মালিকেরা রীতিমত বিচলিত, সেই সময়ে একদিন পথে আমার সঙ্গে দীপচাঁদ কাঙ্কারিয়ার দেখা হয়ে যায়। কথায় কথায় তিনিও বললেন, "তোমার ছবি যে রকম চলছে, তাতে কোন্ ছবি যে রিলিজ করব, তা বুঝতেই পারছি না।" তিনি উত্তরা, উজ্জ্বলা ও পূরবীর কথা বলছিলেন।

আমি হাসতে হাসতে তাঁকে বললুম, "যে ছবি পারেন, রিলিজ করুন, কিন্তু দোহাই, আমার 'অরক্ষণীয়া' যেন রিলিজ করবেন না। তাহলে আমারই বিরুদ্ধে আমার লড়াই শুরু হয়ে যাবে।" ও মা, যা বারণ করলুম, ভদ্রলোক তাই-ই করলেন। 'প্রিয়তমা' তখন সবে পাঁচ হপ্তা চলেছে, তিনি দুম্ করে ২৫এ জুন থেকে শ্রী, পূরবী এবং উজ্জ্বলায় মুক্তি দিলেন 'অরক্ষণীয়া' ছবির। দেখতে দেখতে দর্শক দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। বলব, প্রচুর ক্ষতি হ'ল 'প্রিয়তমা' চবির অর্থাগমের দিক দিয়ে।

'অরক্ষণীয়া'র জনপ্রিয়তাও কম হল না। ঠিক মেপে বলতে পারব না দুটি ছবির মধ্যে কার জনপ্রিয়তা বেশী। জ্ঞানদার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর মত সুন্দরী যে বেমানান, ছবি দেখতে বসে দর্শকরা এ-কথা বিলকুল ভুলে গেল। তারা জ্ঞানদার লাঞ্ছনায় দুর্দশায় কেঁদে আকুল। পরিস্থিতি রচনা, সংলাপ এবং অভিনয় এমনই মায়াজাল বিস্তার করেছিল তাদের স্পর্শ-

কাতর মনে।

'অরক্ষণীয়া'র জনপ্রিয়তা সম্পর্কে একটি ঘটনা আজও আমার স্মৃতির পটে জ্বলজ্বল করছে। শ্রী সিনেমায় তখন সবে 'অরক্ষণীয়া' মুক্তিলাভ করেছে। ঐ হাউসে টিকিটঘরের ভীড় নিয়ন্ত্রণ করত 'পাগলা' ব'লে এক বলিষ্ঠ যুবক। তার ভালো এবং আসল নামটি আমি বলতে পারব না ; সকলেই তাকে 'পাগলা' ব'লে জানত।

আমাদের চলচ্চিত্র-জগতের কলাকুশলী ও কর্মীদের নিয়ে তখন 'সিনে-টেক্‌নিশিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল' নামে প্রতিষ্ঠানটির একটি সাধারণ সভা ডাকা হয় এক রবিবারে শ্রীর পাশের উত্তরা সিনেমাগৃহে। সভাগৃহে চলচ্চিত্রকর্মীদের বেশ ভীড়। হঠাৎ দেখি, সেই 'পাগলা' কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার ওপর চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল, "এ-ই যে, পেয়েছি ; আসুন, আসুন, সিট থেকে উঠে আসুন।"

কেন, কি বৃত্তান্ত বুঝতে না বুঝতে সে আমাকে হিড়হিড় ক'রে সিট থেকে টেনে তুলে পাশের করিডোরে নিয়ে গেল এবং 'আরে, আরে কর কি ?' গোছের ওজর আপত্তিতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সোজা আমাকে তার কাঁধে তুলে নিলে। তখন 'আপনি' 'আজ্ঞে' প্রভৃতি ভদ্রতার খোলস তার ভিতর থেকে ঝ'রে পড়ে গেছে ; সে বলতে শুরু করেছে—"আরে তুমি হচ্ছ 'অরক্ষণীয়া' ছবির ডিরেক্টার, তোমাকে কাঁধে কি, মাথায় ক'রে রাখব। তুই কি ছবিই করেছিস মাইরি!" মুখে এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সে সারা হল প্রায় চষে বেড়াতে লাগল।

আমার সহকর্মী বন্ধুরা হাততালি দিয়ে উঠল। আর আমি লজ্জায় ম'রে যেতে লাগলুম। উচ্ছ্বাস কমলে সে আমাকে তার কাঁধ থেকে নামিয়ে একেবারে মোড়ম্বা ক'রে জড়িয়ে ধ'রে আমার দু'গালে খেল চুমু এবং বলল, "বাবা, কাল থেকে আমি এঁচে রেখে দিয়েছি ; এ মিটিংয়ে তুমি আসবেই আসবে ; দেখা পাওয়া মাত্র আমি আমার মনের সাধ মিটিয়ে নেব।" পাগলা আজ কোথায়, তা জানি না ; কিন্তু তাকে ভুলতে পারা আমার পক্ষে কি সম্ভব ?

এরই কয়েকদিন বাদে সুনন্দা (সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ; আসল নাম ইলা) আমার কাছে এসে বলল, সে 'স্বামী' ছবিটি করতে চায় এবং আমাকে অনুরোধ করল, তাকে ওর চিত্রস্বত্ব কিনিয়ে দিতে। আমি প্রকাশ চাটুজ্জ্যের কাছে গিয়ে তদ্বির করতে তিনি বললেন, "দাঁড়াও, দু'এক দিন ভেবে দেখি।" এবং দু' একদিন পরে যেতে বললেন, "আমি তোমাকে চিত্রস্বত্বটি দিতে পারি, যদি তুমি নিজে ছবিখানি প্রোডিউস (প্রযোজনা) কর।" "এত টাকা আমার কোথায় ?" "টাকা যোগাড় কর" বললেন প্রকাশদা।

মহা মুস্কিলে পড়লুম। সুনন্দাকে গিয়ে বললুম, "দেখ, এ অবস্থায় নামে আমি প্রযোজক হই, আসলে তুমিই সব।" কিন্তু সুনন্দা আমার প্রস্তাবে রাজী হ'ল না। তখন যা থাকে কুল কপালে ব'লে সেজে গেলুম

প্রোডিউসার (প্রযোজক) এবং 'স্বামী'র চিত্রস্বত্ব কিনে ফেললুম। ছবির ডিস্ট্রিবিউটার (পরিবেশক) হিসেবে খাড়া হ'ল নবগঠিত নারায়ণ পিকচার্স। ইতিমধ্যে ভুবনমোহন লাহিড়ী মারা যাওয়ায় দুর্গাদাস বসু মল্লিক তাঁর কোয়ালিটি ফিল্মস্ তুলে দিয়ে ঐখানে নিয়ে এলেন নারায়ণ পিকচার্সকে কোয়ালিটি ফিল্মসের যাবতীয় সম্পত্তি তার হাতে তুলে দিয়ে।

সত্যনারায়ণ খাঁর ছিল স্ট্র্যান্ড রোডে সরষে তেলের কল এবং মসলার বিরাট আড়ত। তাঁরই সহকর্মী প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁকে চিত্র-পরিবেশকের ব্যবসায়ে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম দেন নারায়ণ পিকচার্স। নারায়ণ-বাবু (সত্যনারায়ণবাবু ডাকনাম) লেখাপড়া কিছু কম জানলেও ছিলেন অত্যন্ত সুচতুর এবং তার ওপরে প্রকৃত সজ্জন।

আমার 'স্বামী' ছবি নিয়েই তাঁদের চিত্র-পরিবেশনার পথে যাত্রা শুরু। এর পরে আমার 'নিষ্কৃতি' ও 'ষোড়শী'র পরিবেশনা ভার এঁরাই গ্রহণ করেন। এবং 'মামলার ফল' ছবিটি এঁরা প্রযোজনা ও পরিবেশনা করেন। স্বামী ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করেন পাহাড়ী সান্যাল ও সুমিত্রা দেবী। এই ছবিতে দু'জনেরই অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। বাস্তব সেট-সেটিং এবং চিত্রশিল্পী দেওজীভাইয়ের অসামান্য ফোটোগ্রাফী ছবিটিকে প্রকৃত সৌন্দর্যময় ক'রে তুলেছিল।

আমার নিজের মতে আমার তৈরী এগারোখানি চলচ্চিত্রের মধ্যে এই 'স্বামী' ছবিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিধি বাম কিংবা বলব মিনার, বিজলী, ছবি-ঘরের মালিক হরিপ্রিয় পাল আমার সঙ্গে বৈরিতা করলেন। ১৯৪৯ সালের ২৫এ সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ ক'র মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে পাঁচ হপ্তা ধ'রে প্রতিটি প্রদর্শনী পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছবিটিকে জোর করে তুলে দিলেন, তাঁর পূর্বচুক্তি বজায় রেখে 'আশাবরী' নামে একখানি ছবিকে মুক্তি দেবার অভিপ্রায়ে। যখন তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আমার প্রতি তাঁর এই অবিচারের কথা বললুম, তিনি দিব্যি হাসতে হাসতে বললেন, "হ্যাঁ, স্বীকার করছি অবিচার হয়েছে, কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমি আপনার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হাজার দুই টাকা দিয়ে দিচ্ছি।"

"মাত্র হাজার দুই?" এই কথা বলতে তিনি বললেন, "তাহ'লে এক কাজ করুন। আপনি আমার নামে নালিশ করুন। আদালত যে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করবে, তাই দিয়ে দেব।" আমি ঘেন্নায় তাঁর কাছ থেকে চলে এলুম। অবশ্য নারায়ণ পিকচার্স এ-ব্যাপারে ইনজাংশন দাবি করতে স্থির করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, বোধকরি ঐ হরিপ্রিয় পালের সঙ্গে কোনও রকম সমঝোতায় আসায় তাঁরা আদালতে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হলেন না। আমাকে এসে বললেন, আমরা ওঁদের হাতে; নালিস মোকদ্দমায় হিতে বিপরীত হবে।

শেয়ানে শেয়ানে নাক শোঁকাশুঁকি হয়ে গেল। মাঝখান থেকে গরীব

আমি মারা গেলুম। কোথায় আমার অংশে বেকসুর আসত ৭০।৮০ হাজার টাকা, তার জায়গায় কুল্যে পেলুম হাজার আষ্টেক টাকা, যে-টাকাটা বইটির চিত্রস্বত্ব কিনতে আমি খরচ করেছিলুম। ভেবেছিলুম, স্বামী ছবি থেকে যে টাকা পাব, তার সাহায্যে আমি পর পর ছবি ক'রে যাব আমার নিজের প্রতিষ্ঠান কলালক্ষ্মী চিত্রমন্দিরের পতাকাতলে। কিন্তু সে আশায় পড়ল ছাই।

'স্বামী' ছবি মুক্তিলাভ করবার কয়েকদিন বাদে একরাত্রে খেতে বসেছি, এমন সময়ে বাড়ীর সামনে একটি জীপ গাড়ী থামবার আওয়াজ পেলুম এবং পরক্ষণেই কলিং বেল। চাকর দেখে এসে বললে, একজন মোটাপানা ভদ্দরলোক আপনাকে ডাকছেন, নাম বললেন না। আমি খাওয়া শেষ ক'রে গিয়ে দেখি, জীপে রয়েছেন রাম চৌধুরী, কলকাতা পুলিশের ইনস্পেক্টার কিংবা হয়ত তখন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার।

রামবাবুর নাটকের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি এবং তখন তিনি দক্ষিণ কলকাতায়, কালীঘাট ও হাজরা রোডের মাঝামাঝি জায়গায়, অনেকটা বসুশ্রী সিনেমার পিছন দিকে কালিকা থিয়েটার চালাচ্ছেন। আমাকে দেখেই বললেন, "আমার সঙ্গে একটু আসবার সময় হবে ?" "কতক্ষণ আটকে রাখবেন ? এখন রাত দশটা বেজেছে।" বললুম আমি। "বেশী নয়; ঘণ্টাখানেক", তাঁর উত্তর।

"আসছি", ব'লে ওপর থেকে জামাকাপড় প'রে নেমে এসে ওঁর জীপে উঠলুম। মাঝে আর কোনো কথাবার্তা হ'ল না; একেবারে কালিকা থিয়েটারের সামনে গিয়ে হাজির হলুম। শ্রীচৌধুরীকে অনুসরণ ক'রে দ্বিতলে তাঁর ঘরে গিয়ে বসলুম, একটি ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দু'পাশে রাখা সামনাসামনি দুই চেয়ারে। নজরে পড়ল, টেবিলের ওপর কাঁচের তলায় রাখা রয়েছে কালীঘাটের মা-কালীর একটি বড় সাইজের ছবি।

রাম চৌধুরী মশাই কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, "ক'দিন ধ'রে মা ক্রমাগত স্বপ্নে বলছেন, গদাধর চাটুজ্জের ছবি পশুপতি চাটুজ্জে ছাড়া আর কে করবে ? পশুপতি চাটুজ্জে ছাড়া আর কে করবে ?" বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ ভারাক্রান্ত হয়ে এল, চোখ থেকে জল পড়তে শুরু করল। হঠাৎ তিনি তাঁর বলিষ্ঠ দুটি হাত দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা আমার হাত দুখানিকে চেপে ধরলেন ঐ মা-কালীর ছবির ওপরে এবং মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "বলুন, বলুন আপনি করবেন, বলুন।"

সবলে চেপে-ধরা হাতকে ছাড়াবার চেষ্টা করা বৃথা। মুখে বললুম, "দয়া ক'রে হাতটা ছেড়ে দিন।" "আগে দিব্যি গেলে বলুন, করবেন।" "আমি দিব্যি গালি না", আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে শ্রীচৌধুরী আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, "বেশ কথা।" তারপরে তিনি তাঁর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ার থেকে বার করলেন চুক্তিপত্র—টাইপ-করা এগ্রিমেণ্ট। সেটা আমাকে দিলেন পড়তে। তারই ওপর চোখ বুলিয়ে দেখছি,

হঠাৎ দেখি, আবার বোধ হয় ঐ ড্রয়ার থেকেই, কিংবা তাঁর কোটের পকেট থেকে তিনি বার করলেন একটি রিভলভার এবং সেটিকে টেবিলের ওপর রাখলেন।

আমি বললুম, "এগ্রিমেণ্টে আর সব কিছুই লেখা আছে, শুধু টাকার অঙ্কটা নেই।" "বেশ লিখে দিচ্ছি", ব'লেই আমার হাত থেকে সেই টাইপ-করা এগ্রিমেণ্ট ফর্মটি নিয়ে তিনি তাতে টাকার অঙ্ক লিখলেন, ৬,০০০ টাকা। আমি বললুম, "এটা কি একটা টাকা?" "ওর বেশী দেবার ক্ষমতা নেই, ওতেই ক'রে দিতে হবে।" ব'লে রিভলভারটিকে একবার ছুঁলেন। আমি বললুম, "ওটাকে চোখের সামনে থেকে সরান।" "আগে সই করুন।" "যদি না করি?"

"পশুপতিবাবু, মা আমাকে উপরোউপরি তিন রাত্রি ধ'রে স্বপ্ন দিয়ে বলেছেন, গদাধর চাটুজ্জোর জীবনী পশুপতি চাটুজ্জ্যেকে দিয়ে করা। আমি মায়ের আদেশ যদি পালন করতে না পারি, তাহলে আগে আপনি মারা যাবেন, তারপরে আমি মরব", ব'লে তিনি রিভলভারটি খুলে দেখালেন, তাতে দুটি টোটা ভরা রয়েছে। আমি তবু বললুম, "ভয় দেখাচ্ছেন?"

মার কাছে কথার খেলাপ করতে পারব না; পশুপতিবাবু আমাকে দয়া করুন। আপনার ভালো হবে।" দিলুম সই ক'রে।

শ্রীচৌধুরী উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং পরে একটি ৫০০ টাকার চেক দিলেন। "এখন আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন। কাল সকালে আমার বাড়ীতে আসুন। কাজের কথা হবে", আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে শ্রীচৌধুরী তৎক্ষণাৎ তাঁর জীপে ক'রে আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করলেন।

পরদিন সকালে যখন রাম চৌধুরী মশাই আমার বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন জলুদা—কবি ও গায়ক লালচাঁদ বড়ালের মধ্যমপুত্র বিষণচাঁদ বড়াল। জলুদা নিউ থিয়েটার্সের প্রোডাকসান ডিপার্টমেণ্টের অন্যতম স্তম্ভ। তাঁরই সামনে আমি শ্রীচৌধুরীকে বললুম, "দেখুন, যাঁর জীবনী নিয়ে ছবি, তিনি যা-তা লোক নন; এত বড় সাধক, এমন ঈশ্বরজানিত লোক সচরাচর জন্মগ্রহণ করেন না। এঁর জীবনী হবে 'লাইট অব এশিয়া' অর্থাৎ বুদ্ধের জীবনীর সমতুল্য। কাজেই এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। আমি এই খান কুড়ি বইয়ের একটি ফর্দ দিচ্ছি। এই বইগুলি আমাকে কিনে দিতে হবে। আমি বইগুলি পড়ব; প'ড়ে তার থেকে পরমহংসদেবের জীবনীর কোন্ কোন্ বিশেষ অংশ নিয়ে ছবি করব, তাই ঠিক করব। মাথার মধ্যে যতক্ষণ না তাঁর একটি পরিপূর্ণ চিত্র ফুটে উঠছে, ততক্ষণ আমায় ভাবতে দিতে হবে।"

শ্রীবড়াল আমার কথার সমর্থন করলেন এবং রামবাবুকে বইগুলি কিনে দিতে বললেন। শ্রীচৌধুরী অত্যন্ত তৎপর ব্যক্তি। সেই রাত্রেই আমার দেওয়া তালিকা অনুযায়ী কুড়িখানি বই—শ্রীম লিখিত কথামৃত, স্বামী সারদা-

নন্দ লিখিত রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় বই এসে হাজির। আমি খুবই হৃষ্টচিত্তে শ্রীম-লিখিত কথামৃত আগে পড়তে শুরু করলুম।

পরদিন সকাল সাড়ে ছটাতেই রাম চৌধুরী মশাই এসে হাজির এবং তাঁর প্রথম প্রশ্ন, "বইগুলো পড়লেন?" আমি তো অবাক! ভদ্রলোক বলেন কি? কাল রাত্রি নটা নাগাদ কুড়ি খানি বই আমার হাতে দিয়ে গিয়ে মাত্র ন' ঘণ্টা বাদে এসে বলছেন—'বইগুলি পড়া হ'ল?' আমি হেসে বললুম, "আমি নিজে যদি পরমহংসদেব হতুম, তাহ'লে হয়তো এ-জিনিস সম্ভব হ'ত; শুনেছি, বইয়ের মলাট হাত দিয়ে ছুঁলেই তাঁর পড়া হয়ে যেত! কিন্তু আমি সামান্য মানুষ। আমার বইগুলি পড়তে অন্তত পক্ষে দু'মাস সময় লাগবে।"

"ওরে বাবা, আমি যে আজ থেকে তিন মাসের মধ্যে ছবিখানাকে শেষ করব ব'লে ভাবছি।" উত্তরে আমি বললুম, "আমি গোড়াতেই বলেছি, আমাকে দিয়ে যদি পরমহংসদেবের জীবনীচিত্র চান, তাহ'লে অমন তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। তবে কথা দিতে পারি, যে-ছবি করব, তাতে আপনি খুশী হবেন।" শুনে চৌধুরী মশাই তখনকার মত নিবৃত্ত হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু ব্যস্তবাগীশ মানুষ।

আবার দিন পাঁচেক বাদে দেখা দিলেন। এবং এর মধ্যে আমি গুটি তিনচার দৃশ্য লিখে ফেলেছি শুনে আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠলেন। উনি ঐ সামান্য লেখাটুকু সঙ্গে নিয়ে আমাকে তাঁর জীপ গাড়ীতে উঠতে বললেন। কিন্তু না, এবারে আর কালিকা থিয়েটারে নয়। জীপ গিয়ে পেঁছুল লোয়ার সার্কুলার রোডে (সম্প্রতি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে) অবস্থিত পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে। তারই দোতলার একখানি ঘরে গিয়ে আমরা বসলুম। একটু বাদেই শ্রীচৌধুরীর আদেশ মত আমার লেখা পড়তে শুরু করলুম।

প্রথমটা গদাধরের জন্মবৃত্তান্ত—সেই ঢেঁকিশালের ব্যাপার। পরে তোতাপুরীর সঙ্গে পরমহংস দেবের মিলন। এই দৃশ্যটিকে শ্রীচৌধুরীর অনুরোধে অন্তত চারবার পড়তে হ'ল। দেখলুম, শ্রীচৌধুরীর চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু ঝরে পড়ছে। যাই হোক, যখন পড়া শেষ হ'ল এবং শ্রীচৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে বললুম "আর কিছু লেখা হয় নি" তখন তিনি চা ইত্যাদি খাবার ব্যবস্থা করলেন। এর পরে যখন বললুম, "চলুন, এবার যাওরা যাক।" তখন তিনি একগাল হেসে বললেন, "না, পশুপতিবাবু, আর যাওয়া হবে না। আপনাকে এখানেই থাকতে হবে এবং এখানেই থেকে আপনার লেখা শেষ করতে হবে। একটা চিঠি লিখে বইগুলি আনিয়ে নিন।"

আমি তো অবাক; লোকটা বলে কি? বললুম, "দেখুন রামবাবু ঘোড়ার লাগাম ধ'রে টেনে, এমন কি দরকার হ'লে তাকে চাবুক মেরে জলের ধারে নিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু জল খাওয়ানো যায় না, যতক্ষণ না সে নিজে খেতে ইচ্ছে করে।"

রামবাবু কিছুটা ভাবলেন এবং পরে গম্ভীরভাবে বললেন, "তারা!

তারা ! সকলই তোমার ইচ্ছা। বেশ, চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি। তবে বিশেষ অনুরোধ, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব করবেন।"

"দেখুন, চিত্রনাট্যটি তৈরী করতে কতখানি সময় লাগবে, তা মা-কালীই জানেন। তবে চিত্রনাট্য তৈরী হয়ে গেলে ঠিক তিন মাসের মধ্যে ছবি শেষ। আর চিত্রনাট্য তৈরী করতে দেরী হ'লে আপনার তো একটা পয়সাও বেশী খরচ হচ্ছে না ; উল্টে আমারই লোকসান।" এর পর আর কোনও কথা না কয়ে রামবাবু আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিলেন।

এর পরে যে ঘটনা ঘটল, তার কোনও রকম সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। সব কখানি বই না প'ড়ে মাত্র বিশেষ প্রয়োজনীয় খান দশেক বই পড়বার পরে মাথার মধ্যে পরমহংসের জীবনীর একটি ছক খাড়া করে যে-দিন আমি তা চিত্রনাট্যের আকারে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করলুম, মাত্র কয়েক লাইন অগ্রসর হবার পরে মাথার পিছনের অংশে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। এমন যন্ত্রণা যে, লেখা ছেড়ে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলুম। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবার পরে যন্ত্রণা একটু কমতে আবার যেই লিখতে যাচ্ছি, অমনই আবার যন্ত্রণা চেপে এল। এবং এই ব্যাপার চলল দিনের পর দিন। কাগজের সঙ্গে কলম ছোঁয়াতে পারছি না।

এই অবস্থা অন্তত সাতদিন ধরে চলবার পরে আমি বাধ্য হয়ে জলুদাকে টেলিফোন ক'রে একবার আসতে বললুম। এবং তিনি এলে তাঁকে এই অদ্ভুত পরিস্থিতির কথা জানিয়ে বললুম, "দেখুন, আমার মনে হচ্ছে, যে-কোনও কারণেই হোক, মা চান না, আমি এই ছবিটা করি। অথচ আমার ভীষণ ইচ্ছা ছিল ছবিটি করবার।" এই ব'লে আমি তাঁরই হাতে রামবাবু প্রদত্ত সমস্ত বই ফেরত দিয়ে বললুম, "রামবাবু যেন আমাকে ক্ষমা করেন।"

'প্রিয়তমা', 'অরক্ষণীয়া' ও 'স্বামী'র মত অতি জনপ্রিয়—যাকে বলে সুপারহিট ছবি করবার পরে যে-কোনও পরিচালকই আশা করবেন, তাঁর কাছে প্রযোজকেরা এসে ভীড় জমাবেন। কিন্তু অদৃষ্ট কেন বাধ্যতে। আমার অদৃষ্টে তেমন কিছুই হ'ল না। না, একটিও হবু-প্রয়োজক বা চলতি-প্রযোজক আমার ছায়াটুকুও মাড়ালেন না। কাজেই নিজেই বেরুলুম প্রযোজকের ধান্ধায়।

প্রথমেই গেলুম এম. পি. প্রোডাকসন্সের কর্ণধার মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও ভালো বই আছে ? থাকে তো দিয়ে যেও ; প'ড়ে দেখব। তারপরে কথা হবে।" নাচতে নাচতে বাড়ী চলে এলুম। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' বইখানি আমার ভালো লেগেছিল। বইখানি কিনে আর একবার পড়লুম এবং তার সফল চিত্ররূপ সম্বন্ধে একেবারে কৃতনিশ্চয় হয়ে বইখানি মুরলীবাবুকে পড়তে দিয়ে ব'লে এলুম, "সাতদিন পরে আসছি।"

যথাদিনে, যথাসময়ে তাঁর ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই যে অভ্যর্থনা পেলুম,

তা ভোলবার নয়। তিনি আমাকে দেখেই ব'লে উঠলেন, "এই যে, এসেছ!" বলার পরেই বইখানি আমার সামনে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেশ খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ব'লে উঠলেন, "আর বই খুঁজে পেলে না? কচু শাক, ঘেঁটু ফুল, জলচিংড়ি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তোমার কি পছন্দ!—যাঃও, নিয়ে যাও।"

আমি বিস্ময়ে হতবাক, একটা কথাও বলতে পারলুম না। বইখানি মাথা হেঁট করে তুলে নিয়ে বললুম, "আচ্ছা, তাহলে যদি 'নীলদর্পণ' করা যায়?" "নীলদর্পণ!" তিনি একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "গুড আইডিয়া! তুমি ওর সিনারিও লেখ। আজকাল তো প্রি-সেন্সারিং আছে। তোমার সিনারিও আমার পছন্দ হলে সেন্সার অফিসার মিঃ রে'কে (নাম হচ্ছে রামমোহন রায়; কিন্তু ইংরেজীতে বলতেন, আর. এম. রে) পড়তে দেব। তিনি 'হ্যাঁ' বললে কাজ আরম্ভ হবে।" তবু ভালো, আমি কিছুটা সহর্ষ চিত্তে বাড়ী ফিরলুম এবং তার পরদিন থেকেই 'নীলদর্পণে'র চিত্রনাট্য লেখা শুরু ক'রে দিলুম।

এখানে বলা দরকার, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পরে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ফিল্ম সেন্সার বোর্ড গঠন করেন সাধারণ্যে দেখাবার জন্যে ছবিগুলিকে অনুমোদন করার ব্যাপারে। বোম্বাই শহরে এর প্রধান আপিস হয় এবং তিনটি আঞ্চলিক আপিস হয় বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায়। সেন্সার-কর্তা হন সার ক্লিফোর্ড আগারওয়ালা। প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্রেই কয়েকজন অভিজ্ঞ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি করে আঞ্চলিক উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে। আঞ্চলিক সেন্সার অফিসার এবং উপদেষ্টা পরিষদের সভ্যরা প্রতিটি ছবি দেখে সেটি সাধারণ্যে প্রদর্শনের উপযোগী কিনা বিবেচনা করেন।

কলকাতার আঞ্চলিক শাখার প্রথম সেন্সার অফিসার নিযুক্ত হয়েছিলেন রামমোহন রায়, আই. এ. এস। তিনি নিজের উপাধিকে 'রে' বলাই পছন্দ করতেন। ১৯৫৪ সালে দিল্লীতে দেবিকারাণী ও পৃথিরাজ কাপুরকে আহ্বায়ক হিসাবে রেখে যে ফিল্ম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর উদ্যোগে, তাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে-ক'জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তার অন্যতম ছিলুম আমি। আর ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, পঙ্কজকুমার মল্লিক, মধু শীল, সৌরীন সেন, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় এবং উদয়শঙ্কর।

নাটক থেকে চিত্রনাট্য রচনা করা বেশ কিছুটা কঠিন ব্যাপার। তাই নিলদর্পণের চিত্রনাট্য করতে গিয়ে আমি প্রথমে পড়ে নিলুম নীলবিদ্রোহের বিস্তারিত ইতিহাসটি। তাতে প্রয়োজনমত নাটকের বাইরের ঘটনাও চিত্র-নাট্যে স্থান পেতে পারে। শেষ পর্যন্ত আমার চিত্রনাট্য শুধুই সাধুচরণ, রাইচরণ, রেবতী ও ক্ষেত্রমণির কাহিনীতেই সীমাবদ্ধ রইল না, তারও ওপরে হ'ল নীলচাষের গণ-আন্দোলন এবং নীলকর সাহেবদের গণ-অত্যাচারের একটি জীবন্ত চিত্র। মুরলীধরবাবু বেশ হৃষ্ট চিত্তেই আমার চিত্রনাট্যটিকে গ্রহণ করলেন এবং সেটিকে অনুমোদনের জন্যে মিঃ রের কাছে পাঠালেন। হপ্তা দুই বাদে তিনি চিত্রনাট্যটি যেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমার হাতে

ফেরত দিয়ে বললেন, "না, মিঃ রে এটিকে অনুমোদন করলেন না। একটু উল্টে পাল্টে দেখলুম, চিত্রনাট্যের অনেক জায়গাতে কতকগুলো কথার চার ধারে নীল পেন্সিল দিয়ে গোল দাগ দেওয়া। দেখলুম, কথাগুলি হচ্ছে গালা-গাল। মনে হল, এই গালাগালগুলিকে তিনি চিত্রনাট্যে স্থান দিতে চান না। "আচ্ছা দেখি, অন্য কোনও বই আমার মাথায় আসে কিনা", বলে অত্যন্ত বিমর্ষ চিত্তে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলুম।

এর বেশ কিছুদিন পরের কথা। ইতিমধ্যে মিঃ রের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত হৃদ্যতা জন্মে গেছে। একদিন ঠিক কি ব্যাপারে, তা আজ আর আমার মনে নেই, তাঁর ড্যালহাউসি স্কোয়ারের সেন্সার আপিসে গেছি। কথাবার্তা সেরে উঠব, উনি বললেন, "একটু বসুন না, একসঙ্গেই বেরুব।" অগত্যা বসতেই হ'ল। তিনি চটপট কাজ সেরে নিয়ে বললেন, "চলুন।" দু'জনে আফিস থেকে বেরোলুম। তিনি তাঁর গাড়ীর সোফারকে (চালক) বললেন, "কার্জন পার্কের মোড়ে গিয়ে অপেক্ষা কর, ওইখানে গিয়ে উঠব।" বলে আমার দিকে ফিরে বললেন, "চলুন একটু হাঁটি।" হেসে দু'জনে হাঁটতে শুরু করে দিলুম। কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথা কইবার পরে মিঃ রে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা পশুপতিবাবু, নীলদর্পণটা করলেন না কেন? অমন চমৎকার সিনারিও—।"

আমি অবাক বিস্ময় তাঁকে বললুম, "সে কি? আপনি ত সিনারিও অ্যাপ্রুভ্ করেন নি!" "অ্যাপ্রুভ্ করিনি? কে বললে?" তাঁর জিজ্ঞাসা। আমি জবাব দিলুম, "স্বয়ং মুরলীবাবু, কে আবার?—আপনি তো গালা-গালগুলি সম্পূর্ণ বাদই দিতে বলেছেন।"

"সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। আমি গালাগালগুলোকে দাগ দিয়েছি ঠিকই; কিন্তু তার মানে এ নয় যে, ওগুলোকে আমি একেবার বাদ দিতে বলেছি। আমি টেলিফোনে মুরলীবাবুকে বলেছিলুম, পশুপতিবাবুকে অনুরোধ করবেন, যেখানে সম্ভব, সেখানে ওগুলোকে বর্জন করতে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। একটা ভালো ছবি দেখব বলে আশা করে বসেছিলুম, ওঁরা ছবিটাকে হতেই দিলেন না?" এরপরে কার্জন পার্কের মোড় থেকে আমরা দু'জনেই ওঁর মোটরে চাপলুম। উনি রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে আমাকে নামাতে নামাতে বললেন, "বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিতুম, কিন্তু টালিগঞ্জে ছবির সেন্সারিং রয়েছে, তাই সেটা আর হ'ল না।"

মাথায় চিন্তা কোন্ গল্প করি, কোন্ গল্প ধরি! হঠাৎ মনে হ'ল, তারা-শঙ্করের 'গণদেবতা'টা করলে কেমন হয়। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' দুইই পড়া ছিল। গ্রাম্যশিক্ষক দেবু পণ্ডিতকে আমার ভালো লেগেছিল। বিলু, অনিরুদ্ধ কামার, স্বৈরিণী দুর্গা, নারীমাংসলোভী ছিরুমোছল প্রভৃতির চরিত্রবৈশিষ্ট্য আমাকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিল। ব'সে গেলুম এই দুই বই অবলম্বনে একটি চিত্রনাট্যের কাঠামো লিখতে, এমন কাঠামো, যা পড়লে কাহিনী অনুসরণে কোনও রকম অসুবিধে না হয়। শেষ করে আবার গেলুম

শ্রীধরবাবুর কাছে। তিনি বইটিকে অনুমোদন করে ব্যারাকপুর রোডের পর সিঁথির মোড়ে অবস্থিত এম-পি প্রোডাকসন্স স্টুডিওতে এক বৈকালে ঐ কাঠামো পড়বার দিন স্থির করলেন।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে হাজির হলুম। একটু পরেই মুরলীবাবু এলেন। তিনি এবং তাঁর কর্মীদের মধ্যে বিভূতি লাহা, যতীন দত্ত, বিমল ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন একসঙ্গে বসে আমার পাঠ শুনলেন। শোনার পরে মুরলীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এইসব দেখাতে পারবেন ? এই বৃষ্টি, রথ, বান—" আমি বললুম, "কেন পারব না ? আপনার কর্মীরা, বিশেষ করে খোকা (বিভূতি লাহা) যদি সাহায্য করে, তাহলে কিছুই কঠিন হবে না।" "আচ্ছা বেশ, তুমি দিনদুই বাদে আপিসে আমার সঙ্গে দেখা কর।"

কিন্তু এবারেও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হল না। দু'দিন বাদে দেখা করতে তিনি বললেন, "দ্যাখো, আমাদের আর্থিক অবস্থা এখন তেমন ভালো নয়। তাই আপাতত 'গণদেবতা'য় হাত দিতে পারছি না ; পরে দেখা যাবে।" মুরলী-বাবুর ওপর মনে মনে রীতিমত বিরক্ত হয়েই তাঁর কাছ থেকে চলে এলুম কোনও কথা না বলে।

এরই মধ্যে সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলকে জোরদার করবার চেষ্টা চলতে লাগল। বিশেষ করে আমারই আগ্রহে দেবকীকুমার বসু ও প্রমথেশ বড়ুয়া এই সংস্থায় যোগ দিলেন। এর বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল আশুতোষ কলেজের একতলার বিরাট হলে। সেই সভায় আমারই প্রস্তাবে প্রমথেশ বড়ুয়া সংস্থা-সভাপতি নির্বাচিত হলেন. আমি হলুম সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন করলে পেট ভরে না ; প্রায় বছর খানেক কর্মহীন অবস্থায় দিনযাপন করছি। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সিঁথির মোড়ে অবস্থিত এম. পি. স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলুম। কর্মাধ্যক্ষ বিমল ঘোষের সঙ্গে দেখা হ'ল। আমার অবস্থার কথা তাঁকে জানাতে তিনি জানতে চাইলেন আমার জানা কোনও কাহিনী আছে কিনা। আছে বলতে তিনি আমাকে সংক্ষেপে কাহিনীটি বিবৃত করতে বললেন।

আমি লাহোরিরাম পরাশরের জন্যে যে 'সুখদুঃখ' নামে কাহিনীটি থেকে ছবি করতে যাচ্ছিলুম, সেইটিই সংক্ষেপে বললুম। গল্পটি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে ধরল। তিনি বললেন, "দিন তিনেক বাদে আসবেন ; চুক্তিপত্রে সই ক'রে যাবেন।" কথামতই কাজ হ'ল। আমি মনের মত ক'রে চিত্রনাট্য লিখতে শুরু ক'রে দিলুম। চিত্রনাট্য লেখা শেষ হ'তে শিল্পী নির্বাচন পর্ব। আবার সেই সুনন্দা দেবীকে নেওয়া হ'ল মায়ের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে। তাঁর বিপরীতে নিতে চাইলুম ছবি বিশ্বাসকে। কিন্তু অনেক টাকার ফের—এই অজুহাতে ওঁরা অর্থাৎ বিমল ঘোষ কিছুতেই তাঁকে নিতে দিলেন না ; তাঁর পরিবর্তে নেওয়া হল কমল মিত্রকে।

অল্পবয়সী দুই প্রেমিক-প্রেমিকা রূপে অভিনয় করবার জন্যে উত্তমকুমার

ও স্মৃতিরেখা বিশ্বাসকে নির্বাচন করেছিলুম। উত্তমকুমার তখন এম. পি.-র মাস-মাইনে করা শিল্পী। কাজেই তাঁকে পেতে কোনও অসুবিধে হ'ল না। গোল বাধল স্মৃতিরেখা বিশ্বাসকে নিয়ে। বিমল ঘোষের নেক-নজরে তখন রয়েছেন করবী বলে একটি নতুন মেয়ে। তিনি নাছোড়বান্দা হয়ে তাকেই চাপিয়ে দিলেন আমার ঘাড়ে। সবচেয়ে অসুবিধে হ'ল ছবির ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে।

আমি যখন এই ছবির জন্যে চুক্তিপত্রে সই করে মুরলীবাবুর সামনে, তখন আমি বলেছিলুম, এই ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ করবার জন্যে যেন খোকা (বিভূতি) লাহাকে পাই। এবং মুরলীবাবুও তাতে অকুণ্ঠ সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ছবি করতে নেমে ভদ্রলোকের টিকিটি দেখতে পাওয়া গেল না। আমাকে দেওয়া হ'ল অনন্ত মৈত্র নামে তাঁর একজন সহকারীকে।

আমি এমন নিজের কাজে অনভিজ্ঞ, অথচ দুর্দান্ত পাজি লোক আমার এই দীর্ঘ জীবনে আর দ্বিতীয় কারুর সন্ধান পাইনি। একটু ট্রাকিং ও প্যানিং টিল্টিংয়ের শট নিতে বললেই তাঁর মাথা ঘুরে যেত। একটি কোনও শটের জন্যে তাঁর হিসেবে ঠিকমত আলোর ব্যবস্থা করতে তিনি পুরো একটি ঘণ্টা সময় নিতেন। আমি সেই শটের আর্টিস্টদের সংলাপ পড়ানো এবং চলাফেরা সম্বন্ধে অপরাপর কর্তব্য অনুশীলন করিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করতুম। যাঁরা আলোগুলিকে—তিন বা এক কিলো আলো নিয়ে তাঁর নির্দেশ অনুসারে স্থাপন করতেন, তাঁরা পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে যেতেন। একদিন তো তাঁদের প্রধান ক্ষেপে গিয়ে বললেন, "মৈত্রবাবু, হচ্ছেটা কি? একই আলোকে একবার এদিকে, একবার ওদিকে আর একটু সরিয়ে বসাতে এই যে সময় নষ্ট করছেন, একবার জোর, একবার একটু কম ইত্যাদি বলছেন, এর মানেটা কি?"

মৈত্র একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, "যা বলছি, তাই কর।" তারপরে সেই করবী গুপ্তা বলে নতুন মেয়েটি! অভিনয়ের অ-আ জানে না, তাকে দিয়ে অভিনয় করানো ঝকমারির ব্যাপার নয় কি? উত্তমকুমার তখনও পর্যন্ত পাকাপোক্ত দক্ষ শিল্পী, যাকে বলে ম্যাচিওর হয়ে ওঠেন নি। কাজেই তাঁর মধ্যে নার্ভাসনেস অর্থাৎ ঘাবড়ানোর ব্যাপারটা তখনও পুরোমাত্রায় বর্তমান।

মনে পড়ছে একটি দিনের কথা। উত্তমকে ডাকলে সে পিছন থেকে একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়াবে, তারপরে আর একটি কথা শুনে সে দরজার ওপার থেকে ভিতরে দুই পা এগিয়ে আসবে এবং একটু দাঁড়াবার পরে কথা বলতে বলতে একটি বিশেষ স্থানে এগিয়ে এসে থামবে।

এই শট্‌টির মহলা দেবার সময়ে সে বারে বারে ভুল করতে লাগল। আমি বারবার তাকে নিজে অভিনয় ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছি, তবু সে পারছে না। শেষ পর্যন্ত একটি মহলা নিতে গিয়ে দেখি, সে থরথর করে কাঁপছে। আমি তার কাছে গিয়ে বললুম, "কি ব্যাপার? হ'লটা কি?" সে উত্তর দিলে, "খুব

ইমোশান্যাল হয়ে পড়েছি।" উত্তরে আমি বললুম, 'ইমোশানাল নয়, বল নার্ভাস—থরথর করে কাঁপছো, একে নার্ভাসনেস বলে।"

এইবারে মূল শিল্পী সুনন্দা দেবীর কথায় আসি। ওঁর আসল নাম হচ্ছে ইলা। ইলাকে আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। আমাদের রামচন্দ্র মৈত্র লেনের কাছাকাছি রাজনারায়ণ বিশ্বাস লেনে ওর বাপের বাড়ী ছিল। ওর বাবা জগদীশ চক্রবর্তী ছিলেন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের কমলালয় নামে পোশাক-আশাক ও বেনারসী শাড়ী প্রভৃতির দোকানের ম্যানেজার। ওর কাকা অনাদি ছিল বঙ্গবাসী কলেজে আমার সহপাঠী। তার ওপর ১২ নম্বর রামচন্দ্র মৈত্র লেনে যে আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাব ছিল, তার কর্মকর্তারা ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে নাচগানের অনুষ্ঠান করতেন মাঝে মাঝেই, তাতে ইলা এসে যোগ দিত। সেই সুবাদে আমার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল তার সাত-আট বছর বয়েস থেকে। তার বিয়ে হয় হাতীবাগান বাজারে যে ব্যানারম্যান কোম্পানী ব'লে জামা-কাপড়ের দোকান ছিল, তারই অন্যতম মালিক সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিকের কোনও একদিন সুধীরবাবু ইলাকে সঙ্গে ক'রে আমার অশ্বিনী দত্ত রোডের বাসাবাড়ীতে আসেন এবং ইলাকে নামবার সুযোগ করে দিতে অনুরোধ করেন। আমি তখন সাফ জবাব দিই, "নিজের বোন অথবা স্ত্রীকে যদি ফিল্মে নামতে আমার বাধত না, তাহলে ইলাকেও নামতে সাহায্য করতুম। কিন্তু ফিল্ম লাইনকে আমি গৃহস্থ কন্যাদের নামবার পক্ষে তেমন নিরাপদ মনে করি না।"

এর কিছুদিন পরেই শুনলুম, নিউ থিয়েটার্সের আর্ট ডাইরেক্টার সৌরীন সেনের সহায়তায় সে ঐ প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হয়েছে, এবং 'কাশীনাথ' ছবির নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। তারপর আরও কিছু চরিত্রে অভিনয় ক'রে সে প্রায় দশ বছর বাদে এসেছে আমার পরিচালিত ছবিতে করতে। ইতিমধ্যে সে সফল অভিনেত্রী হিসেবে বেশ নামযশও পেয়েছে। পরিচালনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করলুম, সে মনে মনে বেশ অহঙ্কারী, একটা তমঃ ভাব তার মনকে সদাই আচ্ছন্ন করে আছে এবং সুযোগ পেলেই সেটা ফুটে ওঠে।

এর একটা অসুবিধে এই যে, এই রকম মানসিকতায় গৃহীত চরিত্রের দুঃখ বা আবেগকে যথাযথ রূপে ফুটিয়ে তোলা যায় না। শ্রীমতী সুনন্দা সেদিক দিয়ে আমাকে নিরাশ করেছিলেন। ফলে, আমার ছবিখানি, যার নাম আমি 'বিধিলিপি' দিতে চাইলেও কর্তৃপক্ষ দিয়েছিলেন 'নষ্টনীড়'—উপযুক্ত পরিমাণে আবেগচঞ্চল ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে নি। তার ওপর করবী গুপ্তার সর্বাঙ্গীণ ব্যর্থতা তো আছেই। তাই ১৯৫১ সালের ২৪এ আগস্ট উত্তরা, পূরবী এবং উজ্জ্বলাতে মুক্তিলাভের ছ'হপ্তা পরেই ছবিটিকে তুলে দিতে হয়।

এর কিছুদিন পরেই এলেন মোহন মজুমদার নামে এক ভদ্রলোক। তিনি তখন থাকতেন তিলজলা অঞ্চলে এক প্রকাণ্ড বাড়ীতে। শুনলুম, কোনও মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময়ের ফলে তিনি ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীর অধিকারী। ভদ্রলোক 'নিষ্কৃতি' ছবিটি আমাকে দিয়ে করাতে চান; কিন্তু শর্ত, আমার লিখিত চিত্রনাট্যের খসড়া দেখে যদি তিনি খুশী হন, তবেই তিনি আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন। অগত্যা তাঁর কথাতেই রাজি হ'তে হ'ল। তৈরী করলুম চিত্রনাট্যের খসড়া এবং যা অনুমান করেছিলুম, তাই হ'ল। তিনি আমার খসড়াতে খুশী হতে পারলেন না। দেখলুম, ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট করা সহজ কর্ম নয়। তিনি নিজে যা বোঝেন, তাই অভ্রান্ত, আর সবই ভ্রান্ত। অগত্যা নিরস্ত হলুম।

এই সময়ে তুলসী লাহিড়ী মশাই 'চাষী' নামে একটি কাহিনী আমার কাছে নিয়ে আসেন। এক চাষী তার ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে উকীল মোক্তার করতে চায়। গ্রাম থেকে শহরে ছেলে পড়তে যাবে ব'লে ধারদেনা ক'রে সে তাকে একটি সাইকেল কিনে দেয়। এই সাইকেলই কাল হ'ল। ছেলে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে তার পা ভাঙলো। তাকে কোনোক্রমে হাসপাতালে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু পা'টি ঠিক মত জোড়া লাগল না; চিরকালের জন্যে তার পা'টি অকেজো হয়ে গেল। মোট কথা চাষীর মন্দভাগ্য নিয়েই ছবিটি।

এই ছবিতে চাষীর ভূমিকায় আমি নিয়েছিলুম শম্ভু মিত্রকে এবং চাষী-বৌয়ের চরিত্রে অনুভা গুপ্তকে। ক্যামেরাম্যান ছিলেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনীটি পছন্দ হওয়ায় তিনি এই ছবি প্রযোজনা করতে স্বীকৃত হন। আমি অনেক খুঁজে মেমারীর নিকটবর্তী 'মায়ের আঁচল' ব'লে জায়গাটিকে ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে নির্বাচন করেছিলুম। কিন্তু এম. পি.-র খোকা লাহার নেতৃত্বে ওখানকার কলাকুশলীদের বিরোধিতা এবং তারই সঙ্গে শম্ভু মিত্রের যোগদান ছবিটিকে বেশী দূর অগ্রসর হ'তে দেয়নি। দেখলুম, মুরলীধরবাবু খোকা (বিভূতি) লাহা গোষ্ঠীর হাতে 'খেলার পুতুল' মাত্র।

আশ্চর্য! তাঁর দলভুক্ত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় (যতীন দত্তর সহকারী শব্দযন্ত্রী) মুরলীবাবুর সামনে এমন ভাবে কথাবার্তা কইতে সাহস পায়, যেন সেই এম পি. প্রোডাকসন্সের সর্বময় কর্তা, মুরলীবাবু কেউ নন। শম্ভু মিত্রের আশ্চর্য অসহযোগিতা আমাকে রীতিমত বিস্মিত করেছিল। সবাই জানেন, বহির্দৃশ্য তুলতে গেলে সূর্যোদয় হওয়া মাত্র কাজ শুরু করতে হয়। শম্ভুবাবু কিন্তু দু'কাপ লেবু চা পানের পরে যতক্ষণ না তাঁর কোষ্ঠ পরিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ নট্ নড়নচড়ন!

এরই কিছু দিন বাদে এলেন রাজা বসন্ত রায় রোড নিবাসী ক্ষেত্রমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি নাকি পূর্বোক্ত মোহন মজুমদারের অংশীদার। তিনি বললেন, "আমি একাই 'নিষ্কৃতি' ছবিখানি করব এবং আপনি হবেন তার পরিচালক। ছবির পরিবেশক নিযুক্ত হলেন নারায়ণ পিকচার্স এবং তাঁদেরই পরামর্শে ছবির চিত্রনাট্য লেখবার জন্যে আহ্বান জানানো হ'ল নিতাই ভট্টাচার্যকে। তিনি এসে যখন শুনলেন, আমি হব ঐ ছবির পরিচালক, তখন বলেছিলেন, "পশুপতিবাবু যে-ছবির পরিচালক, সে ছবির চিত্রনাট্য তো তিনি নিজেই লিখবেন, আমাকে শুধু শুধু ডেকেছেন কেন ?"

তবু ওঁরা জোর করতে বলেছিলেন, "দেখছি, আমার অদৃষ্টে তিন হাজার টাকা নাচছে ; ঠিক আছে, লিখে দিতে বলছেন, লিখে দিচ্ছি।" একটি মোটা বাঁধানো এক্সারসাইজ বুক আকারের খাতায় তিনি চিত্রনাট্য লিখে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে তিনটি হাজার টাকা দক্ষিণা নিয়ে চ'লে গেলেন। তাঁর লেখা চিত্রনাট্য পড়া হ'ল এবং ফল ? না, ওটা পাঁচজন শ্রোতার মধ্যে কাউকেই পরিতৃপ্ত করতে পারল না। অতএব যথারীতি আমাকেই কলম ধরতে হ'ল।

লেখা শেষ ক'রে যখন আমার দোতলার ঘরে প'ড়ে শোনালুম, তখন সেই শ্রোতৃবৃন্দই উল্লসিত, উৎফুল্ল। ছবির তিনটি স্ত্রী চরিত্রে—তিনজন জায়ের চরিত্রে নিলাম মলিনা দেবী, রেণুকা রায় ও সন্ধ্যারাণীকে এবং তাঁদের তিন স্বামীর চরিত্রে যথাক্রমে জহর গাঙ্গুলী, কালী সরকার এবং অসিতবরণকে।

রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওতে যথারীতি শ্যুটিং আরম্ভ হ'ল। দলে দলে দর্শক আসতে লাগল শ্যুটিং দেখতে। সে-বছর ভীষণ গরম পড়েছিল। কিন্তু শ্যুটিংয়ের ঝোঁকে সকলেই গরমকে উপেক্ষা ক'রে চলেছি। এমন কি, দর্শক-বৃন্দও। বড় বৌ সিদ্ধেশ্বরীর শোবার ঘরের দৃশ্যে শ্যুটিং চলছে। মন রয়েছে শটের ওপর। এই শট্‌টিকে কোন্‌খানে কিভাবে সমাপ্ত করব, যাতে পরের শট্‌টিকে এর সঙ্গে smoothly অর্থাৎ বেশ মোলায়েম ভাবে জোড়া যায়, মাথায় সেই চিন্তা।

হঠাৎ মলিনাদেবী আমার ধ্যানভঙ্গ ক'রে আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর বিছানার কাছে। আমি যেন কিছুটা বিরক্ত হয়েই তাঁর কাছে যেতে তিনি বললেন, "একটু ব্যাঘাত ঘটালুম। কিন্তু পিছন দিকে তাকিয়েছেন কি একবারও ? একটি বার তাকিয়ে দেখুন।"

তাঁর কথায় চোখ ফিরিয়ে দেখি, মাত্র হাত আষ্টেক পরিসরের মধ্যে গাদাগাদি ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন অসংখ্য দর্শক। গণনা করবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। গুণে দেখি, ঐটুকু জায়গায় স্থান ক'রে নিয়েছেন অন্তত ১০৮ জন লোক। গরমের মধ্যে ঠাসাঠাসিতে সকলে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছেন ; কিন্তু সেদিকে কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই, সকলেই একাগ্রচিত্তে শ্যুটিং দেখতে ব্যস্ত। কোনও ছবির শ্যুটিং দেখতে এ রকম জনসমাবেশ হয়, এ আমি জীবন কোনও দিন দেখিও নি, শুনিও নি।

শ্যুটিং চলেছে তরতর ক'রে এগিয়ে। একদিন মেজো জা নয়নতারার চরিত্রাভিনেত্রী দিলখোলা মেয়ে রেণুকা রায় ঐ শ্যুটিংয়ের মাঝেই বললেন, "দাদা, জবর খেলা খেলছেন যা হোক ; একসঙ্গে তিন ঘোড়াকে ছুটিয়েছেন।" এ-কথার আর কি জবাব দেব, শুধু মৃদু হাসলুম। ছবিটিতে সঙ্গীত-পরিচালনা করেছিলেন বোম্বে টকীজের ভূতপূর্ব সঙ্গীত-পরিচালক রামচন্দ্র পাল। অবশ্য এ-ছবিতে গানের সুযোগ খুবই কম ছিল।

যথাসময়ে ছবিটি শেষ হ'ল এবং ১৯৫৩ সালের ২রা অক্টোবরে শ্রী, পূর্ণ ও প্রাচীতে মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই অভূতপূর্ব জনসমাদার লাভ করল। শ্রী'র পাশেই উত্তরা সিনেমাতে পরের সপ্তাহেই মুক্তি পায় নরেশচন্দ্র মিত্র পরিচালিত 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট'। চমৎকার ছবি। কিন্তু 'নিষ্কৃতি'র পাশে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে ছবিখানি দাঁড়াতে পারেনি। নারায়ণ পিকচার্স থেকে খবর পেয়েছিলুম, বছর দুয়েকের মধ্যে ছবির প্রযোজক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছবি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন অন্তত ২১ লক্ষ টাকা।

অবশ্য আর্থিক সাফল্যের দিক দিয়ে আমার ছবিগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে আছে 'অরক্ষণীয়া'। পি. এন. রায়ের কাছ থেকে ছবিটির পূর্ণ স্বত্ব কিনে নেন ইন্দ্রকুমার কার্নানী। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি, কি কারণে তা আজ আর মনে নেই, তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে গেলে তিনি যখন শোনেন আমি নিষ্কর্মা অবস্থায় ব'সে আছি, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে বলেন, "ইয়ে কভী হো ন্যহি শক্‌তা হ্যয় ; তোম্‌ তো কামধেনু হ্যয়। জান্‌তা হ্যয়্‌ অরক্ষণীয়া মুঝে কেত্‌না লাফা দিয়া ? পাঁচ সালকা অন্দরমে মুঝে মিলা সাতাইশ লাখ রুপিয়া। আভি তক্‌ যভ্‌ভি মেরা স্টাফকে মাহিনা দেনেকো তক্‌লিফ্‌ হোতা, ম্যয় পুছ্‌তা অরক্ষণীয়া চল্‌তা ? আওর উ লোক যব বোলতা, প্রিন্ট খারাপ হো গ্যায়, তো ম্যয় ঝট্‌সে চেক নিকালকে দেতা—যাও, র' স্টক খরিদকর্‌ দোঠো প্রিন্ট বানা লেও। ব্যস, এক মাহিনাকে অন্দর উলোক কো দিল খুস্‌, মুমে হাসি।"

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

'নিষ্কৃতি' মুক্তিলাভের কিছুদিন পরেই নারায়ণ পিকচার্সের ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ আপিসে রাধা ফিল্মস্‌ স্টুডিওর অন্যতম মালিক মাধব ঘোষাল আমার সামনে প্রস্তাব রাখলেন 'ষোড়শী' ছবিখানি করবার জন্যে। চুক্তি হয়ে গেল। এ বারে ঐ নারায়ণ পিক্‌চার্সের পরামর্শে মাধববাবু ছবির চিত্রনাট্য রচনার ভার দিলেন মণি বর্মার (পরিচালক-অভিনেতা ফণী বর্মার ভ্রাতা) ওপর। ভদ্রলোক চিত্রনাট্য লিখলেন, পাঠ করলেন ও যথানিয়মে সেটি শ্রোতৃবৃন্দের অপছন্দ হ'ল।

অতএব বরাবরের মত এবারেও আমাকেই কলম ধরতে হ'ল। শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' কাহিনীর দুটি দিক আছে। এক, জীবানন্দ এবং অলকার (ষোড়শীর আসল নাম) আত্মিক সম্পর্ক এবং দুই, জমিদার জীবানন্দ ও প্রজাবর্গের মধ্যে জমিজমা ও খাজনা দেওয়া-নেওয়া নিয়ে সংঘর্ষ। এই দুটি

দিককে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ঠিকমত চিত্রটিকে জনসমক্ষে তুলে ধরার মধ্যে যেমন মুনশীয়ানার প্রয়োজন, তেমনই দরকার বিস্তৃত পরিসরের।

চিত্রনাট্য লেখা শেষ করবার আগেই আমি ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে কথা কয়েছিলুম 'জীবানন্দের ভূমিকাটির জন্য। ঐ সময়েই তিনি আমাকে অনুরোধ করেন, চিত্রনাট্যটি তাঁকে শোনাবার জন্যে। তাই যেদিন আমি চিত্রনাট্যটি পড়ি, সেদিন আগে থাকতে সংবাদ পেয়ে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। চিত্রনাট্যটি এমনই দীর্ঘায়ত যে, এটিকে টানা একসঙ্গে শোনবার ধৈর্য কারুরই ছিল না। কাজেই অর্ধেকটা প্রথম দিনে এবং বাকী অর্ধেকটা দ্বিতীয় দিনে প'ড়ে শোনাতে হয়।

আমি পড়া শেষ করতেই অন্য কাউকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ছবিবাবু বলেন, "আমি একটি কথা প্রথমে ব'লে নিই, তারপরে যে যা বলবার বলবেন। এই সিনারিও থেকে একটিও দৃশ্য যদি বাদ দেওয়া হয় কিংবা একটিও সংলাপ যদি কাটা হয়, তাহ'লে আমি তার মধ্যে নেই, আমাকে আপনারা বাদ দিতে পারেন।" তাঁর কথা শুনে মিঃ মল্লিক (দুর্গাদাস বসু মল্লিক) বললেন, "তা'হলে তো আর কোনও কথাই চলে না। তবু আমি পশুপতিবাবুকে জিজ্ঞেস করছি, ছবিটা একটু বড়ো হবে, তাই না? অন্তত ১৭।১৮ রীল।"

জবাবে আমি বললুম, "একটু বড়ো নয়, বিলক্ষণ বড়ো হবে। ১৭।১৮ রীল নয়, নিদেন পক্ষে ২২ রীল হবে।" সঙ্গে সঙ্গেই বললুম, "শরৎবাবুর এই কাহিনীর ওপর সুবিচার করতে হ'লে ছবিকে এত বড়োই করতে হয়। এখন আপনারা বলুন, এই ঝুঁকি আপনারা নেবেন কিনা। সর্বদিক বেশ ভেবেচিন্তে বলবেন। কারণ ২২ রীলের ছবি মুক্তি দিতে হ'লে এখন থেকেও আপনাদের হাউসগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। সাধারণ তিনটি প্রদর্শনীর জায়গায় প্রতি হাউসে মাত্র দুটি ক'রে প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করতে হবে এবং সেই কারণে টিকিটের কিছুটা মূল্যবৃদ্ধিও করতে হবে। মনে করুন, 'Gone with the Winds' ছবির কথা।"

এই সময়ে ছবিবাবু বললেন, "আমি চলি, আপনারা ভাবুন। তবে এই ছবি করতে পারলে একটা কীর্তি থাকবে, সে-কথা আমি বলতে পারি।" বলেই তিনি রওনা দিলেন। মিঃ মল্লিক, তাঁর ছেলে সুনীল বসু মল্লিক (পরবর্তী জীবনে পরিচালক, প্রযোজক ও পরিবেশক), প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ও মাধববাবু নিজেদের মধ্যে কিছুটা শলাপরামর্শ ক'রে সাব্যস্ত করলেন, বড়ো ছবিই করবেন তাঁরা, তার জন্যে যে-ঝুঁকি নিতে হয়, নেবেন।"

ছবির প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে গেল। ষোড়শীর ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে আমি নির্বাচন করলুম অনুভা গুপ্তকে। তাঁকে আনিয়ে কিছুটা মহলা দিয়ে আমি খুশীও হয়েছিলুম। কিন্তু নারায়ণ পিকচার্সের মহাপ্রভুরা, বিশেষ ক'রে সুনীল বসু মল্লিক জিদ করলেন, ঐ ভূমিকার জন্যে দীপ্তি রায়কে নিতে হবে। আমাকে তাঁর অভিনয়ক্ষমতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল

করবার জন্যে তাঁরা আমাকে অগ্রদূত পরিচালিত 'আঁধি' ছবিও দেখালেন। তাতেও আমি অবিচলিত থাকলেও তাঁরা একরকম জোর ক'রেই ঐ দীপ্তি রায়কেই নিতে বাধ্য করলেন। তাঁরা একবারও বুঝলেন না, ষোড়শীর কঠিন ও কোমল, দুটি দিক আছে। এই দুই দিককেই সম্যকভাবে প্রকাশিত করতে অনুভার জুড়ি নেই। দীপ্তি রায়ের চেহারা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোনই কাঠিন্য নেই। আমি বহু চেষ্টা করেও তাঁর ভিতর থেকে এই কাঠিন্য বার করতে পারিনি।

শরৎচন্দ্রের বহু রচনার মধ্যে একমাত্র এই 'দেনা-পাওনা'র কাহিনীটির অকুস্থল হচ্ছে বাঁকুড়া জেলা। বাঁকুড়া জেলায় পাহাড় এবং তার ধার দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদীর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আমি অমল হোমের কাছে গেলুম; তিনি তখন প্রস্তাবিত দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের প্রচার সচিব। তাঁর কাছে গিয়ে আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে তিনি বহু ম্যাপ ঘেঁটে আমাকে দেখিয়ে বললেন. বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে এমন একটি স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আমি গেলুম বাঁকুড়া এবং সেখানকার নিউ সিনেমার মালিক প্রেমজীভাইয়ের জীপগাড়ী নিয়ে দু'দিন ধ'রে শুশুনিয়া পাহাড় থেকে শুরু ক'রে অপর দিকে অম্বিকানগর পর্যন্ত চক্কর খেয়ে বাঞ্ছিত জায়গাটি খুঁজে বার করলুম। পাশাপাশি ছোট ছোট সাতটি পাহাড়, তারই কোল দিয়ে বয়ে চলেছে কুমারী নদী, যা অম্বিকানগরের ধার পর্যন্ত যাবার আগেই মিশেছে কংসাবতী বা কাঁসাই নদীর সঙ্গে। এই অম্বিকানগরেই একদা ছিল তন্ত্রের সাধনা, পাথরের বিরাট মূর্তিওয়ালা চণ্ডীদেবীর পূজা হ'ত। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। কলকাতায় ফিরে ভালো ক'রে ছ'কে নিলুম অন্তর্দৃশ্য ও বহির্দৃশ্য গ্রহণের কর্মসূচী। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর।

বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে আমার কলাকুশলীদের নিয়ে যখন প্রথম বাঁকুড়া গেলুম তখন সে কি তুমুল বৃষ্টি। একটু বৃষ্টি থামতে জীপে ক'রে যখন শ্যুটিংয়ের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছুলুম, তখন কুমারী ও কংসাবতীর সঙ্গমস্থলে, যেখানে শুখার সময়ে খালি বালি আর বালি, সেখানে জল আথালি-পাথালি করছে, আর কি খরস্রোতা হয়ে উঠেছে নদী দু'টি!

দু'দিন অপেক্ষা করার পরে শ্যুটিংয়ের আশা পরিত্যাগ ক'রে কলকাতায় ফিরে এলুম। ছবিবাবুকে নিয়ে শ্যুটিং করতে গিয়ে দেখলুম, তিনি জীবানন্দের চাপা আবেগকে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছেন না; ফলে আমার মনে হ'তে লাগল, কার সংলাপ কে বলছে! আমি জীবানন্দের ভূমিকায় শিশিরকুমারকে প্রচুরবার দেখেছি, যখন তিনি প্রথম 'ষোড়শী' নাটক মঞ্চস্থ করেন। তাঁর সেই চাপা আবেগের বহিঃপ্রকাশে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ থম্‌থম্‌ করত। যে-সব দৃশ্যে এই ধরনের অভিনয় আছে, সে-সব দৃশ্যে ছবিবাবুকে অত্যন্ত সাদামাটা ব'লে আমার মনে হ'ল।

এরই মধ্যে আবার বাঁকুড়া গিয়ে ওখানকার শ্যুটিং পর্ব সেরে এলুম।

সমস্ত শ্যুটিং শেষ ক'রে যখন সম্পাদনা করলুম, তখন আমার পূর্বের অনুমান সত্যি ব'লে প্রতিপন্ন হ'ল ; ছবিটা দাঁড়াল ২২ রীলের। এত বড় ছবি দেখে দর্শকমনে কি প্রতিক্রিয়া হবে, তা যাচাই করবার জন্যে আনন্দবাজারের তখনকার সিনেমা-সম্পাদক সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশ পত্রিকার পংকজ-কুমার দত্ত প্রমুখ কয়েকজন বোদ্ধা, সাহিত্যিক বন্ধুকে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে ছবিখানি দেখালুম।

প্রদর্শনী শুরু হবার আগে সবাইকে বললুম, ছবিটি একটু বড়ো হয়েছে, একটু ধৈর্য ধ'রে দেখবেন। ছবি শেষ হ'তে সুশীলবাবু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "চমৎকার ছবি করেছ ভাই। আর বড়ো বড়ো কি বলছ, সবে তো দু'ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগল, এমন কি বড়ো হয়েছে ?"

আমি তাঁর ভ্রম সংশোধন ক'রে বললুম, "২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট নয়, সময় লেগেছে ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট।"

"কিন্তু তাতো বোধ হ'ল না, একটুও ক্লান্তি লাগেনি, not a bit tiresome", বললেন সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরাপর বন্ধুরাও একই মত ব্যক্ত করলেন।

আমি বললুম, "আমিও এইটেই দেখতে চেয়েছিলুম, ছবিটা দেখতে tiresome লাগে কিনা।" ল্যাবরেটারীর মিঃ মেহতা বললেন, "ব্যস, এবার raw stock কাঁচা ফিল্ম এনে দিন, আমি একটু ধ'রে প্রিণ্ট করব, যাতে ছবিটা লোকের চোখকে খুশী করবে।" কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। পরিবেশকদের কাছ থেকে ফিল্ম পজিটিভ বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পৌঁছোল না অন্ততঃ দিন পনেরোর মধ্যে। পরিবর্তে ঐ পনেরো দিনের পর পরিবেশকরা প্রযোজককে সঙ্গে ক'রে আমার কাছে এলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "পশুপতিবাবু, সিনেমা-মালিকেরা কিছুতেই রাজি হ'ল না আমাদের কথায়। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি একটু কাঁচি চালিয়ে ছবিটিকে ২২ রীল থেকে অন্তত ১৪ রীলে এনে দিন—এ আপনি মনে করলেই পারবেন।"

শুনে আমি হাসব, কি কাঁদব, বুঝতে পারলুম না। বললুম, "আপনাদের প্রস্তাবটা কি রকম জানেন ? একটি ১২ হাত উঁচু কালীমূর্তি গড়া হয়ে গিয়েছে। তারপরে বলা হচ্ছে, ঐ মূর্তিটিকে ছোট ক'রে ৬ হাতে দাঁড় করাতে হবে ; পেটটা খানিকটা বাদ দেওয়া, পা দুটোকে ছোট ক'রে দেওয়া, কপালটা আধখানা ক'রে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এ করা যাবে না। তার চেয়ে এ-ছবিটা ফেলে দিয়ে নতুন চিত্রনাট্য লিখে আবার নতুন ক'রে শ্যুটিং ক'রে ১৩।১৪ রীলের মতো ছবি তৈরী করা যেতে পারে। বলুন, রাজি আছেন কিনা ?"

"ওরে বাবা, সে যে নতুন ক'রে কেঁচেগণ্ডূষ করা,—সে যে ডবল ক'রে টাকা খরচের ব্যাপার আবার তিন-চার মাস ধ'রে। না, না, এইটেকেই যা-ক'রে হোক ছোট ক'রে দিন ; আপনি পারবেন।"

অতএব পারতেই হ'ল। ছবির ছন্দ, সৌন্দর্য, মনোহারিত্ব, সব জলাঞ্জলি

দিয়ে একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হ'ল ছবিটিকে ছোট করবার জন্যে কোথায় কাঁচি চালানো যায়। শেষ পর্যন্ত ছবিকে কেটে ছেঁটে বোঁচা করে দিয়ে ১৫ রীলের ছবিতে দাঁড় করানো হ'ল মোদ্দা গল্পটিকে জনসাধারণের কানে পেঁছে দেবার জন্যে। ছবির রসকষ গেল উবে। পূর্ণ থিয়েটারের তদানীন্তন ম্যানেজার সানুদা (হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়) বললেন, "ষোড়শী তো নয়, ঠিক যেন সাঁড়াশি।" সত্যিই 'ষোড়শী' হয়েছিল ঐ অন্যায় কাটছাঁটের ফলে শুধুই কথার কচ্‌কচি।

এই 'ষোড়শী' সম্পর্কে দু'টি বিচ্ছিন্ন কথা আমার মনে পড়ছে। এক, আমি ষোড়শী'র চিত্ররূপ দিচ্ছি, সংবাদপত্রে এই কথা প্রকাশিত হবার পরে একদিন শিশির-সম্প্রদায়ের অন্যতম নট মণি শ্রীমাণি আমার বাসভবনে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, আসচে শনিবার বড়বাবু (শিশিরকুমার) 'ষোড়শী' মঞ্চস্থ করছেন। তিনি আপনাকে ঐ অভিনয়ে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মনে মনে হেসে বললুম, "তাঁর আমন্ত্রণ আমি উপেক্ষা করতে পারি না। আমি নিশ্চয়ই যাব। তবে এও নিশ্চয়, তাঁকে আমি তাঁর এই বয়েসে (তখন তিনি ৬৩ বছরের বৃদ্ধ) জীবানন্দের ভূমিকায় নিতে পারব না।" গেলুম এবং দেখলুম, তিনি পরচুল মাথায় দিয়ে অভিনয় করছেন। অভিনয় অত্যন্ত কষ্টকৃত ও প্রাণহীন। আমি একটি অংক দেখবার পরেই চ'লে আসি। পরে শুনেছি, তিনি আক্ষেপ ক'রে বলেছেন, "পশুপতি একটি অংক দেখেই চ'লে গেল। ভালো লাগল না নিশ্চয়ই; আর তা লাগবেই বা কেন?"

আর দুই হচ্ছে, 'ষোড়শী'তে আমি জীবানন্দের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে প্রথমে নির্বাচন করি প্রমথেশ বড়ুয়াকে। 'দেনা-পাওনা'র জীবানন্দের চেহারার যে বর্ণনা আছে, চেহারা দেখলে চব্বিশও মনে হ'তে পারে, আবার চল্লিশও হ'তে পারে,—তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় মিঃ বড়ুয়ার চেহারা। তাঁর কাছে প্রস্তাব রাখতে তিনি সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন ক'রে বলেছিলেন, "আমি সম্পূর্ণ তোমার নির্দেশ অনুসারে অভিনয় করব—অ্যাক্টর প্রমথেশ বড়ুয়া।" কিন্তু যখন আমি 'ষোড়শী' শুরু করলুম, তখন তিনি আর ইহ-লোকে নেই। তার অন্ততঃ দু'বছর আগে ১৯৫১ সালের ২৯এ নভেম্বর তারিখে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

উনি যে-দিন মারা যান, সেদিন আমি কলকাতায় ছিলুম না। গিয়ে-ছিলুম জামশেদপুরে মিঃ পি. এন. রায়ের হয়ে টাটা কোম্পানীর একটি বিজ্ঞাপনী চিত্র তুলতে। তার পরদিন ফিরে যখন মিঃ রায় প্রেরিত মোটরে চেপে শহরের দিকে আসছি, তখন গাড়ীর ড্রাইভার শ্যামবাবু আমাকে এই শোকসংবাদটি দিলেন এবং বললেন, কাল মিঃ বড়ুয়ার মরদেহ নিয়ে শোক-যাত্রা লোকের ভীড়ে একটি বিরাট মিছিলে পরিণত হয়েছিল।

বড়ুয়া সাহেব ছিলেন আমাদের সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। কাজেই সংস্থার সম্পাদক হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল যত শীঘ্র

সম্ভব একটি শোকসভার আয়োজন করা। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিচারপতি কমলচন্দ্র চন্দ্রকে ঐ সভার নেতৃত্ব দেবার জন্যে আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নিলুম। গেলুম তাঁর বাড়ীতে। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ'তে তাঁর কাছে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা বললুম। তিনি আমাদের অপেক্ষা করতে ব'লে ভিতরে গেলেন এবং একটু পরে ফিরে এসে বললেন, উনি একটু ব্যস্ত আছেন, তাই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারলেন না ; তবে তিনি আপনাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং আপনাদের নির্দিষ্ট দিনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে (ঐখানেই আমরা সভাটির অধিবেশন করা স্থির করেছিলুম) পৌঁছুবেন।

আমরা চ'লে এলুম। কার্ড ছাপানো হ'ল। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার প'ড়ে গেল। কার্ড নিয়ে আবার গেলুম জাস্টিস চন্দ্রের বাড়ী। কিন্তু এবারেও দেখা করলেন জাস্টিস চন্দ্রের স্ত্রী, খোদ ব্যক্তির দেখা মিলল না। অবশ্য যথারীতি মিসেস চন্দ্র এবারেও বললেন, তাঁর স্বামী যথাসময়েই ইনস্টিটিউটে পৌঁছাবেন, কিছু চিন্তা করবেন না। কিন্তু তাঁর আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও মনে একটা খট্‌কা লেগে রইল।

সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। নির্দিষ্ট দিনে অনেকটা সময় হাতে রেখে আমরা সদলবলে ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউটে পৌঁছুলুম। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আমন্ত্রিতের দল যথাসময়ে এসে হাজির হলেন। শুধু এলেন না নির্বাচিত সভাপতি জাস্টিস্ কমলচন্দ্র চন্দ্র। তাঁর পরিবর্তে এলেন তাঁর স্ত্রী এবং এসেই তাঁর স্বামীর অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির কারণ বর্ণনা করতে লাগলেন। তাঁর কথা শোনবার আমার সময়ও ছিল না, মনও ছিল না। কারণ তখন ইনস্টিটিউট হল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে ; একতলা ও দোতলা—কোথাও তিলধারণের ঠাঁই নেই।

তাড়াতাড়ি সভা শুরু ক'রে দেওয়া হ'ল তারাশঙ্করকে সভাপতিত্বে বরণ ক'রে। ইনস্টিটিউটের স্টেজের পিছনের দরজা খুলে দিয়েছিলুম বিশেষ অভ্যাগতদের প্রবেশের জন্যে। সেখানে প্রয়োজনীয় রক্ষীদল মোতায়েন থাকলেও বারে বারে আমি ছুটে যাচ্ছিলুম দেখতে কোনও বিশেষ ব্যক্তি সেখানে হাজির হয়েছেন কিনা। একবার গিয়ে দেখি হন্তদন্ত হয়ে ট্যাক্সি থেকে নামছেন পৃথ্বীরাজ কাপুর। তিনি সেইদিন সকালেই বোম্বে থেকে এসে পৌঁছে এই সভার কথা শুনে রবাহূতই এসেছেন প্রয়াত মিঃ বড়ুয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। কখনও গান কখনও বক্তৃতার ভিতর দিয়ে সভা শেষ হ'ল প্রায় ঘণ্টা দেড়-দুই পরে। একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য উদ্‌যাপন করা হ'ল।

নভেলটি ফিল্মস্ প্রযোজিত 'ষোড়শী' ১৯৫৪ সালের ২৯এ অক্টোবর রাধা, পূর্ণ ও প্রাচী সিনেমায় মুক্তিলাভের আগেই কিন্তু আমি আমার পরের ছবি 'নিষিদ্ধ ফল'-এর কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত এই গল্পটির একটি নির্বাক চিত্ররূপ দিয়েছিলেন পরিচালক কালী-

প্রসাদ ঘোষ বি. এস-সি.। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (হাস্যরসিক ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে পৃথক ব্যক্তি) ও রেণুবালা (সুখ) ছিলেন এই ছবির নায়ক-নায়িকা। বিবাহের পরেও এঁদের মা-বাবা এঁদের পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথে এঁরা অল্পবয়সী, এই অজুহাতে বাধার সৃষ্টি করায় সংঘাতের সূচনা হয় এবং নানা হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এঁরা বাপমাকে ফাঁকি দিয়ে মিলিত হন।

আজ ভেবে দেখছি, ছবিটিকে সত্যিই একটি হাস্যকৌতুকের নির্ঝর ক'রে তোলা প্রকৃতই সম্ভব ছিল। কিন্তু আমার তখনকার মনের গঠন নিশ্চয়ই হাস্যপরিহাসের অনুকূলে ছিল না। তাই মাহেশ্বরী চিত্রমন্দিরের প্রযোজনায় গ'ড়ে তোলা আমার 'নিষিদ্ধ ফল' সাধারণ দর্শকদের পক্ষে তেমন হাসির খোরাক হয়ে উঠতে পারে নি। ছবিটি শ্রী, বীণা ও বসুশ্রী সিনেমায় ১৯৫৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী মুক্তিলাভ করে।

এর পরে কিছুদিন নিরুদ্দেশ্যভাবে সময় কেটে যাবার পরে একদা নারায়ণ পিকচার্সের মালিক সত্যনারায়ণ খাঁ আমার প্রস্তাবে শরৎচন্দ্রের 'মামলার ফল' কাহিনীটির চিত্ররূপ দিতে রাজি হলেন। খুব খেটে চিত্রনাট্য তৈরী করবার পরে আমার বাড়ীর দোতলার ঘরটিতে প'ড়ে শোনাবার ব্যবস্থা করলুম। এই ঘরটিতেই আমার সমস্ত ছবির চিত্রনাট্য যেমন তৈরী হয়েছে, তেমনই সেগুলির অধিকাংশই ('পরিণীতা' এবং 'অরক্ষণীয়া' বাদে) পড়েও শোনানো হয়েছে।

পড়া শেষ হ'তে অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই সঙ্গীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় ব'লে উঠলেন, "পশুপতিদা, আপনি কাহিনীটিকে Two Mothers and a Son"-এর গল্পে পরিণত করুন, দেখবেন, দারুণ ছবি হবে, আপনার পক্ষে কিছুই কঠিন নয়।" অমনই সব শিয়ালের এক রা। প্রত্যেকেই রবীনবাবুর কথায় সায় দিয়ে বললেন, তাই করুন।

আমি বললুম, "যদি এটা দুই মাতা ও এক সন্তানের কাহিনী হ'ত, তাহ'লে শরৎচন্দ্রই তা করতেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, একজন বিমাতা যখন এক মা-মরা সপত্নীপুত্রকে নিজের ক'রে নিতে পারল না, তখন তার জেঠাইমা তার ওপর মাতৃস্নেহধারা অজস্রধারে বর্ষণ করলেন। এতে Two Mothers and a Son গল্প করবার সুযোগ কোথায়? সে যে হবে খোদার উপর খোদকারি।"

কিন্তু কার কথা কে শোনে? মনে হ'ল, আমার কি দুর্ভোগ। সাধারণ রস জ্ঞানবর্জিত লোকেদের খুশী করতে করতেই জীবনটা গেল। তাই মলিনা দেবী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি সেরা সেরা শিল্পী সমন্বয়ে গঠিত 'মামলার ফল'ও হ'ল, 'না ঘরকা, না ঘাটকা'। মনটা আমার সত্যিই মুষড়ে গেল। এই ছবি সম্পর্কে আরও দু'চারটে কথা কইতেই হয়।

এই ছবিতে ছবি বিশ্বাসের মাত্র একদিনের কাজ ছিল, যা তিনি সচরাচর করতে রাজি হন না। সে বছরে ১লা বৈশাখ বসুশ্রী সিনেমার কর্তৃপক্ষ—ফণী বসু ও তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ একটি আনন্দ আসর বসিয়েছিলেন ঐ সিনেমা গৃহে। দৈবাৎ আমি ও ছবিবাবু পাশাপাশি বসেছিলুম। এক সময়ে আমি তাঁকে বললুম, "ছবিদা, আমি যে-ছবিটা করছি, তাতে এক জমিদারের ভূমিকাতে আপনার একদিনের কাজ আছে ; এটা আপনাকে ক'রে দিতেই হবে, না বললে চলবে না।"

"একদিনের কাজ ? কত পারিশ্রমিক দেবে ?" "যা চাইবেন, তাই দেব", আমার উত্তর। শুনে হেসে বললেন, "যদি দশ হাজার চাই ?" "তাই দেব", বললুম আমি।

ছবিদা আমার দিকে তাকালেন এবং হেসে বললেন, "ক'রে দেব।" একটু থেমে বললেন, "এবং তুমি যা দেবে, তাই নেব ; যদি পয়সা নাও দাও, তাহলেও করব।"

আমি চমৎকৃত হয়ে বললুম, "তাহলে আপনার নোটবইয়ে লিখে নিন তারিখটা—" ব'লে জুন মাসের একটা তারিখ দিলুম। ছবিদার সঙ্গে সব-সময়েই নোট বই থাকত। সেটিকে বার ক'রে তারিখটা লিখে নেবার পরে সেটিকে আবার পকেটে পুরতে পুরতে তিনি বললেন, "এত আগে থেকে তারিখ দিলে ! হড়কে যাবে না তো ?" "না, ছবিদা, এই তারিখ পাক্কা।" "পাক্কা ! ঠিক হ্যয়", বললেন ছবিদা।

ছবির শুটিং চলার সময়ে আমি ঠিক খেয়াল রেখেছিলুম। সেই নির্দিষ্ট দিনটি আসবার দিন তিন-চার আগে আমার প্রোডাকসান বিভাগের লোককে পাঠালুম তাঁকে নিয়মমত কল-কার্ড দেবার জন্যে। লোকটি ফিরে এসে বলল, "ছবিদাকে কলকার্ড দিতে গেলুম ; তিনি বললেন, আমি তো কলকার্ড নিতে পারব না ; ঐ দিন আমার অন্য ছবিতে বুকিং আছে। আমি বললুম, সে কি কথা ! তবে যে পশুপতিবাবু বললেন—, ব্যস, আর বলতে হল না। তিনি বললেন, আমি তো পশুপতির ছবিতেই সেদিন শুটিং করতে যাচ্ছি। তুমি পশুপতির কাছ থেকে এসেছ ? তাই বল। আরে ওর আবার কল-কার্ড কি ? পশুপতির মুখের কথাই যথেষ্ট ! কখন যেতে হবে ? যখন বললুম তিনি আপনাকে বেলা ১১টার সময়ে সেটে চান, বললেন, ঠিক আছে ; ও আমাকে ঠিক বেলা ১১টাতেই সেটে পাবে with proper make-up।"

তাই পেলুম। ভূমিকা হচ্ছে গ্রাম্য জমিদারের। দুই বিবদমান ভাইয়ের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভাগ ক'রে দিচ্ছেন। পরিপাটিভাবে অভিনয় ক'রে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে যাচ্ছেন, আমার পরামর্শমত প্রোডাকসন ম্যানেজার তাঁর সামনে এক হাজার টাকা সম্মান-দক্ষিণা স্বরূপ ধরতে তিনি বললেন, "আরে না, না, কোনও টাকা দিতে হবে না, পশুপতিকে ভালোবাসি, টাকা-পয়সা লাগবে না।" আমি গিয়ে অনেক জোর-জুলুম করায় শেষ পর্যন্ত তিনি টাকাটা নিতে বাধ্য হলেন।

এই 'মামলার ফল' ছবিতেই দু'জন শিল্পী প্রথম ছবির জগতে পদার্পণ করেন। প্রথমের চিত্রাবতরণ যেমনই আকস্মিক, তেমনই চমকপ্রদ। ছবিটিতে একটি দৃশ্য আছে, যেখানে নববিবাহিতা ছোট বৌ বাড়ীতে এসে বসতে না বসতেই একজন মহিলা একটি ছেলেকে তার কোলে বসিয়ে দেয়। নতুনবৌ-বেশিনী ছোটবৌ তার দিকে চমকে তাকাতে একটি ছোট মেয়ে দু'পা এগিয়ে বলে, "ও তোমার ছেলে গো—সতীনপো।"

যে-মেয়েটিকে এই ভূমিকা করবার জন্যে প্রোডাকসন ডিপার্টমেণ্ট এনে হাজির করেছিল, সে একেবারে আনকোরা খাজা—কিছুতেই তাকে দিয়ে সঠিকভাবে ভূমিকাটি রপ্ত করাতে পারছি না, মহলা দেওয়াতে দেওয়াতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। প্রায় রণে ভঙ্গ দেবার মত আমার অবস্থা। উদ্যমে ক্ষান্ত দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি অল্প-বয়সী মেয়ে তার কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে ফ্লোরের গেটের কাছেই রাখা একটি বেঞ্চিতে ব'সে শ্যুটিং দেখছে।

আমি আমার প্রধান সহকারী প্রতুলবাবুকে (প্রতুলচন্দ্র ঘোষ ; 'পরিণীতা' থেকে শুরু করে আমার সবকটি ছবিতেই ইনিই ছিলেন আমার প্রধান সহকারী। এমন সৎ, ঠাণ্ডা-মাথা, ভদ্র যুবক আমার এই দীর্ঘ জীবনে কচিৎই দেখেছি। সত্তরের দশকের গোড়াতেই তিনি গলায় ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।) বললুম, "যান তো ঐ মেয়েটিকে নামানো যায় কিনা দেখুন তো।" প্রতুলদা প্রায় ধমকের সুরে আমাকে বললেন, "আপনার যত অনার্ছিস্ট কাণ্ড। একটা মেয়ে এসেছে শ্যুটিং দেখতে, তাকে গিয়ে বলব ছবিতে নামবে কিনা!"

তবু আমি জোর ক'রে বললুম, "একবার গিয়ে ব'লে দেখুনই না।" তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও গেলেন এবং একটু বাদেই ফিরে এসে বললেন, "আশ্চর্য কাণ্ড, মেয়েটি নামবে। ওর অভিভাবকের আপত্তি নেই।" বললুম, "যান শিগ্‌গির, একটু পাউডার লাগিয়ে একখানা শাড়ী পরিয়ে নিয়ে আসুন।"

মেয়েটি এল। পারবে কিনা জিজ্ঞেস করতে খুব সপ্রতিভভাবে বললে, "খুব পারব। যা বলতে হবে, তাতো শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, মেয়েটা যেন কি?" একটি মাত্র মহলা এবং তার পরেই শট্‌টা নিয়ে নিলুম —কোনও রকম গোলমাল হ'ল না।

এর পরে বহুকাল কেটে গেছে। নতুন নাম-করা আর্টিস্ট হয়েছেন সন্ধ্যা রায়। একদিন তিনি আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, "আপনার ছবিতেই আমার প্রথম হাতেখড়ি।" ব'লে পূর্বের ঘটনাটি ব্যক্ত ক'রে বললেন, "আমিই সেই মেয়ে।"

উনি না বললে আমি জানতেও পারতুম না, সন্ধ্যা রায় আমার ছবিতেই প্রথম চিত্রাবতরণ করেছেন। এবং আরতি মুখোপাধ্যায় আমাকে না জানালে, আমি ভাবতেও পারতুম না, যে-ফ্রকপরা মেয়েটি 'মামলার ফল' ছবিতে আগমনী

গানে নেপথ্য কণ্ঠ দিয়েছিল, সেই হচ্ছে আজকের নামকরা নেপথ্যকণ্ঠ শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়। ছবিটি ১৯৫৬ সালের ১৩ই জুলাই মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তিলাভ করে।

বেশ কয়েক বছর পেছিয়ে যেতে হচ্ছে। ১৯৫১ সালে মাদ্রাজের চলচ্চিত্র কুশলী সঙ্ঘ (Cine Technicians of South India) একটি সারা ভারত চলচ্চিত্রকুশলী সম্মেলন আহ্বান করেন মাদ্রাজের 'বাহিনী স্টুডিও'র একটি ফ্লোরে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাঁরা বিশেষ অভ্যাগতের সম্মান দিয়ে নিয়ে যান দেবকীকুমার বসু এবং আমাকে। সম্মেলনের মূল সভানেত্রী হয়েছিলেন শিল্পী প্রতিমা দাশগুপ্তা এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন মাদ্রাজের (তামিলনাড়ুর) মুখ্যমন্ত্রী।

প্রকাশ্য সম্মেলনে দেবকীকুমার বসুর প্রবন্ধ পাঠের পরে আমি আমার প্রবন্ধটি পড়ি; তাতে ছিল প্রধানত কলাকুশলীদের সুখদুঃখের কথা। তাই উপস্থিত সকলেই বক্তব্যের তারিফ করেন। দু'দিনব্যাপী সম্মেলন সমাপনান্তে দ্বিতীয় সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রকুশলী সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে, এই ঘোষণা ক'রে মাদ্রাজ থেকে বিদায় নিই।

মাদ্রাজের সাধারণ সম্পাদক এন. কৃষ্ণস্বামী আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং পর বৎসরেই কলকাতার ইন্দ্রলোক স্টুডিওর বিস্তৃত ফ্লোরে ঐ দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন মাদ্রাজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্র-পরিচালক রামনাথ; বিশিষ্ট অতিথিরূপে ভাষণ দিয়েছিলেন ডাঃ মেঘনাদ সাহা।

১৯৫৪ সালে তৃতীয় সর্বভারতীয় অধিবেশনটি বসে বোম্বাই শহরে। 'ষোড়শী' ছবির শ্যুটিং কয়েক দিনের জন্যে স্থগিত রেখে আমাকে সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে যেতে হয়েছিল। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল শ্রী বাজপেয়ী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন এস. কে. পাতিল। এই অধিবেশনেও আমার প্রবন্ধ তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে অভিনন্দিত হয়। যাবার সময়ে আমরা বাঙলার দল বোম্বাই মেলের তৃতীয় শ্রেণী রিজার্ভ ক'রে গিয়েছিলুম।

বোম্বাই ভি. টি-তে গাড়ী পৌঁছুতেই আমাকে মালা দিয়ে সাদর সম্ভাষণ জানাল রাজকমল কলামন্দিরের প্রধান শব্দযন্ত্রী এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বি. এম. টাটা। ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার বিস্তৃত ময়দানে বিদায় ভোজে অন্ততঃ এক হাজার লোকের উপস্থিতিতে আমি যে বক্তৃতা দিই, সেই বক্তব্য শ্রোতৃবৃন্দ বারংবার অভিনন্দিত করেন।

বোম্বাইয়ে যাবার সময়ে আমি আমার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম 'নিষ্কৃতি'র একটি প্রিণ্ট। ঐ প্রিণ্ট দেখে মিঃ এ. আর. কারদার ঐ কাহিনীর একটি হিন্দী সংস্করণ করবার জন্যে আমাকে চুক্তিবদ্ধ করেন। অশোককুমারও তাঁর সদ্য উপনয়ন হওয়া ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ছবিটি দেখে খুশীতে ডগমগ হয়ে

ওঠেন এবং বলেন, "গিরিশের ভূমিকায় আমি নামব, কিন্তু আমার বিপরীতে সিদ্ধেশ্বরীব চরিত্রটি করবার জন্যে আমি মলিনা দেবীকে চাই।" কিন্তু তিনি চাইলে কি হবে, তাঁর টাকাওয়ালা অংশীদার মিঃ কাপুর কিছুতেই হিন্দী চিত্রস্বত্বের জন্যে ২০,০০০ টাকা ব্যয় করতে রাজি হলেন না।

আমি 'ষোড়শী' ছবির শ্যুটিং নির্দিষ্ট দিনে শুরু করবার জন্যে প্লেনে ক'রে কলকাতা চ'লে এলুম; পকেটে কারদারের কণ্ট্রাক্ট, যদিও তিনি এই কাগজে কণ্ট্রাক্টের জন্যে একটি পয়সাও অগ্রিম দেন নি। 'ষোড়শী'র শ্যুটিং চলছে, এরই মধ্যে একদিন বোম্বাই থেকে কারদারের অর্থসচিব, যাঁকে বাবুজী ব'লে ডাকা হ'ত, তিনি আমার কাছে এসে হাজির হলেন এবং মাথার পাগড়ীর নিচে লুকোনো বহু নোটকে পাগড়ী খুলে মেজেতে ছড়িয়ে আমার চোখকে ট্যারা করতে চাইলেন। এর পরে তিনি আমার নামে ২০,০০০ হাজার টাকার একটি 'অ্যাকাউণ্ট পেয়ী' চেক দিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

টাকাটা আসলে 'নিষ্কৃতি'র হিন্দী চিত্রস্বত্ব বিক্রয়ের দরুন শরৎচন্দ্রের ওয়ারিস অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নেবেন। কিন্তু ওঁরা এ-ব্যাপারে নিরাপদ থাকবার জন্যে আমার নামেই চেক কাটলেন। তাজ্জব ব্যাপার। চেকটি ডিস্‌অনার্ড হয়ে বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্ক থেকে ফেরৎ এল এবং এই সংবাদ জানিয়ে যখন মিঃ কারদারকে চিঠি লিখলুম, তিনি তখন মিশরের কায়রোতে। পরে তিনি ফিরে এসে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে চিঠি লিখেছিলেন এবং এও জানিয়েছিলেন, তিনি আর্থিক দুর্গতিতে পড়েছেন। অতএব হিন্দী 'নিষ্কৃতি' করবার আশা তখনকার মত ত্যাগ করতে হ'ল।

পরে একবার দলসুখ পাঞ্চোলী বোম্বাই থেকে আমাকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন, নিষ্কৃতির হিন্দী চিত্রস্বত্বের জন্যে কত পড়বে। এবং ২০,০০০ টাকা মূল্যটি জানাতে তিনি আর উচ্চবাচ্য করেন নি।

এরই মধ্যে বাঙলার চলচ্চিত্র জগতে আবির্ভূত হয়েছেন সত্যজিৎ রায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত 'পথের পাঁচালী' নিয়ে তাঁর জয়যাত্রা শুরু হয়েছে ১৯৫৫ সালের ২৬এ আগস্ট তারিখে। আজও মনে আছে বীণা, বসুশ্রী, শ্রী ও ছায়া সিনেমায় মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবির প্রথম তিন চার দিন ঐ চিত্রগৃহগুলিতে কিছুমাত্র ভীড় হয় নি, হলগুলি একেবারেই ফাঁকা গিয়েছিল। ভাগ্যক্রমে সেই বছর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় 'পথের পাঁচালী' বইটি দ্রুত-পঠনের জন্যে পাঠ্য ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিটি স্কুলে চিঠি পাঠিয়ে জানান, স্কুলের ছেলেদের জন্যে 'পথের পাঁচালী'র বিশেষ দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রতিটি আসনের জন্যে ১ টাকা মূল্য দিতে হবে। এরই ফলে প্রথমে দ্বি-প্রাহরিক প্রদর্শনীতে এবং পরে সাধারণ তিনটি প্রদর্শনীতেও প্রচুর জনসমাগম হ'তে থাকল। তাছাড়া বাঙলা পত্র-পত্রিকার চিত্র-সমালোচকেরা ছবিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

এখানে আর একটি জিনিসও জ্ঞাতব্য। প্রথমে-পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেরাই ছবিটির মুক্তির জন্যে প্রয়াস চালিয়েছিলন এবং অতিকষ্টে মিনার, বিজলী ও ছবিঘরের চেনে মাত্র তিন সপ্তাহের fixed looking-এ (পূর্ব থেকে স্থিরীকৃত বাঁধা প্রদর্শনী) ছবিটির মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনকে ছবির পরিবেশক নিয়োগ করেন এবং তাঁরা অতিকষ্টে ঐ চুক্তি নাকচ ক'রে নতুনভাবে মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' সত্যিই বাঙলার চলচ্চিত্র জগতে যুগান্তর এনেছিল। বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের যে-জীবন্ত চিত্র এই ছবিটির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে, সে-রকমটি এর পূর্বে কখনও দেখা যায় নি। একদিকে দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের সকল দুঃখ জয়-করা সর্বজয়া এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ হরিহর, অপর দিকে প্রকৃতির সন্তান অপু ও দুর্গা—দর্শকচিত্তকে সর্বক্ষণ ভরাট ক'রে রেখেছে। তার ওপর আছে গ্রাম্য প্রকৃতির নিখুঁত চিত্র, যে প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে অপু ও দুর্গা।

সত্যজিৎ রায় সবচেয়ে বড়ো কাজ করেছিলেন, ক্যামেরাকে স্টুডিও সেটের কৃত্রিমতার বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে বাস্তব প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে স্থাপন ক'রে। প্রধান ভূমিকা চারটির মধ্যে একমাত্র হরিহরের ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেওয়া ছাড়া বাকী তিনটি ভূমিকায় তিনি আনকোরা তিনজন শিল্পীকে নিয়েও তাঁর ছবিকে সব দিক দিয়ে গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

ছবিতে বৃষ্টিপাত, কাশফুলের অজস্রতা, পুকুরে শালুকফুল ও পাতার বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা—সব মিলিয়ে একটি প্রাকৃতিক স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। তাই ছবিটিকে স্বতঃই স্বাগত জানাতে আমাদের মনের দরজা খুলে গিয়েছিল। শুধু একেবারে শেষ দৃশ্যে হরিহর তার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বাড়ীটি ছেড়ে চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ওই বাড়ীতে বাইরে থেকে সাপের প্রবেশকে আমরা সহজবুদ্ধি দিয়ে অনুমোদন করতে পারি নি।

১৯৫৫ থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত সত্যজিৎ রায় বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে বিভিন্ন ঢঙে, সাদাকালো ও রঙিন বহু ছবিই করেছেন এবং প্রতিটিতেই তাঁর অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালকরূপে সর্বত্র সম্মানিত। আজ তিনি ইহলোকে নেই।

সত্যজিতের পরে এসেছেন পরিচালক মৃণাল সেন। অবশ্য দু'জনের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। মৃণাল সেন তাঁর ছবির মাধ্যমে একটি বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক বক্তব্যকে দর্শকদের সামনে ব্যক্ত করতে চান। বলা যেতে পারে, তিনি হচ্ছেন একজন dedicated বা committed film-director (উৎসর্গীকৃত চলচ্চিত্র-পরিচালক)। তাঁর 'কলিকাতা-'৭২' এ-ব্যাপারে একটি একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি কোনও এক তারিখে আমি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে

গৌর শী রচিত কাহিনী অবলম্বনে 'হ্যায় টাকা-া-া' নামে একটি লঘু-ব্যঙ্গাত্মক ছবির মহরৎ করি। কিন্তু ঐ মহরৎ পর্যন্তই! টাকা-দেনেওয়ালারা শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে ছবিটি পরিত্যক্ত হয়।

এরই কিছুকাল পরে আমার কাছে আসেন নেপালচন্দ্র রায়চৌধুরী নামে একজন ভদ্রলোক এবং তাঁর সঙ্গে আসেন মন্মথনাথ দাশ এবং অজিত মিত্র নামে এক সঙ্গে দুই সঙ্গীত-পরিচালক, তাঁরই দুই বন্ধু হিসেবে। দেখেই বুঝেছিলুম, এঁদের টাকার বিশেষ জোর নেই, কোনওক্রমে দু' কুড়ি সাতের খেলা খেলতে চান। কিন্তু তাঁরা গৌর শী রচিত 'মৃতের মর্তে্য আগমন' নামে যে কাল্পনিক চটুল কাহিনীকে ছবির জন্যে নির্বাচন করলেন, তার একটি প্রধান অঙ্গই হ'ল বিচিত্র দৃষ্টিবিভ্রমকারী সেট, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই কার্যকালে দেখা গেল, প্রতি পদেই খামতি; সবই হচ্ছে মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।

তার ওপরে সেন্সারের কাঁচি আমাদের চরম ক্ষতি করেছিল। সবশেষ দৃশ্যে পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশ মূর্তি ধ'রে তখনকার মুখ্যমন্ত্রীকে (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়) বাঙলার অবস্থা সম্পর্কে ভর্ৎসনা করছেন, এই রকম একটি ঘটনা ছিল। সেন্সার সেটিকে দিলেন একেবারে উড়িয়ে। ছবির ট্রাম্প কার্ডটি চ'লে যাওয়ায় ছবিটি যে সুনিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এ-কথা বললেও চলে। ১৯৫৯ সালে ২৭শে নভেম্বর শ্রী, প্রাচী এবং ইন্দিরা চিত্রগৃহে ছবিটি মুক্তিলাভ করে। এবং এরই সঙ্গে কাহিনী চিত্রের পরিচালক রূপে আমার জীবনের তখনকার মত সমাপ্তি ঘটে।

সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা ব'সে আছি। ১৯৩৫ সালের ২৭শে জানুয়ারী থেকে নিউ থিয়েটার্সে প্রবেশের পরেও বছর খানেক আমি সাপ্তাহিক নাচঘরের সঙ্গে প্রথম সহকারী সম্পাদক হিসেবে এবং পরে হেমেন্দ্রকুমার রায় কি কারণে জানি না নাচঘরের সংশ্রব ত্যাগ করায় সম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিলুম। কিন্তু নিউ থিয়েটার্সে ঢুকে পড়লুম মুস্কিলে। নিউ থিয়েটার্সের কোনও মুক্তি-প্রাপ্ত ছবির প্রকৃত সমালোচনা করতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হ'ল। ছবি খারাপ হ'লে খারাপ বলতে পারব না; তাহলে মনিব চটবেন। আর ভালো হ'লে ঠিকমত ভালোও বলতে বাধবে; বন্ধুরা ভাববেন, চাকরী সামলাচ্ছে। এই উভয়সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমি বছর-খানেক বাদে দু' নৌকোয় পা দিয়ে চলা থেকে অব্যাহতি নিলুম।

আমি ছেড়ে দেবার পরে পত্রিকাটির সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেছিলেন কিরণশশী গুপ্ত, যাকে লোকে কালো রবি (ঠাকুর) বলে ডাকত। তিনিও হপ্তা সাত আট বাদে ইস্তফা দেওয়ায় সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুশীল রায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় হপ্তা দশ বারো চলবার পরে নাচ-ঘরের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। একটি সত্যিই ভালো মঞ্চ ও চলচ্চিত্র সম্পর্কিত সাপ্তাহিকের এইভাবেই অপমৃত্যু ঘটে।

এই 'নাচঘর'-এই আমার প্রথম লেখা বেরোয়। এবং প্রবন্ধ লেখার জাদুকর, রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসের সার্থক লেখক, শিশু-সাহিত্যিক ও কবি হেমেন্দ্রকুমার রায়ই যে আমাকে সে-সুযোগ ক'রে দেন, এ কথা আমি আগেই বলেছি। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে হেমেন্দ্রকুমারের জন্ম। পিতা রাধিকাপ্রসন্ন রায় তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম রেখেছিলেন প্রসাদ। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যিক ভাবাপন্ন ছেলের বাপের দেওয়া নামটি পছন্দ হয়নি। তাই বছর আঠারোতে পেঁছেই তিনি তাঁর নিজের নামকরণ করেন হেমেন্দ্রকুমার। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই তাঁর লেখক জীবন শুরু হয়। 'বসুধা' নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'আমার কাহিনী' প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে।

বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'ভারতী'কে ঘিরে একদা যে-সাহিত্যিক গোষ্ঠী জন্মগ্রহণ করেছিল, তিনি ছিলেন তার অন্যতম একজন। পরে রায়বাহাদুর এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের দোকানে সাহিত্যিকদের বৈকালিক আড্ডায় তিনি ছিলেন একজন নিয়মিত সদস্য।

আমাকে বৈদ্যনাথ (সমধিক প্রসিদ্ধ নাম—বাণীকুমার) তাঁর কাছে নিয়ে যায় ১৯২৭ সালের আগস্টের গোড়ার দিকে। ক্রমে হেমেন্দ্রকুমার আমাকে তাঁর কাছে টেনে নেন ঠিক আপন ভাইয়ের মত ক'রে। কি ক'রে লেখাকে কয়েকটি বিশেষ শব্দের প্রয়োগে অতি সাধারণ থেকে অত্যন্ত মনোলোভা ক'রে তুলতে হয়, লেখার এই বিশেষ আর্টটি তিনি আমাকে নিষ্ঠার সঙ্গে শিখিয়েছেন। জানি না, এ ব্যাপারে আমি কতখানি কৃতকার্য হয়েছি।

১৯৩০ দশকের মাঝামাঝি তাঁর পাথুরিয়াঘাটা বাই লেনের বাড়ীটি ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট দ্বারা অধিকৃত হওয়ায় তিনি আপার চিৎপুর রোড (রবীন্দ্র সরণী) ও বাগবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থলের পশ্চিমে একটি সুরম্য তিনতলা বাড়ী ক্রয় ক'রে চলে আসেন। এই বাড়ীর ত্রিতলের বারান্দার কোণে তাঁর ছিল লেখবার স্থান। এইখানে ব'সে প্রবহমান গঙ্গার শোভা ছিল পরম উপভোগ্য।

এই বাড়ীতে আসবার আগে পর্যন্ত আমরা প্রত্যহ সন্ধ্যায় কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট (বর্তমানে বিধান সরণি) ও বিবেকানন্দ রোডের উত্তর-পূর্ব মোড়ে অক্সফোর্ড মিশনের লাগোয়া ত্রিতল বাড়ীটির দ্বিতলের কোণের ঘরটিতে গিয়ে জমায়েত হতুম একটি ছোট্ট আড্ডায়। সেখানে নিয়মিতভাবে আসতেন 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রফুল্ল কুমার সরকার, বাংলা 'হিন্দু' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী সম্পাদক জ্ঞানকুমার চক্রবর্তী এবং আরও কেউ কেউ।

বাড়ীটি ছিল গজেন্দ্রকুমার ঘোষের। তিনি রেলি ব্রাদার্সের কোনও একটি বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর একখানি পা ছিল কিছুটা দুর্বল। গজেন-বৌদি যৌবনের প্রান্তসীমায় পেঁছে দেখতে ঠিক ছিলেন অন্নপূর্ণা বা জগদ্ধাত্রীর মতো। তাঁর হাতের সাজা ছোট ছোট খিলি-পান এবং খবরের কাগজে মোড়া মসলার দোনা একটি পাত্রে ক'রে সর্বদাই আমাদের সুমুখে সাজানো থাকত ; যার যা অভিরুচি, আমরা তাই তুলে নিতুম। এবং

পরিবেশিত হ'ত চা। ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে ওখানে গজল্লা করবার পরে আমরা ওখান থেকে বিদায় নিতুম যে-যার বাড়ীতে ফেরার উদ্দেশ্যে।

হেমেনদা এবং আমি ওখান থেকে বেরিয়ে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ধ'রে উত্তরমুখে হেঁটে বিডন স্ট্রীট ধ'রে চিৎপুর রোডের সংযোগস্থল পর্যন্ত একসঙ্গে চ'লে আসতুম এবং কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে নানা কথা কইবার পরে দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিতুম। এই চলেছিল অন্তত বছর ছয় সাত ধ'রে, যতদিন না হেমেনদা তাঁর বাগবাজারের নতুন বাড়ীতে গিয়ে অধিষ্ঠান হয়েছিলেন।

হেমেনদা বহু বই লিখেছেন, বহু গান রচনা করেছেন, তাঁর বহু গান এইচ. এম. ভি. রেকর্ডে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেববর্মণ প্রভৃতি গায়ক গেয়ে নাম কিনেছেন। তাঁর চলচ্চিত্রের সঙ্গেও যোগ ছিল। কালী ফিল্মস্ তাঁর 'মণিকাঞ্চন' বই অবলম্বনে সে যুগের হিট-ছবি 'তরুণী' তৈরী করেছেন। তাঁর 'যখের ধন'ও চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়ে জনসংবর্ধনা এবং আর্থিক সাফল্য লাভ করে। কালী ফিল্মসের জন্যে তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা ক'রে দিয়েছিলেন। এমন একজন শিল্পীপ্রাণ মানুষের আদরের ভাই হতে পেরে আমি ধন্য। ১৯৬৩ সালের ১৮ এপ্রিল হেমেন্দ্রকুমারের মৃত্যু হয়।

প্রথমে অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার ও পরে নাচঘরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ে আমি আর একটি লোকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি। তিনি হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম। মনে পড়ে, তিনি যখন মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে থাকতেন, তখন প্রায় প্রতিদিন সকালেই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হতুম। এই সময়ে তাঁর সাত-আট বছরের আদরের ছেলে বুলবুল মারা গেছে। তার জন্যে তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না। প্রায়ই বলতেন, "জানিস পশুপতি, সে রোজ আমার সামনে আসে, শ্রীকৃষ্ণের বেশে বাঁশী বাজায়,—আহা, কি সুন্দর যে সেই বাঁশীর আওয়াজ!"

বড্ড দরদী মন ছিল কাজীদার। তাঁকে লোকসভায় আবৃত্তি করতে এবং গান গাইতেও শুনেছি বহু বার। তাঁর মুখের দুর্গমগিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে" গান এবং "আমি বীর!...... . বিশ্ব বিধাত্রীর!" (বন্দীবীর) আবৃত্তি শ্রোতাদের মনে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করত, তা কখনই ভোলবার নয়। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বাগবাজারের বাড়ীতে তাঁর আগমন ঘটত প্রায়ই। মদ্যপান করতে করতে তিনি হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গানের পরে গান গেয়ে চলতেন: "মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর, নমো নম, নমো নম, নমো নম", "করুণ কেন অরুণ আঁখি, দাও গো সাকী, দাও সরাব", "কেন কাঁদে পরাণ, কি বেদনায়, কারে কহি" প্রভৃতি মনবিভোর-করা গান। তাঁর গলা যে খুব ভালো ছিল, তা নয়। কিন্তু দরদ ছিল তাঁর কণ্ঠে; তাতেই তিনি মাতিয়ে তুলতেন।

পূর্ণিমা রাতে কাজীদা ও হেমেনদার সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে নৌভ্রমণের কথা বিস্মৃত হবার নয়। কাশীর কালী গুহর কাছে তিনি যোগাভ্যাস শিখে-

ছিলেন। এবং এরই ফলে তিনি প্রাণায়াম ক'রে শূন্যে অবস্থান করতে পারতেন চার-পাঁচ মিনিট পর্যন্ত। গুহমশাই ওঁকে দু' নৌকোয় পা দিয়ে চলতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, "যোগাসন করবে তো মদ্যাদি পরিত্যাগ কর। নইলে হঠাৎ একদিন তুমি বোধশূন্য জড়ে পরিণত হবে।" কাজীদা তাঁর সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেন নি। ফলে, আমাদের আদরের কাজীদা' শেষ পর্যন্ত ঐ জড়েই পরিণত হয়েছিলেন জীবিত থেকেও।

এসে গেল ১৯৬১ সাল—রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে সমগ্র দেশ মেতে উঠল। কত সভা-সমিতি, কত নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। এরই মধ্যে রবীন্দ্র জন্মদিনে প্রকাশিত হ'ল সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকা। তুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদিত এই সাপ্তাহিকটি যৌথ মালিকানায় প্রকাশিত হয়; এবং অন্যতম অংশীদার ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ছিলেন এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্সের মালিক সুবীরচন্দ্র সরকার।

পত্রিকাটি প্রকাশের বেশ কিছুদিন আগে সুধীরবাবু আমাকে টেলিফোন ক'রে বলেন, "পশুপতিবাবু, আপনি তো এখন ব'সে আছেন। আমরা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করছি; তার নাট্যবিভাগের ভারটা আপনি নিন না।"

জবাবে আমি বলি, "আপনি যখন আদেশ করছেন, তখন—;" পরে আমি কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে স্থির করলুম, আমার বিভাগের নাম হবে 'প্রেক্ষাগৃহ' এবং আমি সমালোচক হিসেবে ছদ্মনাম নেব—নান্দীকর! আমার স্তম্ভে প্রথমে থাকবে 'আজকের কথা'। পরে সমালোচনা ও খবরাখবর।

১৯৬১-র ২১এ বৈশাখ তারিখে 'অমৃত' সাপ্তাহিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শীঘ্রই সাহিত্যিক মহলের সমাদর লাভ করে। আমার প্রেক্ষাগৃহ বিভাগও এই সমাদর থেকে বঞ্চিত হয় নি; বিশেষ করে 'আমার কথা'টি বহু সমালোচক সাহিত্যিকদের দ্বারা সাগ্রহে পঠিত হ'ত। কিন্তু কম ক'রে বছর ছয় সাত এই 'আমার কথা' সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে প্রকাশিত হবার পরে হঠাৎ 'অমৃত'-সম্পাদক মণীন্দ্র রায় আমাকে আদেশ করলেন, ঐ স্তম্ভটি বন্ধ করতে বললেন, কাগজের একটি সম্পাদকীয় স্তম্ভ বেরোয়, ওর সঙ্গে আর একটি বেরোবার আবশ্যকতা নেই।

ভদ্রলোক দিলেন আমাকে খোঁড়া ক'রে। মঞ্চ, চলচ্চিত্র, নৃত্যাদি সম্পর্কে একটি অলোচনা তাঁর ভালো লাগল না। 'আজকের কথা' ছাড়াই প্রেক্ষাগৃহ বিভাগ চলতে লাগল। আমার স্তম্ভে এসে যোগ দিলেন আশিসতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁরও পরে এলেন নির্মল ধর।

এইভাবে গোড়া থেকে প্রায় সাড়ে এগারো বচ্ছর চলবার পরে এক সন্ধ্যায় সামান্য কারণে 'অমৃত' পত্রিকার এক কর্মচারীর সঙ্গে মতান্তর হওয়ায়

আমি তখনই ঐ পত্রিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ ক'রে চ'লে আসি। আর ও-মুখো হইনি।

বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে যেতে হচ্ছে। ১৯৬৬ সাল নাগাদ মধু বসু আমাকে স্মরণ করলেন, প্রথমে টেলিফোন যোগে এবং পরে তাঁর সহকারী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (দীপালি-সম্পাদক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র) পাঠিয়ে। তাঁর কারনানী এস্টেটের (ম্যানসন) ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখা করতে তিনি বললেন, "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী অবলম্বনে একটি ছবি এক ভদ্রলোক করাতে চান, তুমি সিনারি লিখে দাও।" সম্মতি জানাতে তিনি একটি দিন ও সময় নির্দিষ্ট ক'রে দিলেন।

আমি যথাদিনে যথাসময়ে পৌঁছে হবু-প্রযোজকের সামনে সই-সাবুদ ক'রে অগ্রিম অর্থ নিলুম এবং তারপরে পুরো এক মাস ধ'রে অজস্র পরিশ্রম ক'রে চিত্রনাট্যটি লেখা শেষ করলুম। মধুদা ও বঙ্কিমের সামনে চিত্রনাট্যটিকে প'ড়ে শোনাতে ওঁরা খুবই খুশী। চিত্রনাট্যরচনার সমস্ত অর্থ বুঝে পেলুম এবং ঐ সঙ্গে মধুদার সহকারী হিসাবে কাজ করবার নতুন চুক্তিপত্রে সই ক'রে সেই বাবদেও অগ্রিম অর্থ পেলুম। কিন্তু কি জানি কেন ঐ পর্যন্তই। 'বঙ্কিমচন্দ্র' ফিল্ম সম্পর্কে আর কিছু উচ্চবাচ্য শোনা গেল না।

'বঙ্কিমচন্দ্র'-চিত্রনাট্যটি শেষ করবার পরে আমি ফিল্ম সার্ভিসেস-এর জন্যে একটি তথ্যচিত্র করবার কাজ যোগাড় করি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের কাছ থেকে। 'কংসাবতী প্রকল্প'-এর ওপর 'করুণাধারায় এস', এই নামে চিত্রনাট্যটি বিভাগীয় প্রধানকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে আমি ফিল্ম সার্ভিসেসের কলাকুশলী দলকে নিয়ে বাঁকুড়া যাত্রা করি এবং সেখান থেকে ঐ প্রকল্পের কাজ যেখানে হচ্ছে, সেখানে গিয়ে প্রয়োজন মত ছবি তুলি এক বারে নয়, অন্তত দু' দফায়। ছবির সম্পাদনা করিয়ে তার সঙ্গে ধারাভাষ্য, প্রয়োজনীয় সঙ্গীতাদি যোগ করে ছবিটি প্রস্তুত করতে মাস তিনেক অতিবাহিত হয়।

এরই মধ্যে এসে গেল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শত বার্ষিকী উৎসব। তুষারকান্তি ঘোষের সঙ্গে মধু বসুর বহুদিনের পরিচয়। তিনি মধুদাকে দিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষের জীবন অবলম্বনে একটি দু'রীলের অর্থাৎ ২,০০০ হাজার ফুট দীর্ঘ তথ্যচিত্র তৈরী করাতে চাইলেন। মধুদা আবার আমাকে স্মরণ করলেন চিত্রনাট্য রচনা ও সহকারী রূপে কাজ করবার জন্যে।

পত্রিকাটি প্রথমে প্রকাশিত হয় বাঙলায় এবং পরে ইংরাজীতে। সযত্নে রক্ষিত পত্রিকাটির পুরোনো ফাইল ঘেঁটে সারা ভারত ও বঙ্গভূমির স্মরণীয় ঘটনাগুলির সময়ে পত্রিকার তাতে বিশিষ্ট ভূমিকা এবং অংশগ্রহণের তথ্যাদি সম্যরূপে সংগ্রহ ক'রে, অঙ্কিত চিত্র ও বিশেষ লিপির সাহায্যে সেগুলিকে

দর্শকসমক্ষে তুলে ধরবার মতো ক'রে সাজিয়ে সু-সংবন্ধ চিত্রনাট্যের সাহায্যে তথ্যচিত্রটিকে কয়েকদিনের মধ্যেই তোলা সম্পূর্ণ করলুম।

মধুদা আজ বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করতেন। এই তথ্য-চিত্রটির পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর নিজের ভূমিকা ছিল সামান্যই; অধিকাংশ শ্যুটিংয়ের দিনে তিনি উপস্থিতও থাকতেন না। ছবিটির বাঙলা ধারাভাষ্য আমি নিজেই বলি এবং ইংরাজীটি বলাই ওয়াল্টার টমসন (বর্তমানে হিন্দুস্থান টমসন)-এর সুভাষ ঘোষালকে দিয়ে। ছবিটি শুধু তুষারকান্তি ঘোষকেই খুশী করেনি, দর্শকসাধারণও ছবিটি দেখে একটি সার্থক তথ্যচিত্র হিসেবে একে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।

তুষারবাবু ইংরিজী ভাষ্য সংবলিত ছবিটিকে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বিশেষ প্রভাবের জোরে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথকে ছবিখানি দেখিয়েওছিলেন। তিনিও ছবিটির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। এই তথ্য আমাকে জানিয়ে তুষারকান্তি ঘোষ বলেছিলেন, "রাণী যখন ছবিটির পরিচালক কে জিজ্ঞেস করছিলেন, তখন আমি তোমার নাম বলেছিলুম, কারণ আমি জানি, ছবির আসল পরিচালক কে।" শুনে আমি একটু গর্বতই বোধ করেছিলুম।

এর পরে মধুদার কাছ থেকে আবার আমার ডাক আসে, বোধ করি, ১৯৬৫সালে। এবারে কারণটা ভিন্ন—ছবি নয়, লেখা। তাঁর উক্তি এবং ইংরিজী বাঙলায় মিশিয়ে একটি লেখা থেকে তাঁর সহকারী বঙ্কিম তাঁর একটি সুবৃহৎ জীবনী খাড়া করেছে, সেইটি প'ড়ে দেখতে হবে কেমন হয়েছে। তৎক্ষণাৎ রাজি হলুম এবং পড়েও দেখলুম। লেখার ভিতর দিয়ে সরল মানুষটি ফুটে বেরিয়েছে—কোথাও কোনও কিছু গোপন করবার প্রচেষ্টা নেই। উনি বললেন, "তুমি তো অমৃত সাপ্তাহিকে রয়েছ; এটিকে ওতে ছাপবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

আমি সানন্দে সম্মত হয়ে সুধীরচন্দ্র সরকারের কাছে কথাটা পাড়লুম। তিনি তাঁরই ল্যান্সডাউন রোডস্থ বাসভবনে এক সন্ধ্যায় লেখাটিকে শোনবার ব্যবস্থা করলেন। সুধীরবাবু, তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুপ্রিয়বাবু (ডাকনাম বাচ্ছুবাবু), মণীন্দ্র রায়, মধু বসু, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় এবং আমি একত্রে সমবেত হলুম এবং জীবনীটি পাঠ করলুম আমিই। শুনে সকলেই খুশী।

সুধীরবাবু প্রস্তাব করলেন—লেখাটিকে প্রয়োজনমত পরিবর্তন এবং কিছুটা কাটছাঁট করবার ভার নিতে হবে আমাকেই, তবেই রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে 'অমৃত' সাপ্তাহিকে। খুব বেশী ক'রে নজর রাখতে হবে, যাতে ৮।১০ মাসের মধ্যেই সমস্ত লেখাটি ছাপা হয়ে যেতে পারে। আমি এ ভার বইতে স্বীকৃত হলুম এবং ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে 'অমৃত' পত্রিকায় জীবনীটি প্রকাশিত হ'তে শুরু করল। সাহিত্যিক, অসাহিত্যিক, সকল পাঠকই লেখাটি প'ড়ে চমৎকৃত হলেন। এরপরে যখন পাণ্ডুলিপিটি

পুস্তকাকারে প্রকাশের উদ্যোগ হয়, তখন আমি আবার নতুন ক'রে লেখাটিকে পরিমার্জনা করতে থাকি মধুদারই আদেশে।

প্রায় অর্ধেকের ওপর অংশ ঐভাবে পুনর্লিখিত করেছি, এমন সময়ে শুরু হয়ে গেল কলকাতায় একই সঙ্গে বাস ও ট্রাম ধর্মঘট। কাজেই প্রচুর ইচ্ছা সত্ত্বেও হাতের কাজটি আমি শেষ করতে পারিনি। বাকী কাজটি করেছিলেন সাহিত্যিক বিমল মিত্র। তবুও মধুদা আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরবশ হয়ে তাঁর "আমার জীবন"-এর 'আমার কথা'য় লিখেছেন: "অনেকটা অংশ সংশোধন ও পরিমার্জন করে দিয়েছিল আমার বিশেষ প্রীতিভাজন বন্ধু সাংবাদিক, সমালোচক ও চিত্রপরিচালক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়।" বন্ধু নয় মধুদা, ছোট ভাই।

মধুদার সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের—সেই ১৯২৬।২৭ সাল থেকে, যখন তিনি তাঁর সংগঠন C. A. P.-কে (ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্সকে) প্রথম খাড়া করেছেন। উনি তখন বিলাত থেকে ফিরে এসে উঠেছেন রায় স্ট্রীটে ওঁর ভগ্নীর বাড়ীতে। দুই ভাগ্নি, সুজাতা ও সুনীতাকে নিয়ে 'আলিবাবা' মঞ্চাভিনয়ের ব্যবস্থা করছেন; তার সঙ্গে আছেন পালোয়ান হালদার, ধীরেন ঘোষ, টুকলু মজুমদার প্রভৃতি। ব্যালেতে আছে সাধনা সেন, নীলিমা সেন প্রমুখ। ঐ রায় স্ট্রীটের বাড়ীতেই উনি বন্ধু ও প্রচারবিদ সুধীরেন্দ্র সান্যালের মাধ্যমে কয়েকজন নাট্যসমালোচককে ডেকেছিলেন ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'আলিবাবা' গীতি-নাটকটিকে কেমন মার্জিত ক'রে তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে মঞ্চস্থ করতে চলেছেন, সেই কথা জানাতে।

বলতে পারি, ঐ দিন থেকেই আমরা দু'জনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। ফার্স্ট এম্পায়ারে এই 'আলিবাবা'র অভিনয় দেখতে যাঁরাই উপস্থিত ছিলেন ১৯২৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী, তাঁরাই এর পরিচ্ছন্ন, অথচ জমকালো রূপ দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত গান "বাজে কাজে মিনসেকে আর যেতে দেব না'র বদলে "বাজে কাজে কর্তাকে আর" কানে একটু খটাং ক'রে লাগলেও শুচিতার গুণে একে সবাই মেনে নিয়েছিলেন।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু (নেপা বোস) ও কুসুমকুমারীর আবদালা-মর্জিনা বেশে নাচ ছিল খালি বোল ও তালের কসরত—"এক, দুই, তিন, এক, দুই, তিন"। কিন্তু এই অভিনয়ে রেবা রায় পরিকল্পিত নৃত্যভঙ্গী দর্শকদের বুঝিয়ে দিল, নাচ শুধু পায়েরই কসরত নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত দেহের হিল্লোলও বটে।

এই সময় থেকেই বলতে পারি, মধুদা ও সাধনা সেনের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল এবং এ-কথা আমার কাছে গোপন ছিল না। মনে আছে, একদিন মধুদা তাঁর মোটরে ক'রে আমাকে আমার রামচন্দ্র মৈত্র লেনের বাড়ীতে পৌঁছুতে যাচ্ছেন, তিনি গাড়ীটিকে সার্কুলার রোডের লিলি কটেজের সামনে থামিয়ে সাধনাকে গাড়ীতে তুলে নিলেন। সাধনার দাদা

সুনীত ছিল হিন্দু স্কুলে আমার সহপাঠী। সে পরবর্তী জীবনে ক্যালকাটা কর্পোরেশনের লাইসেন্স অফিসার হয়েছিল।

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে মধুদা যখন এম্পায়ার থিয়েটারে কবিগুরুর 'দালিয়া' নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেন, তখনও ওঁদের বিবাহ হয়নি। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে মধুদা "ফ্যালকান অব খাইবার" ছবিটি শেষ ক'রে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে ফেরবার পরে ওঁদের বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। এত দিনের মধ্যে আমি জেনেছি যে, মধুদা হচ্ছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিক স্যার রমেশচন্দ্র দত্তের দৌহিত্র এবং জামসেদপুরে টাটা আয়রণ ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা, ভূতাত্ত্বিক প্রমথনাথ বসুর কনিষ্ঠ সন্তান।

মধুদাদের পরিবারটি ছিল যথেষ্ট প্রগতিশীল ; বলা যেতে পারে বাঙালী আধুনিক সমাজের যাঁরা স্রষ্টা, তাঁদের পরিবার ছিল তাদেরই অন্যতম। সে যুগে এমন কোনও আধুনিক কায়স্থ পরিবার ছিল না, যাদের সঙ্গে কোনও না কোনও সূত্রে এঁদের যোগ ছিল না। অথচ বহু লোকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, মধু বসুরা ব্রাহ্ম। না, একেবারেই না। তাঁরা ছিলেন পুরোদস্তুর হিন্দু ; অবশ্য হিন্দুধর্মের অনেকগুলি কুসংস্কারকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে। তাঁর কারনানী এস্টেটের ফ্ল্যাটেও দেখেছি, মধুদা কালীঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ধূপ জেলে রাখছেন। কাশীতে অবস্থানকারী কালী গুহ নামে একজন সাত্ত্বিক ব্যক্তিকে তিনি গুরু ব'লে মানতেন। সাধনা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পৌত্রী হ'লে কি হয়, সেও শেষজীবনে কালীভক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সাধনার কথা এখানে নয়।

১৯৬০-৬১ সাল থেকে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগে যাতায়াত শুরু করি সরকার যে ছোট ছোট তথ্যও সংবাদ-চিত্র তৈয়ার করান, তাই সরবরাহ করবার ফরমাস (order) পাবার জন্যে। তখন ছিলেন চিত্র-পরিচালক বিজন সেন চলচ্চিত্র-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তাঁর সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয়ও ছিল। তিনি প্রথমে আমাকে 'ওজন-দাঁড়িপাল্লা-বাটখারা' সম্বন্ধে একটি দু'রীল দীর্ঘ ছবির জন্যে চিত্রনাট্য লিখতে দেন। এর পরে দেন "দণ্ডকারণ্য প্রকল্প" সম্বন্ধে একটি চার রীল দীর্ঘ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করতে।

দণ্ডকারণ্য অর্থারিটির তখনকার ডাইরেক্টার (সম্ভবত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. সি. এস.) আমার রচিত চিত্রনাট্যটির ভূয়সী প্রশংসা ক'রে বলেন, "দণ্ডকারণ্যে না গিয়ে একজন লোকের পক্ষে এই চিত্রনাট্য রচনা করা কি ক'রে সম্ভব হ'ল, তা আমি ভাবতেই পারি না।"

এরই কিছু পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী রঞ্জিতকুমার ঘোষ তথ্যচিত্রের প্রযোজক-পরিচালকদের একদিন তাঁর কক্ষে সমবেত করলেন এবং জানালেন, তিনি কৃষিভাগের জন্যে কতকগুলি তথ্যচিত্র তৈরী করাতে চান। এর কতকগুলি হবে এক রীলের এবং কতকগুলি

হবে দু' রীলের। আমাকে তিনি দিলেন তিনখানি ছবি তৈরী করবার ভার। এক : ওয়্যার হাউজিং—দ্রব্যাদিকে গুদামজাত করা—১রীলের, দুই : সুপারির চাষ—২ রীলের এবং তিন : উন্নত বীজধান—২ রীলের।

দ্বিতীয় ছবিটির জন্যে আমাকে জলপাইগুড়ি হয়ে তরাইয়ের চা-বাগিচা অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। জলপাইগুড়ির একটি হোটেলে সদলবলে আশ্রয় নিয়েছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে এসে হাজির হলেন সৌরীন্দ্রকিরণ বসু (জলপাইগুড়ির রাণী প্রতিভা বসু তাঁর স্ত্রী ; ওঁদের মেয়ে ডলি আমার মেয়ে রাজ্যশ্রীর বিশেষ বন্ধু এবং সেই কারণে প্রায় আমাদের বাড়ীর মেয়ে বললেই হয়) এসেই হম্বিতম্বি "আমি কি ম'রে গেছি ? চলুন আমাদের বাড়ী।"

আমি অতি কষ্টে তাঁকে বোঝাই, দলে নানা রকম ছেলে আছে ; তারা একটু অবাধ স্বাধীনতা চায় ইত্যাদি। তখন তিনি আশ্বস্ত হয়ে চ'লে যান এবং আধ-ঘণ্টার মধ্যে চাকরের মাথায় একটি ঝুড়ি সমেত ফিরে আসেন। ঝুড়িতে ছিল নানা রকমের ফল ও মিষ্টি বোঝাই।

তরাইয়ের সুপারি বাগানে শ্যুটিং করছি, এমন সময়ে সেখানে জীপগাড়ী হাঁকিয়ে এসে হাজির হ'ল আমার একমাত্র পুত্র, প্রসেনজিৎ (ডাকনাম মিকি)। সে তখন ডানকান ব্রাদার্সের অধীনে নিকটবর্তী চা-বাগিচা, শামসিং টী এস্টেট-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। তার আবদার, এত কাছে যখন এসেছি, তার চা-বাগানটা ঘুরে যেতে হবে। শ্যুটিং শেষ ক'রে বৈকালের দিকে যাব, এই কথা দিতে সে সময়মত জীপটিকে পাঠাবে বলে তখনকার মত বিদায় নিল।

পরের দিন আমি সোজা জলপাইগুড়ি স্টেশনে হাজির হয়ে দার্জিলিং মেল ধরব, এই কথা দিয়ে আমি সন্ধ্যের দিকে আমার ছেলের বাংলো অভিমুখে রওনা হলুম তারই পাঠানো জীপে ক'রে। তার বাংলোয় পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই রাত্রি হয়ে গেল। আলাপ হ'ল বাগানের ম্যানেজার স্কচ্ ভদ্র-লোকের সঙ্গে—বেশ রসিক। বললেন, "তোমার ছেলে তো আমার চাকরীটি খেয়ে নেবে। বাগানের পাঁচ হাজার শ্রমিক তোমার ছেলের কথায় এক পায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাড়া থাকতে পারে ; কিন্তু আমার কোনও কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। কি জাদুই জানে তোমার ছেলে! আমাকে পর্যন্ত বশ করে ফেলেছে।" ব'লে হো হো ক'রে হাসি।

পরের দিন ছেলে আমাকে তার বাগান দেখিয়ে নিয়ে চলল সোজা দার্জিলিংয়ে। সেখানে বেশ কিছুটা ঘোরবার পরে এক হোটেলে লাঞ্চ সেরে আমরা চললুম জলপাইগুড়ি স্টেশনের দিকে। যথাসময়ে সেখানে পেঁছে দেখি, আমার দলবল আগেই পেঁছে গেছে। লাইনে গাড়ী দিতেই আমরা আমাদের রিজার্ভ করা কামরায় উঠলুম। ছেলে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল এবং যথারীতি পরদিন আমরা কলকাতায় পেঁছলুম।

আমার 'উন্নত বীজধান' ছবিটিও রঞ্জিতকুমার ঘোষকে খুবই সন্তুষ্ট

করলেও আমাকে তেমন খুশী করতে পারে নি। এই ছবির জন্যে প্রয়োজন ছিল মাইক্রো-ফোটোগ্রাফীর। কিন্তু আমাদের কলকাতায় আজও অবধি এই বিশেষ পদ্ধতির কোনও যন্ত্র নেই। অতএব উন্নত বীজধান তৈরী করবার নিয়মকানুন দর্শককে বিস্তারিত ও বোধগম্যভাবে দেখানো যায়নি।

এই সময় তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের অধীনে চলচ্চিত্র উপবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বিজন সেনের কার্যকাল শেষ হওয়ায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন কবি গোপাল ভৌমিক। তিনি আমাকে 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' নাম দিয়ে পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের ওপর একখানি দু'রীলের ছবি তৈরী করতে দেন। ছবির কাহিনীটি লিখেছিলেন কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আমি তাঁর কাহিনী অবলম্বন ক'রে চিত্রনাট্য রচনা ক'রে তাঁকে শোনাই। তিনি খুশী হয়ে আমার চিত্রনাট্যের ওপর "O K" লিখে দেন। আগেকার কালের লক্ষ্মীর ঝাঁপিই যে আজকের দিনের পোস্ট আপিস সেভিংস ব্যাঙ্ক, এই তথ্যটি ছবির মাধ্যমে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। ছবির উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে কিনা, তা বলতে পারি না, কিন্তু সরকারের ফিল্মভল্ট থেকে পাওয়া খবর বলে, 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' ছবিটির খুব বেশী চাহিদা।

এর পরে দু'খানি সংবাদ-চিত্র আমি তৈরী করেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে। যে-বছর বাঙলা দেশ মুক্তি-সংগ্রামে রক্তস্নাত হয়ে পাকিস্তানীদের অধীনতামুক্ত হয় এবং শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কলকাতায় আসেন, সেই সময়ে আমাদের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শেখসাহেবকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে এক মহতী সভায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। শেখসাহেবের দমদম বিমান-ঘাঁটিতে আগমন থেকে শুরু ক'রে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের সভা পর্যন্ত সবটুকুই ছিল এই প্রথম সংবাদ-চিত্রে এবং তার সঙ্গে ছিল ২৬শে জানুয়ারীর অনুষ্ঠানগুলি।

দ্বিতীয় সংবাদচিত্র তোলা হয়েছিল ১৯৭৮ সালের বিধ্বংসী বন্যার। এই বন্যার চিত্র তুলতে হেলিকপ্টার থেকে শুরু ক'রে জীপ, ট্রাক, স্পিড-বোট, নৌকো, ভেলা, শালতি, কলা গাছের কাণ্ড কয়েকটিকে এক ক'রে বেঁধে, আবার ট্র্যাক্টার, গুড় ও চিনি তৈরীর বিরাট কড়া—সব রকম সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য বস্তু যান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। হাওড়া জেলা থেকে আরম্ভ ক'রে হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম—এই চারটি জেলা চ'ষে বেড়িয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ত্রাণব্যবস্থাও কিরকম, তাও দেখানো হয়েছিল।

শুনেছি, আমার তোলা এই ছবিটি (ইংরাজী ধারাভাষ্য সহ) দেখাতে পেরে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বোম্বাই ও দিল্লী থেকে প্রায় লাখ পনেরো কুড়ি টাকা সাহায্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং আমার অনুমতি নিয়ে পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত এই ছবিটি থেকে অন্ততঃ ৫০০ ফুট ডিউপ ক'রে নেন অর্থাৎ প্রতিলিপি গ্রহণ করেন তাঁর নিজের তৈরী ঐ বন্যাসংক্রান্ত ছবির জন্যে।

এই দু'খানি সংবাদচিত্র তোলবার মাঝে আমি আর একটি তথ্যচিত্র তৈরী

করেছি, কিন্তু সেটি নিজের নামে নয়। মধু বসু পরলোক গমন করার পরে সাধনা একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। যতদিন বাঁচবে, ততদিন মধুদার অধিকৃত ঐ ফ্ল্যাটটিতে বিনা ভাড়ায় থাকতে পাবে, এই প্রতিশ্রুতি পাওয়া সত্ত্বেও দিন-যাপনের জন্যে প্রথমে সে অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বিক্রি ক'রে ফেলে ; এর পরে সে বেচতে বাধ্য হয় তার সামান্য যা-কিছু গহনা ছিল, সেগুলিকে ; এরও পরে তার দামী দামী কাপড়-জামাগুলিতে হাত পড়ে। বলা বাহুল্য, অভিভাবকহীন অবস্থা হ'লে যা হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সমস্ত জিনিসই সে জলের দামে বিক্রি করেছে ; এ-বিষয়ে কারুর পরামর্শও সে গ্রহণ করেনি। বোধ করি, তার আভিজাত্যবোধ অতিমাত্রায় প্রখর ছিল ব'লেই সে এই পথ গ্রহণ করেছিল।

আমি এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু পাছে তিনি আহত হন, সে-জন্যে মুখ খুলিনি, নীরব দর্শকই থেকে গেছি। কিন্তু ঐ জিনিসপত্র জলের দামে বেচে পাওয়া টাকা যখন শিগ্‌গিরিই ফুরিয়ে গেল, তখন? স্রেফ অভুক্ত থাকবার অবস্থায় এসে তিনি পৌঁছুলেন। এমনই দিনে তাঁর কাছে এসে পৌঁছুল ফিল্মস্‌ ডিভিশন থেকে একটি টেণ্ডার ফর্ম। এবং তা আমারই সামনে। ওটিকে দেখে তিনি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এ আর আমি নিয়ে কি করব? অমন কত টেণ্ডার আগে এসেছে ; ভর্তি ক'রে পাঠিয়েছি—কখনও accepted হয়নি।"

আমি প'ড়ে দেখলুম ; টেণ্ডারের বিষয়বস্তু হচ্ছে—Orissa Filigree Works (উড়িষ্যার রৌপ্যনির্মিত তারের গহনা ইত্যাদি)। বললুম, "আপনার হয়ে আমি এটি পাঠাব ; আপনাকে খালি সই দিতে হবে।"

আশ্চর্য ! টেণ্ডারটি মঞ্জুর হ'ল। টাকার বন্দোবস্ত ক'রে ছবিটির কাজ শুরু ক'রে দিলুম। এর জন্যে বার কয়েক যেতে হ'ল কটক এবং একবার কোনারক। আর ছুটতে হ'ল বোম্বাইয়ে অবস্থিত ফিল্মস্‌ ডিভিশনের আপিসে। ওখানকার জামদার সাহেব ছবিখানিকে সমৃদ্ধ করবার জন্যে ফিল্মস্‌ ডিভিসনের মাইক্রো-ফোটোগ্রাফীর সাহায্য দিলেন। নির্মলা মাথান নামে একটি বোম্বেরই মেয়ে এতে নেপথ্যকণ্ঠ দিলেন। ছবিখানি "Twinkling Stars" নামে প্রচারিত হয়ে জনসংবর্ধনা পেয়েছিল। "A Sadhana Bose Production" (একটি সাধনা বসু প্রযোজনা) ব'লেই ছবিটি প্রচারিত হয়।

এই ছবির ব্যাপারে লভ্যাংশ হিসেবে আমি সাধনাকে নিদেনপক্ষে সাত হাজার টাকা দিয়েছিলুম। এরই বোধ করি বছরখানেক পরেই, এক সকালে সাধনারই নিকট-প্রতিবেশী ডাঃ মহীউদ্দিন আমাকে টেলিফোনযোগে ওর আকস্মিক মৃত্যুর খবর দেন। গিয়ে দেখি, জীবনযুদ্ধে রণক্লান্ত সাধনা যেন এতদিন বাদে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘুমুচ্ছে।

অথচ এই সাধনা—মধুর সাধনা ! কি আশ্চর্য খ্যাতির শীর্ষেই না উঠেছিল ! মর্জিনাবেশিনী সাধনা যখন বাবা মুস্তাফা বেশী টুক্‌লু (প্রীতি)

মজুমদারের হাত ধ'রে বলত, "বাবা—মুস্তাফা-আ-আ, আমি কি এই হাতে ছুরি ধরতে পারি?" আর মুস্তাফা বলত—"সেকি, বিবিসাহেব? তাই কি পারেন?" তখন সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ যেন ফেটে পড়ত।

'দালিয়া'র তিন্নি, 'ওমর খৈয়ামে' সাকী বিদ্যুৎপর্ণা—কোন্ মঞ্চাভিনয়ে তিনি না দর্শকচিত্তকে মথিত করেছেন? সমানই দাপট ছিল তাঁর চলচ্চিত্রেও। অভিনয়, আলিবাবা, মীনাক্ষী, কুমকুম, রাজনর্তকী প্রভৃতি ছবিতে তাঁর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই সময়ের সাধনা বসু সর্বজনপ্রিয়া। বলতে পারি, মুখশ্রী ও সর্বাঙ্গীণ চেহারায়, অভিনয়ে, নাচে, গানে এমন আশ্চর্য সার্থক আর দুটি অভিনেত্রীর আমরা সাক্ষাৎ পাইনি বাঙলার চলচ্চিত্র জগতে। কিন্তু ভাগ্যের কি আশ্চর্য পরিবর্তন! সেই সর্বজনমনলোভা সাধনাকে কারনানী এস্টেটের শেষজীবনে শুষ্ক, প্রায় কংকালসার চেহারায় দেখলে মানুষের এই নশ্বর পৃথিবীর ওপর, বোধকরি ঘেন্না জন্মে যেত।

এর পরেও ছবি তৈরীর উদ্যমে আমার বিরাম নেই, যদিও আমার কোনও চেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে না। প্রথমে আমি চেষ্টা করি, শরৎচন্দ্রের একটি পূর্ণদীর্ঘ জীবনীচিত্র তৈরী করবার জন্যে। তখন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার; সুব্রত মুখোপাধ্যায় হচ্ছেন তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী। শরৎচন্দ্র সম্পর্কীয় আমার তৈরী চিত্রনাট্যের কাঠামোটি প'ড়ে তিনি মুগ্ধ হন এবং আড়াই লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন।

পনেরো জন কলাকুশলীকে (আমি সমেত) নিয়ে আমি একটি সমবায় সমিতি (কো-অপারেটিভ সোসাইটি) গঠন করি এবং টেক্‌নিসিয়ান্স স্টুডিওতে ব্যারাকপুরের শ্রীশ্রীগোবিন্দ মায়ের সানুগ্রহ উপস্থিতিতে 'শরৎচন্দ্র' ছবিটির মহরতও করি। কিন্তু প্রাথমিক হাজার পনেরো কুড়ি টাকা সংগ্রহ করতে না পারায় ছবিটির আর অগ্রগতি সম্ভব হয়নি।

এই উদ্যমে অকৃতকার্য হবার কিছুদিন পরে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, বন্ধু সমর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে মুন্সী প্রেমচাঁদ লিখিত 'দুধের দাম' গল্পটি প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করেন। সময়টা প্রেমচাঁদের জন্মশতবার্ষিকী। আমি প্রেমচাঁদের গল্পের বই সংগ্রহ ক'রে গল্পটি মন দিয়ে পড়লুম এবং মুগ্ধ হলুম। সঙ্গে সঙ্গে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্ররূপ তৈরী ক'রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগে দাখিল করলুম অনুদানের জন্যে। ওখান থেকে যথাসময়ে চিঠি এল ছবিটির চিত্রনাট্য যতশীঘ্র সম্ভব পেশ করবার জন্যে। তাও করলুম।

তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগ আমার চিত্রনাট্যটিকে মঞ্জুর ক'রে দেড় লক্ষ টাকার অনুদান দিতে স্বীকৃত হলেন কয়েকটি বাঁধা শর্তসাপেক্ষে। প্রথম শর্তটিই হচ্ছে, ছবির অন্তত এক-চতুর্থাংশ সমাপ্ত করতে পারলেই প্রথম কিস্তি স্বরূপ ৫০,০০০ টাকা ওঁরা দেবেন।

মহামান্য সরকার এই মোদ্দা কথাটা বোঝেন না, কোনও প্রযোজক যদি

তার এক-চতুর্থাংশ শেষ করতে পারে, তাহ'লে বাকী তিন-চতুর্থাংশ করবার জন্যে পরিবেশকের কাছ থেকেই টাকা পাওয়া যায়, সরকারের দ্বারস্থ হবার আদৌ প্রয়োজন হয় না। সরকার যদি তাঁদের তরফ থেকে একজন যোগ্য তদারককারীকে রেখে ছবির প্রথম এক-চতুর্থাংশটুকু তৈরী করতে সাহায্য করেন, তাহলেই যোগ্য পরিচালক-প্রযোজককে যথার্থ সাহায্য করা হয়। কাজেই আমি আরও বহুজনের মতোই তাঁদের ঐ অনুদানপত্রটিকে ফাইলজাত ক'রে চুপটি ক'রে আকাশের তারা গুনছি ছবির প্রথম এক-চতুর্থাংশ তৈরী করবার টাকা আকাশ থেকে ঝুপ ক'রে পড়বার আশায়।

আবার পিছু হাঁটতে হচ্ছে আমার বহুমুখী জীবনের আরও দু'টি ধারার আরম্ভ ও গতিপথ সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় দেবার জন্যে। রবীন্দ্র-ভারতী সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য সংস্থার জন্ম হয় পাঁচের দশকের মাঝামাঝি থেকে তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে। এই সংস্থাটি বছর দু' তিন পরেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবার গৌরব অর্জন করে।

৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে এর উপাচার্য ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ডাকযোগে এক পত্র পাই, যার মারফত আমাকে আহ্বান করা হয়েছে, কোনও একটি বিশেষ শনিবার বেলা ২টা বা ৩টার সময়ে ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'চলচ্চিত্র পরিচালনা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেবার জন্যে। সম্মতি জানালুম এবং নির্দিষ্ট দিনে একটি লিখিত বক্তৃতা সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রভারতীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম। পৌঁছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকেই দেখলুম, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, "এর আগেও কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজন করেছি। কিন্তু এমন উৎসাহ, উদ্দীপনা দর্শকদের মধ্যে আর কোনও দিন লক্ষ্য করিনি। হলে তিলধারণের স্থান নেই। এ কি আপনার নামের আকর্ষণে, না, বিষয়বস্তুর আকর্ষণে?"

আমি হেসে বললুম, "বিষয়বস্তুর আকর্ষণেই নিশ্চয়।" যথা সময়ে বক্তৃতা দিতে উঠেই আমি বললুম, "আমি প্রবন্ধ পাঠ করছি না, লিখিত বক্তৃতা পাঠ করছি। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনা ক'রেই আমি বক্তৃতাটিকে লিখে এনেছি, নইলে খেই হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা।"

এর পরে পুরো ৪৫ মিনিট ধ'রে আমার লিখিত বক্তৃতাটি পাঠ করলুম ঠিক বক্তৃতা দেবার মতো ক'রেই। পরে প্রশ্নোত্তরের পালা। প্রচুর প্রশ্ন এবং তার যথাসম্ভব যথাযথ উত্তর। এও পুরো ৪৫ মিনিট ধ'রে চলবার পরে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় হাত তুলে আর কোনও প্রশ্ন করতে বারণ ক'রে বললেন, "উনি পুরো দেড়ঘণ্টা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে আরও দাঁড় করিয়ে রাখার অর্থ ওঁকে উৎপীড়ন করা। তা আমি হ'তে দিতে পারি না। কাজেই আজকের মত এইখানেই শেষ।"

বক্তৃতার দক্ষিণা হিসাবে একটি ৫০ টাকার চেক দিয়ে তিনি আমার

লিখিত বক্তৃতাটিকে চেয়ে নিলেন রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাসও দিলেন যে, এটি ছাপাবার জন্যে উনি আমাকে আরও ১০০ টাকা দেবেন। যথাসময়ে টাকাটি চেকের আকারে আমাকে পাঠিয়েওছিলেন।

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-বিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি আমার অশ্বিনী দত্ত রোডে থাকাকালীন আমার প্রতিবেশীও ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রভারতীতে দেখা করবার জন্যে। একদিন 'অমৃত' আপিসে যাবার পথে রবীন্দ্রভারতীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি দু'এক কথার পরে একখানি ফুলস্ক্যাপ কাগজ টেনে বার ক'রে আমার হাতে দিলেন এবং বললেন, "আমি যা বলি, লিখে যান।" ব'লেই বলতে শুরু করলেন, "Understanding that the post of...." আমিও যৎ শুনিতং তল্লিখিতম্।

লেখা শেষ হ'লে বললেন, "সই করুন।" তাও করলুম। জিজ্ঞেস করলেন, "এখন সময় আছে?" "আমাকে একবার অমৃত আপিসে যেতে হবে," বলতে তিনি বললেন, "যান যত শিগ্গির পারেন ঘুরে আসুন।" জোড়াসাঁকো থেকে বাগবাজার ঘুরে আসতেই ডঃ ভট্টাচার্য বললেন, "আসুন, ক্লাশে যাই।"

"ক্লাশে?" জিজ্ঞেস করতে প্রায় ধমকের সুরে বললেন, "হাঁ-হাঁ, ক্লাশে—আজ থেকেই শুরু ক'রে দিন—ফিল্ম স্ক্রিপ্ট রাইটিং (চিত্রনাট্য লিখন পদ্ধতি)-এর ওপর লেকচার।" ততক্ষণে আমরা ক্লাশের দরজায় পৌঁছে গেছি। সাধনবাবু আগে, আমি পিছনে পিছনে ঢুকলুম। উনি আমাকে ইঙ্গিতে বললেন চেয়ারে বসতে। আমি প্ল্যাটফর্মে উঠে টেবিলের পিছনে, চেয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। ছেলেরা দাঁড়িয়ে উঠল। সাধনবাবু বললেন, "বেশী কথা বলবার নেই। ইনি হচ্ছেন চলচ্চিত্র পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। ইনি তোমাদের ফিল্ম স্ক্রিপ্ট রাইটিং পড়াবেন। মন দিয়ে ওঁর কথা শোন।" ব'লেই বেরিয়ে গেলেন।

আমি চেয়ারে ব'সে ছেলেদের—ওদের মধ্যে জন দু'তিন মেয়েও ছিল—বসতে বললুম। ওরা আসন গ্রহণ করবার পরে আমি পড়ানো শুরু করলুম। সেদিন বলেছিলুম, চলচ্চিত্র নির্মাণে চিত্রনাট্যের গুরুত্বের কথা। একটি ছবিকে ভালো ক'রে তৈরী করতে হলে একটি ভালো চিত্রনাট্যের প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, আগে চিত্র, পরে নাট্য। প্রথমে ছবি, পরে নাটক। ছবিটি ছবি হওয়া দরকার, জলছবি নয়। অর্থাৎ ছবিগুলি পর পর এসে যেন মনে দাগ কাটতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘণ্টা বাজতে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাধনবাবুর ঘরে গেলুম। তিনি হেসে বললেন, "ব্যস, সপ্তাহে দু'দিন এবং দিনে দু'ঘণ্টা—এক ঘণ্টা ফিফ্থ্ ইয়ার, এক ঘণ্টা সিক্স্থ্ ইয়ার।" সেই সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ হয়ে গেল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যশাখার স্নাতকোত্তর বিভাগে

পার্ট-টাইম লেক্‌চারারশিপ্‌।

পুরো দশটি বচ্ছর পড়াবার পরে নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা আমি পার হয়ে যাওয়ায় আমাকে অবসর গ্রহণ করতে হয় ১৯৭২ সালের ৩১-এ অক্টোবর থেকে। ছাত্রছাত্রীরা শুধুই যে আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত, তাই নয়; তারা আমাকে ভালোও বাসত। অবশ্য সকলের মধ্যে শেখবার আগ্রহ সমান নয়; দু'পাঁচ জনই সত্যিই জিনিসটাকে মনেপ্রাণে শিখতে চাইত। আর শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও আমার প্রতি ভদ্র, সৎ আচরণ করতেন। কেউ কেউ রীতিমত ঘনিষ্ঠই হয়ে উঠেছিলেন।

রবীন্দ্রভারতীতে আমার দশ বছরের জীবনের মধ্যে ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এবং আমি যে কতবার চিত্তরঞ্জন, কুলটি, আসানসোল প্রভৃতি জায়গায় একসঙ্গে নাট্যপ্রতিযোগিতার বিচারক হয়ে গেছি, তা গুণে বলতে পারব না। তিনজনের একসঙ্গে ঐসব জায়গায় কাটানো আমার জীবনে সুখস্মৃতি হয়ে আছে।

সাধনবাবু অনেকদিন আগেই পৃথিবী থেকে ছুটি নিয়ে চ'লে গেছেন—আমি তখনও রবীন্দ্রভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলুম। অমন দিলখোলা, দরাজ হৃদয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রগচটা মানুষ আর দ্বিতীয় একজন নেই। যেমন হাসতে জানতেন, তেমনই হাসাতে জানাতেন। আর রাগলে একেবারে কুরুক্ষেত্তর।

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ হচ্ছেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। নিজের বক্তব্য তিনি অত্যন্ত ধীরে, শান্তভাবে অপরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। বিদগ্ধ মানুষ। ৬০-এর দশকে নাট্যবিচারক হিসাবে আমরা ত্রয়ী তখন ছিলুম সবচেয়ে নাম-করা। আমি এই দু'জন ছাড়াও অপরদের সঙ্গেও অনেক জায়গায় নাটকের বিচারক সেজে গেছি। কিন্তু এই দু'জনের সঙ্গে যে সহ-ধর্মিতা ও সহমর্মিতা অনুভব করেছি, আর কারুর সঙ্গে গিয়েই সে-রকমটি বোধ করিনি। এঁদের তুলনায় অপর সকলকেই মনে হয়েছে কিছুটা খাটো, কিছুটা মাটো।

বাঙলা এবং ইংরেজী সংবাদপত্র ও সাপ্তাহিকগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিত্র-সাংবাদিকেরা সকলে মিলিত হয়ে ১৯৩৭ সালে একটি সমিতি গঠন ক'রে তার নাম দিয়েছিলেন—বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্‌ অ্যাসোসিয়েশন। প্রায় বছর আট-দশ সক্রিয় থাকবার পরে সম্ভবত উৎসাহের অভাবে সমিতিটি মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে চলচ্চিত্রগতপ্রাণ বাগীশ্বর ঝায়ের উৎসাহ ও প্রেরণায় বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্‌ অ্যাসোসিয়েশন পুনর্জীবিত হয় এবং আজও পর্যন্ত তা তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে।

আমি ঐ ১৯৬২ সাল থেকেই এই সম্মানিত সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছি হয় কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরূপে, নয় সম্পাদকরূপে, কিংবা উপ-সভাপতি রূপে অথবা সভাপতিরূপে। অবশ্য এ-কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হয়, বাগীশ্বর ঝা হচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ।

এই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে, প্রতি বছরে কলকাতা শহরে মুক্তিপ্রাপ্ত বিদেশী, হিন্দী ও বাঙলা ছবিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিকে নির্বাচিত করা এবং ঐ সঙ্গে বিদেশী, হিন্দী ও বাঙলা ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক-দেরও নির্বাচিত করা। এ ছাড়া হিন্দী ও বাঙলা ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, অভিনেত্রী। সহ-অভিনেতা, সহ-অভিনেত্রী, শ্রেষ্ঠ মূল কাহিনীকার, চিত্রনাট্য-কার, গীত-রচয়িতা, সঙ্গীত পরিচালক, সাদা-কালো ও রঙিন ছবির ক্যামেরা-ম্যান, শিল্প-নির্দেশক, সম্পাদক, নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী প্রভৃতিকেও নির্বাচন করা।

প্রতি বছর এইভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিদের প্রশংসাপত্রদানে সম্মানিত করেন এই সংস্থা একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে। এই অনুষ্ঠানটি বাঙলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এমনই একটি বিশিষ্ট স্থান ক'রে নিয়েছে যে, চলচ্চিত্রপ্রেমী কলিকাতাবাসী এই অনুষ্ঠানটিতে প্রবেশ লাভ করবার জন্যে ব্যগ্রভাবে অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছে ধরনা দিতে থাকেন। এর একটি প্রবেশপত্র লাভের জন্যে এক একজনের সে কি ব্যাকুলতা! এবং এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ কোনও ভেদাভেদ নেই।

'অমৃত' সাপ্তাহিকের জন্মকাল থেকে প্রায় সাড়ে তেরো বৎসর ধ'রে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবার পরে যেদিন কাগজটির তত্ত্বাবধান বিভাগের জনৈক কর্মচারীর সঙ্গে সামান্য কারণে বাদাবিবাদ হওয়ার দরুন আমি এর সংশ্রব ত্যাগ করি, তার দু'একদিন পরেই, কোথা থেকে সংবাদ পেয়ে জানি না, 'নতুন খবর' নামে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাপ্তাহিকের স্বত্বাধিকার, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন, "আমার কাগজে আসচে হপ্তা থেকেই চলচ্চিত্র সমালোচনা করুন।"

"সেটা অত্যন্ত খারাপ দেখাবে। যে-হপ্তা থেকে 'অমৃত' ছাড়লুম, তার ঠিক পরের হপ্তা থেকেই 'নতুন খবর'-এ আত্মপ্রকাশ! না, দু'এক হপ্তা যাক্ তারপরে আপনার কাগজেই লিখব," বললুম আমি। ধীরেনবাবু খুশী হয়েই চ'লে গেলেন। মনে হয়, এই কথার সম্ভবত এক মাস পরে আমার প্রথম লেখা 'নতুন খবর' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়। মাত্র চলচ্চিত্র-সমালোচক রূপেই এই কাগজে প্রায় বছর দুই-আড়াই ধ'রে কলম চালনা করবার পরে একদা ধীরেনবাবু আমাকে অনুরোধ করলেন, "পশুপতিদা, এবার থেকে সম্পাদকীয়টাও আপনিই লিখুন। আপনারই নাম সম্পাদক হিসেবে থাকবে।"

"কিন্তু তাই ব'লে আমি তো সারা কাগজটার দেখাশুনা করতে পারব না; অত সময় আমার নেই। সম্পাদক হিসেবে নাম দেবে বলছ", জবাব দিলুম আমি। ধীরেন বলল, "হ্যাঁ, সম্পাদক হিসেবেই আপনার নাম থাকবে। প্রতি হপ্তার সম্পাদকীয় এবং ছবির সমালোচনা লিখলেই চলবে।"

সেই থেকে আমার অনুজতুল্য ধীরেনের কথামতই কাজ চ'লে আসছে।

অনেকেই শুনে অবাক হবেন, এই প্রায় নাম-না-জানা সাংস্কৃতিক সাপ্তাহিকটির বয়েস হয়েছে ৩৭ বছর এবং এতে প্রায় ৮।৯ বছর ধ'রে আমি প্রতি হপ্তায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে আসছি বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে অবলম্বন ক'রে। ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, দেবনারায়ণ গুপ্ত, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ (একদা 'চন্দ্রশেখর' এই ছদ্মনামে ইনি আত্মশক্তি, নবশক্তি, দীপালি, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় নাট্য ও চলচ্চিত্র সমালোচনা করতেন), এন্. কে. জি. (প্রথিতযশা চলচ্চিত্র-সাংবাদিক) প্রভৃতি যশস্বী ব্যক্তি আমার এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি আগ্রহ সহকারে পাঠ করে থাকেন, একথা জেনে আমি মনে মনে স্বস্তি লাভ করি। জানি না, আর কতদিন আমি এই সম্পাদকীয় লিখতে পারব, কতদিন আমার হাত চলনক্ষম থাকবে।

আজ এই সুদীর্ঘ জীবন-নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে পিছন পানে তাকিয়ে দেখছি, ক্ষীণ জলধারা ক্রমে পুষ্ট হয়েছে যাঁদের অজস্র স্নেহধারার সঙ্গে মিশে, তাঁদের প্রোজ্জ্বল ছবি। উজ্জ্বলতম হয়ে আছেন আমার দিদিমা,—মাতামহী। শুনেছি, তিনি নিদেনপক্ষে দশবারোটি সন্তানের জননী ছিলেন; অবশ্য এদের মধ্যে কন্যাসন্তানই বেশী। কিন্তু যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে, তখন থেকেই দেখেছি, একমাত্র তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান, আমার মা ছাড়া আর কেউই বেঁচে নেই।

তাই বোধ করি, তাঁর সমস্ত স্নেহধারা উপচে পড়েছিল তাঁর এই আদরের নাতিটির ওপর। আর কি আশ্চর্য! কতদিন আগে তাঁর সন্তানাদি হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার ঠিক নেই; কিন্তু তাঁর স্নেহধারার মতই তাঁর বক্ষের পীযূষধারাও তখনও পর্যন্ত অঝোরে ঝ'রে ঝ'রে পড়ত। শ্যামবাজার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সেই শিশু শ্রেণী প্রথম বর্ষ থেকে শুরু ক'রে, মনে হয়, বছর তিন-চার ধ'রে স্কুলের ছুটির পরে বাড়ীতে এসেই বইখাতার বগ্‌লিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দিদিমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তুম এবং প্রাণভরে তাঁর স্তন্য পান ক'রে পরিতৃপ্ত হতুম।

অকৃতজ্ঞ আমি; বড়ো হয়ে নানা কারণে উত্যক্ত হয়ে আমি তাঁর প্রতি কত কটু বাক্য প্রয়োগ করেছি। তিনিও অবশ্য চুপ ক'রে থাকেন নি। অথচ আমার স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসার অন্ত ছিল না। অনেক সময়ে তার কাছে দুঃখ ক'রে বলেছেন, পশুপতি আমাকে কটাং কটাং ক'রে কথা শোনায়, এ আমার সহ্য হয় না। কিন্তু রাগলে মানুষ চণ্ডাল হয়ে যায়, তখন আর তার হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান থাকে না। দিদিমা বেঁচে থাকতে থাকতেই প্রথমে তাঁর স্বামী, পরে আমার মা এবং সবশেষে আমার বাবা (তাঁর একমাত্র জামাতা) মারা যাবার পরে তিনি ১৯৪৯ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

এঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে একটুখানি এগিয়ে এসেই চোখ আবার থমকে দাঁড়িয়ে যায় কোন্ হরপার্বতীকে দেখে? আমার ছোট কাকা এবং

কাকিমা যথার্থই হরপার্বতী। কাকা দিবারাত্রি পরিশ্রম ক'রে অর্থ উপার্জন করেছেন, ভূ-সম্পত্তি বাড়িয়েছেন বছরের পরে বছর ধ'রে। আর কাকিমা করেছেন চুটিয়ে সংসার। জমিদার বংশের মেয়ে, রূপেগুণে পার্বতী বা জগদ্ধাত্রী।

আজ আর এঁরা নেই বটে, কিন্তু বর্ধমান জেলার জামালপুরগঞ্জে দেবনারায়ণ চাটুজ্জের বাড়ী ও বিরাট ভূসম্পত্তি আজও রয়েছে তাঁদের একমাত্র জীবিত সন্তান ডাক্তার ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের হেপাজতে।

আজ মনে পড়ছে, আমার প্রথম এই জামালপুরগঞ্জে যাওয়ার কথা। সালটা ১৯১৯। সেই বছরই মাইনর পরীক্ষা দিয়ে হিন্দু স্কুলে ভর্তি হয়েছি। সবে গ্রীষ্মের ছুটি হয়েছে। কাকা এসেছেন আমাদের বাড়ীতে। তিনি কলকাতায় কোনও কর্মোপলক্ষ্যে এলে আমাদের বাড়ীতেই উঠতেন। সেবারের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কাকা খাওয়া-দাওয়া সেরে দেশে ফেরবার জন্যে প্রস্তুত। মা মাথায় ঘোমটা দিয়ে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে, আমি তাঁর পাশে। এখানে বলা প্রয়োজন, আমার কাকা মায়ের দেবর হ'লেও বয়সে আমার বাবার থেকে মাত্র দেড় বছরের ছোট এবং সেই কারণে মায়ের থেকে বয়সে অনেক বড়ো ব'লে মা কাকার সামনে ঘোমটা খুলে তাঁর মুখকে কখনও অনাবৃত করেননি এবং তাঁর সঙ্গে কথাও কননি। যা-কিছু কথা হ'ত আমাকে মধ্যস্থ রেখে।

কাকা তাঁর ক্যাম্বিসের ব্যাগটি তুলে নিয়ে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "পশুপতির তো গ্রীষ্মের ছুটি হয়েছে, ও চলুক না আমার সঙ্গে। পাড়াগাঁ কেমন, দেখে আসবে।" কি জানি কেন, আমি কাকার কথা শুনে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লুম। অবাক হলেন মা, অবাক হলেন কাকাও। কেউই ভাবতে পারেননি, আমি হঠাৎ যেতে রাজী হব। মনে হয়, এক মিনিট আগে আমারও ধারণা ছিল না, আমি কাকার দেশে যাব।

কাকা বললেন, "বৌদিদি, তাহ'লে চট্‌পট্ পশুপতিকে তৈরী ক'রে দিন।" খাওয়া আমার আগেই হয়ে গিয়েছিল। বেরোবার মতো কাপড়-জামা-জুতো প'রে খানকয়েক জামা-হাফপ্যাণ্ট নিয়ে আমি দু'মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত। মা ও কাকার পায়ের ধুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম কাকার সঙ্গে। হাওড়া স্টেশন থেকে হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনের একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চেপে যখন মসাগ্রাম স্টেশনে পেঁছিলুম, তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত্রি এসে গেছে।

বহু যাত্রীর সঙ্গে আমরাও রেল-লাইনের ধার দিয়ে, কখনও সরু রাস্তা, কখনও সাঁকো (কালভার্ট) পেরিয়ে এসে পড়লুম একটি লেভেল-ক্রসিংয়ের কাছে। সেইখানে রেলের ধারের সরু রাস্তা ছেড়ে আমরা পড়লুম মেমারী-তারকেশ্বর রাস্তায়। সেই রাস্তা ধ'রে অন্তত মাইলখানেক হাঁটবার পরে আমরা কতকগুলি চালাঘর দেখতে পেলুম। শুনলুম, ওটা নাকি চোবেড়ের হাট। ওখানেই একটি দোকানীকে ডেকেডুকে তার দোকান-ঘর খুলিয়ে

আমরা জলযোগ করলুম। মনে আছে, চারটি রাজভোগের আকারের রসগোল্লা খেয়ে পেট ভ'রে গেল।

এরপরে আমরা একটি ভাড়া গাড়ীতে (ঘোড়ায় টানা) চেপে বসলুম। বেশ কিছুদূর আসবার পরে আমরা তাই থেকে নেমে একটি বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালুম। কাকা বাইরে থেকে ডাক দিলেন "হলধর, হলধর" বলে। দরজা খুলে গেল। কাকার ইঙ্গিতে সামনের ভদ্রলোককে প্রণাম করলুম। পরে জেনেছিলুম, উনি নাকি হলধর মামা ; কাকার সম্পর্কিত সম্বন্ধী।

রাত্তিরটা ওখানে গুজরাণ করবার পরে সকালে মুখহাত ধু'য়ে খেতে পেলুম এক থাবা সন্দেশ ; শুনতে পেলুম ওর নাম নাকি 'মাথা'। ভারী সুন্দর নরম পাকের বাটা সন্দেশ। আবার চাপলুম একটি ঘোড়ার গাড়ীতে, যা বেশ কয়েক মাইল ধ'রে চলবার পরে এসে থামল কাকার নির্দেশগত একটি জায়গায়। নেমে কাকার পিছন পিছন ঢুকলুম একটি খড়ের চালওয়ালা মেটে বাড়ীতে। কাকা কিছুটা গলা চড়িয়ে বললেন, "ওগো, দেখ, আমার সঙ্গে কে এসেছে।"

কাকীমা সম্ভবতঃ ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখেই আনন্দে ফেটে পড়লেন, "ওমা গো, এ কি অভাবনীয় ব্যাপার! পশুসোনা, তুই এসেছিস্ ?" আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। আমাকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেলেন। কাকাকে জিজ্ঞেস ক'রে যখন জানলেন, ট্রেন দেরীতে আসায় আমাদের কি ভোগান্তি না গেছে, তখন আমার মাথায় মুখে হাত বোলাতে বোলাতে আপসোস করতে লাগলেন।

কাকা এবং আমি দু'জনেই একটু জিরিয়ে নিয়ে স্নান ক'রে নিলুম। কাকীমার হাতের ভাজা লুচি বেগুনভাজা দিয়ে খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলুম, "কালীদাদা কোথায় ?" কাকা বললেন, "খেয়ে নে ; তারপরে নিয়ে যাচ্ছি তার পড়বার ঘরে।" আবার খানিকটা মাথা দিয়ে লুচি খেয়ে যখন উঠলুম, তখন পেটটি বেশ ভর্তি হয়ে গেছে। কাকা আমাকে ঐ বাড়ী থেকে বাইরে এনে বেশ কয়েক পা রাস্তা দিয়ে চ'লে একটি ইঁটের দেওয়াল-খড়ের চালওয়ালা ঘরের ঢোকবার দরজার সামনের দাওয়ায় নিয়ে এলেন। ভিতর পানে তাকিয়ে দেখি, কাকার বড়ো ছেলে কালীদাদা একমনে বই পড়ছেন।

কাকার কথায় সচকিত হয়ে কালীদাদা দরজার পানে ফিরে তাকালেন এবং তখনই বই ফেলে উঠে এলেন দরজার কাছে বলতে বলতে, "পশুপতি এসেছে ? জেঠাইমা এসেছেন বুঝি ওর সঙ্গে ?" কাকা যখন বললেন আমি একাই গেছি, তখন কালীদাদা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কাকা আমাকে কালীদাদার কাছে রেখে নিজের কাজে রওনা হলেন সাইকেল চেপে।

জেনেছিলুম, কাকা ওখানে পি. ডবলু. ডি এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কনট্রাক্টারী করেন। প্রধান কাজ সামনে দিয়ে প্রবহমান দামোদর নদের বাঁধের সংরক্ষণ। বাউরী শ্রেণীর আদিবাসীর একটি বিরাট দল ঐ বাঁধেরই আশে-পাশে আস্তানা বেঁধে আছে। তারাই—মেয়ে পুরুষ কাকার কাজের কুলি

কামিন। রাস্তার কাজও করে, বাঁধেরও কাজ করে। কাকার আছে রাধিকা মণ্ডল নামে একজন সরকার ; আর গোর হচ্ছে কুলিদের মেট বা সর্দার। সপ্তাহান্তে কুলিরা তাদের হিসাব বুঝে পায়। দেখতে পেলুম, তাদের রোজগারের বেশীর ভাগ অর্থই যায় পচাই বা তাড়ির দোকানে। ওদের সকলকেই সকালবেলা গালমন্দ, এমন কি মারধোর ক'রে ঘুম ভাঙাতে হয়। ঘুম চোখ নিয়েই ওরা দৌড়োয় ঝুড়ি, কোদাল, গাঁইতি নিয়ে নিজের নিজের কাজে।

বিচিত্র এদের জীবনযাত্রা। যুবতী স্ত্রী নিয়ে ঝগড়া লেগেই আছে। রঙ ওদের কালোই ; কেউ বা মিশমিশে কালো, কেউ বা কিছু কম কালো। কিন্তু এক একজনের চেহারার বাঁধুনি, চোখের চাহনি মুনিরও মাথা টলিয়ে দিতে পারে, এমনই তার যৌন আকর্ষণ। যুগলী ব'লে একটি মেয়ের কথা মনে পড়ছে। তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যেত না।

কাকা চ'লে গেলেন তাঁর কাজে। আমি রইলুম কালীদাদার কাছে। জানলুম তিনি তখন ফার্স্ট ক্লাশে পড়েন ওখান থেকে চার মাইল দূরবর্তী চকদীঘি হাইস্কুলে। ললিতমোহন সিংহরায়, ছক্কনলাল সিংহরায়, মণিলাল সিংহরায়েরা হচ্ছেন চকদীঘির জমিদার। তাঁদেরই স্থাপিত এই স্কুলটি নাকি ছিল অবৈতনিক। কালীদাদা সেই স্কুলেরই ছাত্র। সাইকেল ক'রে স্কুলে যাতায়াত করেন।

আমার থেকে বছর তিনেকের বড়ো কালীদাদা ছিলেন দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ, যাকে বলে কন্দর্পকান্তি, তাই। নরেনদা, হরেরাম, গোবিন্দ, জগদীশ প্রভৃতি কালীদাদার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমিও শিগ্‌গিরই পরিচিত হয়ে উঠলুম। ঐখানে থাকতে থাকতে আমিও খানিকটা সাইকেল চালানো শিখেছিলুম। কিন্তু কলকাতা শহরে ফিরে এসে অভ্যেসটা বজায় থাকেনি এখানের বড্ড বেশী গাড়ীঘোড়ার ভয়ে।

প্রথমবার জামালপুরে গিয়েই কালীদার সঙ্গে একটি নৈশ অভিযানে যোগ দিয়েছিলুম। কালীদাদারা কয়েকজন বন্ধু মিলে সাইকেল ক'রে চকদীঘিতে গিয়েছিলেন রাত্রি ১২টা নাগাদ। সেখানকার ছাত্রাবাসে প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে বেশ খানিকটা গুলতানি ক'রে ওঁরা আবার ফিরে আসেন। আমরা কালীদার পড়বার ঘরেই শুতুম ব'লে এ-ব্যাপার কাকা-কাকীমার কর্ণগোচর হয়নি।

আর একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার ঐ প্রথমবারেই। দামোদর নদ বছরের অধিকাংশ সময়ই শুষ্ক বালুকাময় থাকে। সেবারে গ্রীষ্মের শেষাশেষি থেকে অল্প অল্প করে নদীতে জল বাড়তে থাকে। একদিন অনেকে মিলে নদীতে স্নান করছি, হঠাৎ অনেকেই চীৎকার ক'রে উঠল—বান, বান। তাকিয়ে দেখি, দূর থেকে জলরাশি হাত পাঁচ-সাত স্ফীত হয়ে ছুটে আসছে। সভয়ে নদীর ঘাটের দিকে দু'তিন পা এগিয়ে যেতে না যেতেই বান আছড়ে পড়ল আমার মাথার উপরে, মাথার ওপর দিয়ে দ্রুত জলপ্রবাহ। আমি প্রায় অন্ধের মতো মনে দৃঢ়তা সঞ্চয় ক'রে ঘাটের দিকে এগোতে লাগলুম এবং

মিনিট তিনেক বাদে জলের ওপর মাথা তুলতে সমর্থ হলুম। ততক্ষণে জল পাঁচ ছয় হাত বেড়ে গেছে। পা চেপে চেপে এগুচ্ছি, জনদুই আমাকে ধ'রে ঘাটের কাছে নিয়ে এল।

এরই কয়েকদিন বাদে প্রায় মাসখানেক ধ'রে কাকীমার আদর খাওয়ার পরে কাকার সঙ্গে কলকাতায় চ'লে এলুম। কিন্তু এবার অন্য পথে। তারকেশ্বর থেকে জামালপুরগঞ্জ পর্যন্ত চৌদ্দ মাইল দীর্ঘ একটা মিটার গেজ রেলপথ ছিল—বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল লাইট রেলওয়ে। তাইতে চেপে কাকার সঙ্গে এসেছিলুম তারকেশ্বরে ; সেখান থেকে কলকাতা। এখানে বলে রাখা ভালো, কাকার আর এক ছেলে ভোলানাথ তখন মাত্র তিন বছরের শিশু।

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯১৯ সালে পুজোর ছুটি কাটাতে যাই মধুপুরে। মধুপুরের সাপাহা অঞ্চলে (বর্তমানে কালীপুর টাউন) ছিল টাউন স্কুলের স্বত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তীর বাড়ী। তাঁরই সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে বাবা আমাকে হাওড়া স্টেশনে এসে একটি টিকিট কেটে দিল্লী এক্সপ্রেসে—তখনকার আমলে এই ট্রেনটি অত্যন্ত দ্রুতগামী ছিল ব'লে রেলের কর্মচারীরা এর নাম দিয়েছিল তুফান মেল—তুলে দিলেন। জীবনে এই প্রথম আমি সম্পূর্ণ একা ট্রেনযাত্রা করছি।

বৈকাল ৪।৪॥টা নাগাদ মধুপুর স্টেশন আসতেই আমি আমার ছোট ট্রাঙ্ক ও বিছানা নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়লুম এবং একটু বাদেই কালীবাবুর সম্মুখীন হলুম। কিন্তু টাঙ্গা ক'রে বাড়ীমুখো যেতে যেতে তিনি আমাকে যা শোনালেন, তাতে আমি বেশ নিরুৎসাহই হয়ে গেলুম। প্রথমেই শুনলুম, তাঁর পরিবারাদি আজই কোনও বিশেষ প্রয়োজনে কলকাতা রওনা হয়ে গিয়েছেন এবং আরও শুনলুম, তিনি নিজেও কালই কলকাতা চ'লে যাবেন। আমাকে অভয় দেবার জন্যে বললেন, "তোমার এতে কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। ঠাকুর চাকর রইল—তারা তোমার দেখাশোনা করবে।"

তাঁর দোতলা বাড়ীতে পৌঁছুবার পরে একটু জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আমরা দুজনে বেরুলুম কাছের একটি একতলা বাড়ীর উদ্দেশ্যে। গিয়ে দেখলুম, সেখানে থাকেন এক বৃদ্ধা দম্পতী। কালীবাবু তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় ক'রে দিলেন। ভদ্রলোকের নাম হরিচরণ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা জেনারেল পোস্টাপিসের বড়ো চাকুরে পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায় হচ্ছেন ওঁর দুই কৃতী সন্তান। কলকাতার স্কট্স্ লেনে বাড়ী।

মধুপুরে যতদিন ছিলুম, ততদিন ওঁদের স্নেহচ্ছায়াতেই আমার কেটেছে। স্বামী-স্ত্রী, দু'জনেই আমাকে যে কি ভালোবাসতেন, তা ব'লে শেষ করা যায় না। দুপুরের আহার আমার প্রায়ই ওঁদের ওখানেই হ'ত এবং আহারের পরে ওঁরা দু'জনে আমাকে মাঝে নিয়ে দিবানিদ্রাটি উপভোগ করতেন। ঘুম থেকে ওঠবার পরে বন্দোবস্ত ছিল কিছু আঙুর, খেজুর, আপেল ও সামান্য মিষ্টি খাওয়া। আমি হাট থেকে ওঁদের বাজারটাও এনে দিতুম, পোস্টাপিসে

চিঠি ফেলে দিতুম। মধুপুরের দিনগুলি ওঁদেরই সান্নিধ্যে আমার কাছে অত্যন্ত মধুর হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আমার ছাত্রজীবনের অধিকাংশ বড়ো ছুটিই কেটেছে পূর্ববর্ণিত জামালপুরগঞ্জে। দ্বিতীয়বার যখন ওখানে যাই, তখন কাকা নিজের বাড়ী তুলেছেন কালীদাদা যে-ঘরখানিতে পড়তেন ও রাত্রে থাকতেন, সেই ঘরেরই লাগোয়া জমিতে, ঘরখানি থেকে বেশ কিছুটা ডানদিকে। দুখানি ঘর—এবং তাদের মাঝে খানিকটা খালি ঢাকা জায়গা। তাদের ইঁটের দেওয়াল ও খড়ের চাল; তবে কালীদাদার ঘরখানির চেয়েও উঁচু পোতার ওপর। পিছনে ধানের মরাই, ঢেঁকিশাল ও গোয়ালঘর। গোয়ালে অন্ততঃ তিনটি গাই গরু। কাকীমা উঠতেন শেষ রাত্তিরে। আশ্চর্য তাঁর গো-সেবা। তাদের খুরগুলি পর্যন্ত তেলে চকচক করত। নিজের হাতে তাদের খোল, ভূষি, জাব খাওয়াতেন। বাড়ীতে নিত্য নারায়ণ সেবা। পুরোহিত আসতেন পূজো করতে; ভোগের রান্না কাকীমা নিজ হস্তে রাঁধতেন শুদ্ধাচারে।

বছর দুয়েক বাদে কালীদার ঘরের লাইনেই উঠল উঁচুপোতার ওপর এক-তলা বাড়ী—পাকা বাড়ী, বাইরে খোলা রোয়াক, ভিতরে তিনখানি পাশাপাশি ঘরের কোলে চওড়া দালান, তারই একপাশ দিয়ে ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। পরের বছরই একতলা বাড়ী দোতলা হ'ল; ঠিক নীচের তলারই ধরনে দোতলারও ব্যবস্থা; ছাদের সিঁড়ির পাশে হ'ল ঠাকুরঘর।

জমজমাট বাড়ীতে কাকা-কাকিমা কালীদার বিবাহ দিলেন এক বৈশাখের শেষাশেষি। মহা ধুমধাম। ছোট্টখাট্ট, পাতলা চেহারার নতুন বৌদিদিকে আমি কোলে ক'রে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এলুম। কিন্তু বেচারার কি দুর্ভাগ্য! বছর পেরুল না। ঐ বছরেরই কার্তিক মাসের এক সন্ধ্যায় কাকা-কাকী রোগাক্রান্ত কালী দাদাকে নিয়ে আমাদের কলকাতার ১১, রামচন্দ্র মৈত্র লেনের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন।

আশ্চর্য রোগ! প্রচণ্ড জ্বর এবং সেই সঙ্গে প্রায় প্রতি মিনিটে এক একটি ছোট গামলা ভর্তি রক্তপ্রস্রাব। ডাক্তারে ডাক্তারে ছড়াছড়ি। খালি বিধান রায়কে কিছুতেই পাওয়া গেল না। অ্যালোপ্যাথিতে হার মেনে শেষ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথিক এস. কে. নাগ এলেন। কিন্তু তিনিও কু গাইলেন। সোমবার সন্ধ্যে থেকে শুরু করে বৃহস্পতিবার ভোর রাত্রি পর্যন্ত যুঝে কালীদা ৺কালীপূজার রাত্তির ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুঝলেন। কাকা ও কাকীমার সামনে চোখ বুঝলেন। দুঃখ যে কি পরিমাণে অবর্ণনীয় হ'তে পারে, তা চোখে দেখলুম।

আশ্চর্য আমার ঐ বৌদিদি! কত সহজে অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছেন। বিধবা হবার অব্যবহিত পরে তাঁর বাবা তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। বাবার মুখের ওপর বলেছিলেন, "আমার বাপের বাড়ীতে কি আছে? এই-খানেই আমার সব—এখানে কাক তাড়ালেও উপকার হবে। তুমি ফিরে যাও, বাবা!" আজও তিনি আমার কাকার সংসার মাথায় নিয়ে রয়েছেন। আজ

আর কাকা-কাকিমাও নেই। কিন্তু তিনি আছেন সমস্ত সংসারের কর্তৃত্বভার নিয়ে। ভোলানাথের স্ত্রী তার দিদির—বড়জায়ের হাতে সংসার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

জামালপুরগঞ্জকে আমি ভালোবাসি। আমার কাকার বাড়ীটি গ্রামের মধ্যে নয়, গ্রামের বাইরে গঞ্জ এলাকায়—যে-এলাকায় শস্যাদি বিক্রয় হয়, সেই এলাকায়—ঢোকবার মুখেই মেমারি তারকেশ্বর রোডের ওপরে অবস্থিত। রাস্তার অপর পারে দু'পা এগোলেই দামোদরের বাঁধ। বাড়ীর ছাদের ওপর থেকে দামোদরের বিস্তৃত খাত দেখা যায়। চতুর্দিকে গাছ-গাছালি চোখকে দেয় অসীম তৃপ্তি। বাড়ীর পিছন দিকে বিরাট দীঘি; নাম হাওয়াখানা। আশ্চর্য সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ, অথচ গ্রামের স্যাঁৎস্যাতেনি ভাব নেই, দিব্যি খটখটে শুকনো। কলকাতায় মন যখনই হাঁপাই হাঁপাই করে, তখনই আমি ছুটে চলে যাই কলকাতা থেকে মাত্র ঘণ্টা পাঁচ-ছয়েক পথ এই সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশটিতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসতে।

জীবনের উৎসমুখ থেকে আরও খানিকটা চোখ ফিরিয়ে যখন আমি অর্ধেন্দু নাট্যপাঠাগার, চিত্রাসংসদ ইত্যাদিতে নিজের কর্মধারা বিস্তৃত করেছি তখন দেখতে পাই, অন্তত দু'জন ব্যক্তিকে, যাঁরা সাধারণ লোক থেকে ছিলেন বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। একজন হচ্ছেন আচার্য মন্মথমোহন বসু এবং দ্বিতীয় জন হচ্ছেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রথমজন ছিলেন আমাদের বাড়ীর কাছেই মদনমোহনতলার অধিবাসী এবং স্কটিশ চার্চ কলেজের বাঙলার অধ্যাপক। তিনি তাঁর স্নেহগুণে আমার শুভার্থী হয়ে পড়েছিলেন।

মনে আছে, চিত্রাসংসদে আমরা একটি নাটকের মহলা দিচ্ছি; ওঁকে একদিন ডেকে এনেছিলুম কি রকম হচ্ছে দেখতে এবং কিছুটা দেখিয়ে দিতে। জানতুম, উনি মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ ধ'রে উনি আমার মহলা দেওয়ানো দেখে বললেন, "পশুপতি যেখানে মহলা দেওয়াচ্ছে, সেখানে আমি কি বলব ? ও এ-ব্যাপারে দারুণ এক্সপার্ট।" স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এ. পড়বার সময়ে আমি ওঁর ছাত্র হিসেবে ওঁর কাছ থেকে বাঙলা ভাষায় শিক্ষালাভ করি। টেস্ট পরীক্ষায় বাঙলায় উনি আমাকে কত নম্বর দিলেন, তা জানবার জন্যে আমি ওঁর বাড়ীতে যাই। বাড়ীর দু'তিনটি ছেলে নীচে নেমে এসে আমাকে জানায়, "এখন আপনার খাতা দেখা হচ্ছে ; উনি আমাদের প'ড়ে শোনাচ্ছেন, আপনি কোন্ প্রশ্নের কি উত্তর লিখেছেন। কাল এসে শুনবেন, কত নম্বর পেয়েছেন।"

আমি আর এরপরে নম্বর জানতে যাইনি। অত্যন্ত স্নেহশীল, বাঙলা সাহিত্য, বিশেষ ক'রে নাটক বিষয়ে গভীর জ্ঞানবিশিষ্ট এবং সুবক্তা এই সজ্জন অধ্যাপক বাঙলার সাংস্কৃতিক জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে আমি প্রথম পরিচিত

হই অর্ধেন্দু নাট্যপাঠাগার সংক্রান্ত কর্মোপলক্ষ্যে। কারণ তিনিই ছিলেন পাঠাগারের সভাপতি। আর আমি ছিলুম সহকারী সম্পাদক। পরিচয়টি ক্রমেই ঘনীভূত হয়। তাঁর পটলডাঙ্গার বাড়ীতে তিনি প্রায়ই আমাকে ডেকে পাঠাতেন নানা কর্মোপলক্ষ্যে। একটা বড়ো কাজের কথা আমার মনে আছে। আমি তাঁর বাড়ীর বিরাট লাইব্রেরীটি পাঁচ সাত দিনের পরিশ্রমে সুচারুরূপে গুছিয়ে দিয়েছিলুম। একবার অমৃতলালের পার্ষদবৃন্দ তাঁদের গঠিত সংস্থা 'অমৃতচক্র'-এর উদ্যোগে তাঁর একটি জন্মদিন উৎসবের আয়োজন করেন। অমৃতলালের সানন্দ সম্মতিক্রমে সেই উৎসবে সভাপতিত্ব করবার জন্যে আমি নিয়ে আসি শাস্ত্রীমশাইকে। শাস্ত্রীমশাইও অবশ্য অত্যন্ত খুশী মনে এই আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিতে সম্মত হন।

একটি কথা অনেকেই জানেন না। একদা হরপ্রসাদ এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে প্রচণ্ড সৌহার্দ্য ছিল। এবং সেই সৌহার্দ্যের ফলশ্রুতি স্বরূপ শাস্ত্রীমশাইয়ের প্রত্যেক ছেলের নামের মধ্যশব্দটি 'তোষ'—যেমন, আশুতোষ, দেবতোষ ইত্যাকার এবং আশুতোষের প্রত্যেক ছেলের নামের মধ্যশব্দটি 'প্রসাদ'—যেমন রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ। কিন্তু আশুতোষ তাঁর বিধবা কন্যা কমলার পুনর্বিবাহ দেওয়ায় এই সৌহার্দ্যে ফাটল ধরে এবং হরপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ ক'রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

আরও একজন কৃতীমান পুরুষ আমার চোখের সামনে উঁকি-ঝুঁকি মারছেন। নিরীক্ষণ ক'রে দেখি, তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। উনি শ্যামপুকুর অঞ্চলে থাকতেন এবং বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। সদাহাস্যময়, হৃদয়বান, পণ্ডিত লোকটি বহু সাহিত্যকর্মে আমার সহায়তা-প্রার্থী ছিলেন। যখন উনি 'পঞ্চপুষ্প' নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন, তখন আমাকে তিনি তার সহকারী সম্পাদকের পদ দেন। কাগজটি বেশী দিন চলে নি।

এঁদের থেকে দৃষ্টি সরাতেই যে উজ্জ্বল পুরুষটির ওপর গিয়ে আমার চোখ পরম শ্রদ্ধায় আটকে যায়, তিনি হচ্ছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেটা ছিল আমার 'নাচঘর'-এর যুগ। স্টারে তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'নবনাট্যমন্দির'। এইখানে তাঁর দ্বারা অভিনীত 'বিরাজ-বৌ'-এর যে-সমালোচনা আমি লিখেছিলুম 'নাচঘর'-এর পৃষ্ঠায়, তা প'ড়ে শরৎচন্দ্র তাঁর স্নেহপাত্র, 'বাতায়ন' সম্পাদক, অবিনাশ চন্দ্র ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করেন, ঐ সমালোচনা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখনীপ্রসূত কিনা। উত্তরে অবিনাশচন্দ্র যখন বলেন, না, ওটি পশুপতির রচনা, তখন তিনি পশুপতি নামক জীবটি সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত অবিনাশ-চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি এই পশুপতিকে তাঁর সামনে হাজির করতে

পারবেন কিনা।

এই কথাবার্তার ফলেই একটি রবিবারে অবিনাশচন্দ্রের সঙ্গে বালিগঞ্জ ২৪ নম্বর অশ্বিনী দত্ত রোডস্থ শরৎচন্দ্রের বাসভবনে আমি গিয়ে হাজির হই। প্রথম দর্শনের অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি নিজগুণে আমাকে একান্তভাবে আপনার করে নেন এবং নানা কথাবার্তার মধ্যে এ'কথাও আমাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নেন যে, সপ্তাহে অন্তত একটি দিন আমি তাঁর ওখানে যাব।

কথামত মাসের প্রায় প্রতিটি রবিবারেই বেলা ৯টা নাগাদ আমি আমার বাগবাজারের বাড়ী থেকে তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হতুম এবং নাটক, অভিনয়, বাঙলা সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনার মধ্যে দীর্ঘ-সময় অতিবাহিত হবার পরে যখন তাঁর কাছ থেকে ছাড়া পেতুম, তখন অক্লেশে বেলা দুটো, আড়াইটে বেজে যেত। ওখান থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে বাড়ী পৌঁছে যখন আহারে বসতুম, তখন সূর্য পাটে বসবার উপক্রম।

একবার হঠাৎ রেমিটেণ্ট ফিভারে আক্রান্ত হওয়ার দরুন আমি হপ্তা পাঁচেক অনুপস্থিতির পরে এক রবিবার সকালে ওঁর ওখানে গিয়ে হাজির হই। কিছুক্ষণ বাদে ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী, বছর দশ এগারো বয়স্কা মুকুল এসে আমাকে জানাল, "জ্যা লিখছেন, আজকে নামবেন না।"

সংক্ষিপ্ত উত্তরে আমি বললুম, "ঠিক আছে।" কিন্তু তার কথা শুনে আমি উঠলুম না, একই ভাবে ব'সে রইলুম। মিনিট পনেরো বাদে মুকুল আবার এল, আবার ঐ একই কথা জানাল। এবং আবার ঐ একই সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনে চলেও গেল। আবার, আবার, আবার আরও তিনবার ঐ একই অভিনয় চলল। তখন ঘড়িতে এগারোটা বাজে। হঠাৎ সিঁড়িতে ওপর থেকে নেমে আসবার চটিজুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ এবং তারই পরে স্বয়ং শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন, "আমি অতবার ক'রে ব'লে পাঠালুম আমি নামতে পারব না; তবু আমাকে সেই নামিয়েই ছাড়লে।"

"কৈ, আমি তো আপনাকে নামতে বলিনি? এই ঘরখানাতে ব'সে থাকা কি অপরাধ?" বললুম আমি।

এ-কথার উত্তরে তিনি বললেন, "না, ব'সে থাকা একটুও অপরাধ নয়, কিন্তু পাঁচ-পাঁচটা রবিবারে না এসে আমার আশাভঙ্গ করা নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধ।"

"কিন্তু কেন আসিনি, সেটা না জেনেই আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করছেন? আমি অসুখে শয্যাগত ছিলুম।"

"ওহো হো, এ-কথাটা তো আমার একেবারেই মনে হয়নি। ছি-ছি-ছি, কি ভুলই করেছি," বলতে বলতে তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন এবং আমার মাথায় মুখে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কেমন আছ, পশুপতি? এখন ভালো তো?"

কথা কইব কি ক'রে? তিনি তো ক্রমাগত মাথায় মুখে হাত বুলোচ্ছেন

প্রায় পাগলের মত।

একটু থামলে বললুম, "ভালো না হ'লে কি এতদূর আসতে পেরেছি ?" ব'লে আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি তখনও ব'লে চলেছেন, "ছিঃ ছিঃ, কি অন্যায়ই করেছি ? শুধু শুধু তোমার ওপর রাগ ক'রে আমি নিজেও কম কষ্ট পাই নি।"

"যাক্, এখন তো শান্তি। বলুন, কি লিখছিলেন ?"

"লিখতে কি পেরেছি ? যেই শুনেছি, তুমি এসেছ এবং আমি নামতে পারব না শুনেও ব'সে আছ, তখন থেকেই কলম অচল," বললেন শরৎচন্দ্র। তার পরে বললেন, ইতিমধ্যে রাধারানী দেবী তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে কি রকম অসুবিধায় পড়েছিলেন, সেই কথা। শরৎদা খেতেন ভাতে ভাত এবং শিঙ্গি মাগুর মাছের ঝোল। এর একটু এদিক ওদিক হ'লেই এই পেট রোগা লোকটির নানা বিপত্তি উপস্থিত হ'ত। কাজেই ওঁকে নিমন্ত্রণ খাইয়ে কোনও তৃপ্তি নেই।

বালবিধবা রাধারানী দেবী কবি নরেন্দ্র দেবকে ভালোবেসে ফেলেন এবং শেষ পর্যন্ত যখন দু'জনে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন নরেন্দ্র দেবের বয়স চল্লিশের কোঠায় এবং রাধারানী দেবীও তিরিশের একটু এদিক বা একটু ওদিক। লিলুয়ার এক বাগানবাড়ীতে তাঁর আত্ম-সম্প্রদানমূলক বিবাহ-বাসরে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। হিন্দুস্থান পার্কে কবি নরেন্দ্র দেব যে-বাড়ীটি তৈরী করান, তার নাম দিয়েছিলেন 'ভালো-বাসা'। কথাটি দ্বার্থ-সূচক। এই হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ীতেই রাধারানী দেবী শরৎচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ ক'রে বিপাকে পড়েছিলেন।

'নাচঘর'-এর পূজা সংখ্যার জন্যে শরৎচন্দ্রকে একটি লেখা দেবার জন্যে আমি অনুরোধ করি। সেই অনুরোধেরই ফল—আমাকে সম্বোধন ক'রে তাঁর বিখ্যাত পত্র "আমি নাটক লিখি না কেন ?" অবশ্য বিষয়বস্তুটি আমারই দ্বারা উত্থাপিত। আমিই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "আপনি নাটক লেখেন না কেন ?"

এমন মানবদরদী মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছেন। মানুষের ভণ্ডামি, গোঁড়ামিকে যেমন তিনি সহ্য করতে পারতেন না, তেমনই পারতেন না তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যকে সইতে। বিশেষ ক'রে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির শিকার বালবিধবাদের দুঃখে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। তাঁর স্নেহ-ভালাবাসা পেয়ে আমি ধন্য।

এই আলোকস্তম্ভ সদৃশ ব্যক্তিটির পরে আমার জীবন-নদী-পথে আমি এমন কোনও বিরাট ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসিনি, যাঁর কথা পাঁচজনকে শুনিয়ে আনন্দলাভ করা যায়। ১৯৩৭ সালের ১লা জুলাই অসবর্ণ বিবাহ করবার ঠিক পরদিন থেকেই আমি উত্তর কলিকাতাস্থ রামচন্দ্র মৈত্র লেনের বাস ত্যাগ ক'রে দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের একটি বাড়ীর ত্রিতলের ফ্ল্যাটে বাস করতে শুরু করি এবং বছরখানেক বাদেই ঐ বাড়ীর

চৌতলের একটি ফ্ল্যাটে চ'লে যাই। সেখানে থাকতে থাকতেই আমি বালিগঞ্জ স্টেশনের সন্নিকটস্থ জামির লেনে একটি ছোট বাড়ী তৈরী করিয়ে সেখানে চ'লে যাই। কিন্তু মাত্র বছরখানেক আমি সেই বাড়ীতে থাকি। কন্ট্রাক্টরের হাজার দুয়েক টাকা পাওনা ছিল। তারই তাগাদার জ্বালায় অস্থির হয়ে আমি বাড়ীটি বেচে দিতে যখন বাধ্য হই, ঠিক তখনই আমার নিউ থিয়েটার্সে'র একশ' পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরীটি যায়।

১৯৪১ সালের প্রথম কয়েকমাস বেকার অবস্থায় কাটাবার পরে বন্ধু কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ অনুসারে আমি মিঃ পি. এন রায়ের কাছে যাই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দ্বারা কর্মে নিযুক্ত হই। এ সব তথ্যই যথাস্থানে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রবহমান জীবননদীতে কখনও এসেছে জোয়ার, কখনও ভাঁটা। জীবনের ঘাটে ঘাটে কত লোকের ভীড়! মিঃ রায়ের সঙ্গে কাজ করবার সময়ে তাঁর সম্পর্কিত ভ্রাতা অমিতাভ রায়, কল্যাণ গুপ্ত, বচন সিং আরসি, ক্যামেরাম্যান সুহৃদ ঘোষ (মণ্টু), মোটর ড্রাইভার শ্যামবাবু প্রভৃতির সাহচর্যে এসেছি। তাঁদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছি। তারপরে কাহিনী-চিত্র পরিচালনার বৃহত্তম কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

কত অভিনেতা, কত অভিনেত্রী! নতুন নতুন মুখ, আবার কিছু বা চেনাও! নতুন অভিনেতা, অভিনেত্রী গড়ার সে কি মেহনত, সে কি অপার আনন্দ! আমার সঙ্গে কাজ ক'রে নতুন পরিচালক জন্মগ্রহণ করেছেন। নতুন অভিনেত্রী, নতুন অভিনেতা।

চিত্রপরিচালক রূপে কাজ করতে এসে কত প্রতিষ্ঠিত প্রযোজক, কত উঠ্‌তি প্রযোজক, কত পরিবেশক, কত চিত্র-প্রদর্শক, হাউসের মালিকদের সংস্পর্শে যে এসেছি, তার ইয়ত্তা নেই। মনে পড়ে আমার প্রথম ছবি 'পরিণীতা' ঢাকা শহরে দেখানো হচ্ছিল। হাউসের স্বত্বাধিকারীর আমন্ত্রণ-ক্রমে সেখানে গিয়েছিলুম। হাউসের দর্শকরা ছবির বিভিন্ন স্থান তারিফ করছিলেন 'মার কাটারি'—এই ধ্বনি দিয়ে। নারায়ণগঞ্জেও সমান অবস্থা। শুনেছিলুম, খুলনার 'উল্লাসিনী' সিনেমাতে এক লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল এই 'পরিণীতা' ছবিতে।

কাজকে ভালোবেসেছি, কাজের মধ্যে ডুবে থেকেছি। যখন রবীন্দ্র-ভারতীতে অধ্যাপনা করেছি, তখন ছেলেদের ভালবেসেছি, যে-বিষয়ে অধ্যাপনা করেছি সেই বিষয়টিকে তাদের সাধ্যমত জানাবার চেষ্টা করেছি।

নাটক বিভাগের কর্তা থেকে শুরু ক'রে অপরাপর অধ্যাপকবৃন্দের সঙ্গে আমার সুমধুর সম্পর্ক ছিল। আমার কর্মবিরতির পরে তাঁরা একটি বিদায় অভিনন্দনের আয়োজন করেছিলেন। তাতে যে মানপত্র তাঁরা আমাকে ভালোবেসে প্রদান করেন, তার এক জায়গায় তাঁরা লিখেছেন ঃ আজীবন আত্মপ্রচারে বিমুখ থেকে তুমি নানাভাবে নটনাথের সেবা ক'রে এসেছ। যা তোমার প্রাপ্য, তা তুমি পাও নি। চাওয়া-পাওয়ার হিসেব-নিকেশও কর নি

কোনদিন।—জানি না, তাদের এই কথার মধ্যে অতিশয়োক্তি কিছু আছে কিনা।

পরম করুণারূপিনী মাকে সর্বসময়ে মনে রেখে নিয়ন্ত্রিত পথে ধাবমান হয়েছি তাঁরই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। আজ দেখছি, দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরে একেবারে মোহনায় এসে পেঁছে গেছি সাগরের সঙ্গে মিশে যাবার অপেক্ষায়। সে কবে? সে কবে?

প্রসঙ্গ কথা

আত্ম-জীবনীতে সাল-তারিখ, ব্যক্তি-স্থান নামের ভুল বা কোনো ঘটনার বিবরণের সঙ্গে প্রচলিত বিবরণের অমিল থাকায় আত্ম-জীবনী বা স্মৃতি-চারণের মূল্য কমে না। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক এবং অমৃতলালের স্নেহ-ধন্য নাট্যানুরাগী পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের এই আত্ম-জীবনী প্রকাশক পেয়েছেন তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তারিখ বা গান্ধীজী কবে ভারতবর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, অমৃতলালের 'চরকা' প্রবন্ধ না স্মৃতিচারণ, শিশির ভাদুড়ী প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতি শিশিরকুমারের জীবনীকারদের দ্বারা সর্বদাই সমর্থিত কি না এসব খুঁটিনাটি প্রসঙ্গে আমরা নীরবই থাকবো। আমরা একটি ছোট্ট তথ্য এবং পঙ্কজকুমার মল্লিক প্রসঙ্গেই বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো। সেই সঙ্গে আপাতত অপ্রাসঙ্গিক হলেও অন্য একটি প্রসঙ্গে সামান্য কিছু অতিরিক্ত তথ্য এই আত্ম-জীবনীর পাঠকদের জন্য পেশ করা হবে, তবে তা কোনো নতুন বা অজানা তথ্য নয়।

বই-এর ২৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে অমৃতলালের 'খাসদখল' (১৯১২) নাটকের নিতাই চরিত্র সম্বন্ধে আত্মজীবনীকার 'নিতাই চরিত্রটি' সম্বন্ধে লিখেছেন, "অমৃতলালের এই 'নিতাই ইজ দি' চরিত্রে আশ্চর্য স্বাভাবিক অভিনয় বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবার মতো।"

'খাসদখল' প্রথম অভিনীত হয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের আমলে 'স্টার'-এ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। অমৃতলাল তখন 'স্টার' এবং নাট্যাচার্য। 'নিতাই ইজ দি' চরিত্রের নাম নয়। অমৃতলাল নিজেই নিতাই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু চরিত্র-কল্পনায় ও অমৃতলালের অভিনয়গুণে নিতাই চরিত্রটি 'নিতাই ইজ দি' নামেই তৎকালে সুপরিচিত ছিল। কারণঃ " 'খাসদখলের' নিতাইয়ের ভূমিকায় অমৃতলালের অভিনয় সকলেই উচ্চপ্রশংসা করেছেন। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'নাট্যকার অমৃতলালই হইতেন নিতাই, এ-পর্যন্ত তেমন নিতাই আর হয় নাই।' [ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, পৃ. ২২৯] এ-চরিত্রটি অন্যান্য অভিনীত চরিত্রের মত শ্লেষবাক্যনিপুণ, হিতকথাকোবিদ নয়। চরিত্রটি প্রভুভক্ত পাগলাটে এবং ভুল ইংরেজি বাদ্যব্যবহারে হাস্যাস্পদ। তার সর্বত্র এবং পুনঃ পুনঃ 'ইজ দি'-র ব্যবহার বহুকথনে একটু বিরক্তিজনক বিশেষ কৌতুক উদ্রেক করে।' ডঃ অজিতকুমার ঘোষঃ 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস' পৃ. ৯৩। ১৯৮৫

বইয়ের ৪২ থেকে ৪৬ পৃষ্ঠায় পঙ্কজকুমার মল্লিক প্রসঙ্গে পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য ঃ

১. পঙ্কজকুমার 'আজি মর্মর-ধ্বনি কেন জাগিল রে' গানটি ঠিক সুরে গান নি।

২. পঙ্কজকুমার সুর সম্পর্কে স্বপক্ষে বলেন "হিজ মাস্টার্স ভয়েসে কে. মল্লিকের রেকর্ড শোনেন নি ? ঠিক এই ভাবে গাওয়া আছে।" জবাবে পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি "আমিও সে কথা মানছি ; তবে কথা কি জানেন—ভদ্রলোক রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেই জানেন না।"

এই প্রসঙ্গে তথ্যের একটি ত্রুটি আছে। হিজ মাস্টার্স থেকে কে. মল্লিকের এই গান আদৌ রেকর্ড হয় নি। গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে হরেন্দ্রনাথ দত্ত গানটির রেকর্ড করেন। রেকর্ড সংখ্যা P6927। সিদ্ধার্থ ঘোষের প্রামাণিক বই 'রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত' থেকে আমরা এই তথ্য জানতে পারি।

> [১৯১৬-২৫] এই পর্বে সর্বাধিক রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেছিলেন হরেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু জনপ্রিয় গায়ক হলেও রবীন্দ্রনাথের সুরের প্রতি তিনি অনুগত ছিলেন না। P 6927-সংখ্যক রেকর্ডে তিনি পরিবেশন করেছিলেন 'আজি মর্মরধ্বনি কেন' ও 'আলোকের এই ঝরনাধারায়'। এই দু'টি গানই কিছুকালের মধ্যে স্বতন্ত্র একটি রেকর্ডে (P 8370) বাণীবন্ধ করেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কারণটা নিশ্চয়ই অনুমেয়।

শ্রীসিদ্ধার্থ ঘোষ কে. মল্লিক সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> এ পর্বের [১৯১৬-২৫] অন্যতম জনপ্রিয় কে. মল্লিক (মুনসী মোহম্মদ কাসেম ওরফে মানু মিঞা) কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেন। শোনা যায় P 4302-সংখ্যক রেকর্ডের এক পিঠে তাঁর গাওয়া "আমার মাথা নত করে দাও হে" গানটির সুর এতই পীড়াদায়ক ঠেকেছিল যে, রবীন্দ্রনাথ এটির প্রচার বন্ধ করে দিনেন্দ্রনাথকে দিয়ে নতুন রেকর্ড করান।

দ্র. রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত সিদ্ধার্থ ঘোষ, পৃ. ১৪-১৫

৩. লেখক 'গীতবিতান'-এর উল্লেখ করেছেন। 'গীতবিতান' ১ম খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১-এ এবং ২য় খণ্ড ১৯৩২-এ। 'গীতবিতান'-এর পরিচায়ক পত্র (Printer's page) খুললেই এই তথ্য পাওয়া যাবে।

এবার পঙ্কজকুমার মল্লিকের নিজের কথা শোনা দরকার। তিনি তাঁর স্মৃতিকথা 'আমার যুগ আমার গান' (১৯৮০) বইটিতে পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের নামই উল্লেখ করেন নি। পঙ্কজকুমার লিখেছেন ঃ

'...এদিকে আমি তখন নিজের উৎসাহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যেতাম মাঝে মাঝে, শনিবার সন্ধ্যায়। সেখানে ব্রহ্মসঙ্গীত হতো, শুনে শুনে তুলে নিতাম। আগেই একবার উল্লেখ করেছি, সেখানে ভবসিন্ধু দত্ত মহাশয় গাইতেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বেশ কয়েকখানা গান তুলে নিয়েছিলাম আমার অনভিজ্ঞ কণ্ঠে। যতদূর মনে পড়ে, একখানি স্বরলিপি-পুস্তকও সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম।

১৯২২ সালের কথা। বঙ্গবাসী কলেজের তরুণ ছাত্র আমি। কেমন করে জানি না, তখনই আমার মনে একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের গানেই আমার ইহজন্মের মুক্তি, এই গানই আমার এ-জীবনের তীর্থ-যাত্রার প্রধান সম্বল। বুঝতে পেরেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের গান শুধু গানই নয়, এ-যেন কোনো এক বিপুল অসীম থেকে নিয়ে-আসা অধরা মাধুরীর সংহত বাণী-মূর্তি। এ গান রসিকের চিত্তকে নিখিলের বাণীমন্দির-প্রাঙ্গণে এক অন্তহীন বিস্ময়ের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আজ সে-বয়স পেরিয়ে এসেছি যখন এই কথা বললে কোনো কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিদ্রূপ করতেন আর আমি মনোবেদনায় ক্লিষ্ট হতাম।

মহাকবির চরণ-প্রসাদেই আজ মানসিক স্থৈর্য আমার করায়ত্ত। এমনকি সব যদি হারাই,—'তবু তো আছে আঁধার কোণে ধ্যানের ধনগুলি/একেলা বসি আপন মনে মুছিবি তার ধূলি'।

তারপর? তিনিই পথনির্দেশ করে গেছেন—'আপন মাঝে' যে 'গোপন রতনভার' আছে, তাই দিয়ে—

> গাঁথিবি তারে রতনহারে, বুকেতে নিবি তুলি
> মধুর বেদনায়……

প্রথম কৈশোরের স্বপ্ন ছিল কালক্রমে ওস্তাদ গায়ক হব। কিন্তু রবীন্দ্র-রুচি আমার পথ দিল বদলে। আবার রবীন্দ্র-সঙ্গীত-চর্চার সঙ্গে এসে মিশে গেল আমার সুরারোপের প্রবণতা। 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' গানটির কথা তো আগেই বলেছি। এর পরে আমায় আচ্ছন্ন করলো 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়া'—'খেয়া' কাব্য গ্রন্থের 'শেষ খেয়া' নামক এই বিখ্যাত কবিতাটি। কিছু দিনের মধ্যেই এই কবিতাটিতে সুর দিয়ে এখানে ওখানে গেয়ে বেড়াতে লাগলাম। ছোট-খাটো আসরে, কলেজের অনুষ্ঠানে এই গানটি মহানন্দে পরিবেশন করছি তখন। এই গানটির শুরু ও শেষের ইতিকথা যদি এখানে একটু লিপিবদ্ধ করি, তাহলে আশা করি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হবে না। গানের প্রথম কয়েকটি পংক্তি—

> দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ওই ছায়া
> ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ
> ও-পারেতে সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন্ মায়া
> গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।

দিনান্তের কবিতা, বেলাশেষের গান। অল্প বয়সের অজ্ঞতায় আমি কিন্তু এতে প্রভাতের সুর লাগিয়েছিলাম। হলে হবে কী, গানটি যত্রতত্র গেয়ে বেড়ানোর ফলে বহু প্রশংসা জুটে গেল চারিদিক থেকে। লোকে বলল, বাঃ, বেশ গায় ছেলেটি।

কালক্রমে এই গান স্বয়ং কবির সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। কিন্তু সেদিন এই গান আমার সমূহ বিপদ ডেকে এনেছিল। কারণ, এত স্পর্ধা তো

ভাল নয়। অনুমতির তোয়াক্কা না রেখে কবির কবিতায় সুর দিয়েছি, একেবারে স্বেচ্ছাচারের চূড়ান্ত।

তখন বুকের মধ্যে বাস করতো এক দুঃসাহসিক বালক ও তার সুরের যত পাগলামি। সেই বুকের 'আগল ধরে' তখনো কোনো শ্রোতা 'নাড়া' দেয় নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন নাড়া এসে লাগল। সত্যিই এক ভদ্রলোক একদিন এসে সদর দরজায় কড়া নাড়লেন। জানালেন, স্বয়ং কবিপুত্র আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। ভদ্রলোক সংক্ষিপ্ত বার্তাটুকু জ্ঞাপন করেই অন্তর্হিত হলেন।

ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় ঢুকে প্রথমেই দেখা পেলাম দারোয়ানদের। ভরসায় বুক বেঁধে তাদের কাছে রথীন্দ্রবাবুর খোঁজ নিলাম। গাট্টাগোট্টা মস্ত গোঁফওলা এক দারোয়ান দোতলার হল্-ঘরের পথ দেখিয়ে দিলো। সেখানে উঠে, দরজার সামনে কম্পিত বক্ষে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম সৌম্য সুদর্শন কবি-পুত্রকে। এগিয়ে গিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই আমার দিকে তাকালেন তিনি। নিজের পরিচয় দিয়ে সভয়ে শুধালাম—আমায় কি আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন?......

রথীন্দ্রনাথ বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ বসুন।

আমি সঙ্কুচিত ভাবে আসন গ্রহণ করার পর তিনি আমার দিকে স্থিরভাবে চেয়ে বললেন—আপনি নাকি বাবামশায়ের কী একটা ছায়া ছায়া গান গেয়ে থাকেন?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—কী গানের কথা বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না তো।

বারান্দা দিয়ে ওই সময়ে এক ভদ্রমহিলা যাচ্ছিলেন। রথীন্দ্রবাবু তাঁকে ডাকলেন—রমা শোনো।

সুবেশা তরুণীটি ঘরে ঢুকলেন, চেহারায় স্নিগ্ধ সুরুচির ছাপ। ওঁকে তখন আমার চেনার কথা নয়, পরে জেনেছিলাম যে উনি আমাদের সৌম্যদা অর্থাৎ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী।

—আচ্ছা রমা, তোমার কি মনে আছে সেদিন কোন্ গানের কথা হচ্ছিল? ইনি এসেছেন, এঁরই নাম পঙ্কজকুমার মল্লিক।

রমা দেবী বললেন—'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়া' কিন্তু গান নয় তো ওটা, ওটা তো একটা কবিতা।

এই বলে তিনি চলে গেলেন।

রথীবাবু বলে উঠলেন - হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—দিনের শেষে। আচ্ছা কবিতা বা গানটি, আপনি কোথায় পেলেন বলুন তো?

বুঝলাম, এইবার ধরা পড়বো। রথীন্দ্রনাথ নিশ্চয় গর্জন ক'রে উঠবেন—এত বড়ো সাহস আপনার। অপরিণত যুবক আপনি, কোন্ সাহসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় সুরারোপ করেন?

সুতরাং মরীয়া হয়ে মিথ্যা কথা বললাম।

—আজ্ঞে গানের বইতেই তো রয়েছে।

'গানের বই' কথাটি শ্বনে রথীন্দ্রনাথ যেন একটু ধাঁধায় পড়ে গেলেন। বললেন—কোন্ বইতে আছে বল্বন তো? স্বরলিপি আছে?

—নিশ্চয়। আমি তো তাই থেকেই শিখেছি।

—আশ্চর্য! আমরা কেউ মনে করতে পারছি না। আপনার কাছে বই আছে?

—আজ্ঞে ছিল, আমার এক বন্ধ্ব সম্প্রতি ওটা নিয়ে গেছেন। তিনি কাশী গেছেন।

—আচ্ছা বেশ, তিনি ফিরলে আনতে পারবেন?

—হ্যাঁ, তা পারব না কেন?

মিথ্যার পর মিথ্যা সাজিয়ে তখনকার মতো রেহাই পেয়ে মনে করল্বম বেঁচে গেছি। কিন্তু না, বাঁচিনি। এক মাস পরেই একটা চিঠি এলো, স্বাক্ষরকারী কবিপ্বত্রই। চিঠির বার্তা এই যে স্বয়ং কবি আমায় ডেকেছেন, অম্বক দিন, অম্বক সময়ে আমি যেন যাই।···

···নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে পেঁছালাম। এবারেও রথীন্দ্রবাব্বর সম্ম্বখীন হতে হলো। এবার আর তিনি ভুল করলেন না। সোজাস্বজি বললেন—দেখ্বন গোপন করার দরকার নেই। আমি জেনেছি 'দিনের শেষে ঘ্বমের দেশে' কবিতাটিতে স্বর দিয়ে আপনিই গান তৈরি করেছেন। গানটা বাবামশাই আপনার ম্বখেই শ্বনতে চান। চল্বন তাঁর কাছে।···

ঘরের এক পাশে নীচু সাদ্বশো তক্তপোশ, শ্বভ্র চাদর পাতা। তার উপরে বসে কবি কী যেন লিখছিলেন আর মাঝে মাঝে অস্ফ্বটভাবে কী যেন বলছিলেন আপন মনে। তাঁর সেই তন্ময় ঋষিম্বর্তি আজও আমার মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আরো বোধহয় আটজন মান্বষ সে ঘরে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দ্বজন মহিলা। এঁদের কাউকেই তখন আমি চিনতাম না। পরে জেনেছিলাম যে সকলেই ঠাকুর-পরিবার-সংশিলষ্ট।

ঘরের আর এক কোণে ছিল অন্বপম একটি অর্গান। হ্যামিলটনের বাড়ির সেই সঙ্গীতযন্ত্রটিকে শ্বধ্ব অর্গান না বলে একখণ্ড মনোরম আসবাব বললেই ভালো হয়। রথীন্দ্রবাব্বর ইঙ্গিতে অর্গানটিতে বসলাম। তারপর ধীরে ধীরে কবির বাণী গাইতে শ্বর্ব করলাম আমার স্বরে স্বয়ং কবির সম্ম্বখে। দেখতে পাচ্ছি, কবি তখনও চোখ ব্বজে রয়েছেন, অস্ফ্বটভাবে কী বলছেন মাঝে মাঝে।

···'সীতা' নাটক তো বাড়ির বড়দের সঙ্গে দেখে এলাম ইডেন গার্ডেনে। গান শ্বনলাম দিনেন্দ্রনাথের আরোপিত স্বরে, কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠে। মনের মধ্যে গ্বন্ গ্বন করে ফিরতে লাগল—'মঞ্জ্বল মঞ্জরী নব সাজে', 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রব্বাদল ঝরে' ইত্যাদি। লক্ষ্মীদা, আনন্দ পরিষদের লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান শিখতে গেলে দিনেন্দ্রনাথের কাছে যেতে হবে। 'সীতা' দেখে এসে ঐ কথাটা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। এ আমার কলেজ জীবনের প্রথম দিকের কথা। প্বর্ব অধ্যায়ে

'ভারতী' পত্রিকার আসরের যে-সব কাহিনী বলেছি এ তারও অনেক আগের কথা।

মনে পড়ে এর পর একদিন আমি ভরসায় বুক বেঁধে একাই চলে গিয়েছিলাম দিনেন্দ্রনাথের কাছে। 'সীতা' দেখার কয়েকদিন পরেই। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, কোনও পরিচয়পত্র নেই, নিজস্ব কোনো গুণগরিমাও নেই। সম্বল খানিকটা দুঃসাহস মাত্র।

...পথ চিনে প্রথম যখন দিনেন্দ্রনাথের কাছে পেঁছালাম তখন শ্যামবর্ণ স্থূলাঙ্গ মানুষটিকে চিনতে পারিনি। কিন্তু ভয়ে ভয়ে যখন তাঁর কাছে আপন পরিচয় নিবেদন করলাম এবং আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম তখন তাঁর বাক্‌ভঙ্গি থেকে বুঝলাম যে আমি এক প্রবল ব্যক্তিত্বের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছি। শশব্যস্ত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে আমি তখন আম্‌তা আম্‌তা করছি। উনি একটি আরাম-কেদারায় বসেছিলেন, বললেন—হ্যাঁ, আমিই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কী চাই তোমার?

আমি বললাম—আজ্ঞে, আমি একটু আধটু গান গাইতে পারি, রবিবাবুর গান শেখার বড় ইচ্ছে আমার। শুনেছি আপনার কাছেই শিখতে হয়, তাই এসেছি।

—বটে, গান জানো? কী গান জানো?

—আজ্ঞে এই নানা ধরণের গান, যাত্রা, পালা, থিয়েটারের গান...

—থিয়েটার! তুমি থিয়েটার দেখো?

খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ, তখনকার দিনে ছেলে-মেয়েদের থিয়েটার দেখা গুরুজনদের চোখে দুষ্কর্ম বলে নিন্দিত হতো।

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে সম্প্রতি 'সীতা' দেখেছি মা, পিসিমা, জ্যাঠাইমা প্রভৃতির সঙ্গে।

দিনেন্দ্রনাথ জলদ্‌-গম্ভীর স্বরে বললেন—আচ্ছা, তুমি বোসো।

তারপর একটু থেমে বললেন—ভালো করে বসে একটা গান শোনাও দিকি।

নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় এবং বিনা হারমোনিয়ামে গান ধরলাম 'মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে'।

বিশেষ করে এই গানটি গাওয়ার পিছনে আমার একটু চাতুরি ছিল। আগেই বলেছি 'সীতা' নাটকের প্রধান সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ, সুতরাং এ গানে তাঁরই দেওয়া সুর। নিজের গান শুনে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন, আমাকে বিমুখ করতে পারবেন না।

দিনেন্দ্রনাথ চুপ করে শুনলেন আমার গান। শেষ হলে বললেন—গানটি তো দিব্যি তুলে নিয়েছ! আচ্ছা...তোমাকে রবিদার একটা গান শিখিয়ে দিচ্ছি। চুপ করে বোস।

তারপর গীতাঞ্জলি খুলে আমায় একটি গান পড়তে দিলেন—ধ্রুপদাঙ্গের সেই বিখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীত—'হেরি অহরহ, তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে

রাজে হে'।

বললেন—দেখো, রবিঠাকুরের গান যদি শিখতে চাও তো মনে রেখো আগে গানের বাণী ও ভাবটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে হবে। বার বার পাঠ করে বাণীবাহিত ভাবটুকুকে কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করাতে হবে। তারপর সুরের শিক্ষা। বুঝলে? ভাব না বুঝে লাইন ধরে ধরে সুর নকল করলে আর যাই হোক রবিঠাকুরের গান শিখতে পারবে না। দেখি গানটা বেশ ভালো করে পড় তো, শুনি। বেশ ধীরে ধীরে অর্থ বুঝে বুঝে পড়বে। তারপর পড়া শেষ হলে যখন সুর তুলবে, দেখবে ভাবের সঙ্গে সুরের কী আশ্চর্য মিলন,—যেন যুগলসম্মিলন পুরুষ ও প্রকৃতি, রাধা ও কৃষ্ণ। দুই-এর মিলনেই পূর্ণতা! যাক্, এত কথা এখন বুঝবে না, এখন পড় তো।

ভাষাটা অবিকল এই না হলেও, এমন কথাই তিনি বলেছিলেন।

আমার যুগ আমার গান পৃ. ২০-২৫, ৩৫-৩৬

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের আত্ম-জীবনীর সঙ্গে পংকজকুমার মল্লিকের নিজের কথাও জানলাম। কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য নয়, কার বয়ান ঠিক, কারই-বা বেঠিক তা নির্ণয়ের জন্যেও নয়। আত্মজীবনী বা স্মৃতি-চারণ-পাঠকদের জানবার জন্য পংকজকুমার মল্লিক বা অন্য কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষের নও দে'জ পাবলিশিং নয়—নিছক এই নিবেদনটি পেশ করবার জন্য।

প্রকাশক